দ্য ওয়াইল্ড

হারলান কোবেন

রূপান্তর : মারুফ হোসেন

রান অ্যাওয়ে

(2,1) -1- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:14

(1,1) -2- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:14

রান অ্যাওয়ে

হারলান কোবেন

রূপান্তর: মারুফ হোসেন

ত্রিকূট

(2,1) -2- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:14

রান অ্যাওয়ে

মূল
হারলান কোবেন

রূপান্তর
মারুফ হোসেন

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০২০

প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন
চিরকুট প্রকাশনী
২/৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

অনুবাদ স্বত্ব
চিরকুট প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
সজল চৌধুরী

মূল্য
চারশত টাকা মাত্র

Run-Away by Harlan Coben
Translated by Maruf Hossain
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 400.00 only

(1,1) -3- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:14

১

সেন্ট্রাল পার্কের–আরেকটু নির্দিষ্ট করে বললে, স্ট্রবেরি ফিল্ডসের–একটা বেঞ্চিতে বসে আছে সাইমন। অসহ্য মর্মপীড়ায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ওর মন। পার্কের শান্তশিষ্ট পরিবেশ দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, কী নরক গুলজার শুরু হতে যাচ্ছে এখানে!

কিন্তু সেসব ঘটবে আরো এক ঘণ্টা পর।

স্ট্রবেরি ফিল্ডসে কোনো স্ট্রবেরি নেই। আড়াই একর মাঠটাকে দেখতেও কোনোদিক থেকেই স্ট্রবেরি খেত বলে মনে হয় না। তবে নামটা কোনো ফলের নামানুসারে রাখা হয়নি–ওটা নেয়া হয়েছে বিটলস-এর বিখ্যাত গান 'স্ট্রবেরি ফিল্ডস ফরেভার' থেকে। ত্রিভুজের মতো দেখতে স্ট্রবেরি ফিল্ডস অবস্থিত সেভেন্টি-সেকেন্ড স্ট্রিটের সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে। মাঠটা উৎসর্গ করা হয়েছে জন লেননকে। এই রাস্তার সামনেই গুলি করে খুন করা হয়েছিল তাকে। এই স্মৃতিসৌধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটা মোজাইক করা গোল পাথরখণ্ড। তাতে খোদাই করে স্রেফ একটা শব্দ লেখা:

ইম্যাজিন

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সাইমন–চোখ পিটপিটাচ্ছে অনবরত–ক্লান্ত-বিধ্বস্ত। ট্যুরিস্টরা আসছে স্রোতের মতো, ফটাফট ছবি তুলছে বিখ্যাত পাথরখণ্ডটার সাথে। একা, দল বেঁধে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে। বেশিরভাগ দিনের মতোই আজও 'ইম্যাজিন' শব্দটাকে কেউ একজন তাজা ফুলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। দর্শনার্থীরা ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, কখন তার পালা আসবে, ছবি তুলবে পাথরটার সাথে। তারপর সেসব পোস্ট করবে স্ন্যাপশট আর ইনস্টাগ্রামে, কিংবা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সাথে জুড়ে দেবে জন লেননের কোনো কথা–হয়তো বিটলসেরই কোনো গানের দু-একটা লাইন।

সাইমনের পরনে স্যুট-টাই। অফিস থেকে বের হওয়ার পর টাইটা ঢিলে করার কষ্টটুকুও করতে যায়নি সে। তার অফিসটা ভেসি স্ট্রিটের ওয়ার্ল্ড ফাইন্যানশিয়াল সেন্টারে। তার সামনে, বিখ্যাত পাথরটার পাশে, ছোট একটা দল বিটলসের গান গাইছে বকশিশের আশায়। কী বলা যায় এদেরকে? ভবঘুরে? উদ্বাস্তু? নেশাখোর? পাঁড় নেশাখোর? মানসিকভাবে অসুস্থ? ভিক্ষুক? ফেরিঅলা? নাকি অন্য কিছু? এরচেয়ে কোমল করে ডাকলে 'স্ট্রিট মিউজিশিয়ান'। বেসুরো গিটার বাজাতে বাজাতে, হলদেটে দাঁত খিঁচিয়ে হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে চলেছে ওরা।

ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল, সাইমন তখন প্রতিদিন এই মোজাইক করা পাথরের সামনে দিয়ে হেঁটে যেত। পেইজের বয়স বোধহয় তখন নয়, স্যামের ছয়, আনিয়ার তিন। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটা এখান থেকে মাত্র পাঁচ ব্লক দক্ষিণে, কলম্বাস ও সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টের মাঝখানে, সিক্সটি-সেভেন্থ স্ট্রিটে। রোজ ওরা স্ট্রবেরি ফিল্ডস পেরিয়ে পার্কের পুবে, মডেল-বোট পুকুরের পাশের অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড স্ট্যাচুর কাছে যেত। বাচ্চারা এই এগারো ফুট লম্বা ব্রোঞ্জের মূর্তির গা বেয়ে ওপরে উঠে গেলেও কেউ কিছু বলে না। কাজটা খুব পছন্দ করত স্যাম আর আনিয়া। হাঁচড়েপাঁচড়ে মূর্তিটার গা বেয়ে উঠে যেত ওরা। স্যাম প্রতিদিনই অ্যালিসের ব্রোঞ্জের নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'বাবা! বাবা, দেখ, আমি অ্যালিসের নাক খোঁচাচ্ছি!' দৃশ্যটা দেখে স্যামের মা, ইনগ্রিড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলত, 'বিচ্ছু একটা!'

কিন্তু ওদের প্রথম সন্তান, পেইজ ওই বয়সে খুব শান্তশিষ্ট ছিল। যেকোনো একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসত কালার বুক নিয়ে। তারপর একমনে নিজের কাজ করে যেত। বয়স বাড়ার পর–পনেরো কি ষোলো-সতেরোয়–সাইমন এখন যেভাবে বসে আছে, ঠিক সেভাবে একটা বেঞ্চিতে বসে কলম্বাস অ্যাভিনিউয়ের প্যাপিরাস থেকে বাবার কিনে দেয়া নোটবইয়ে গল্প বা গান লিখত। কিন্তু পেইজ বাবার মতো হরেদরে সব বেঞ্চিতে বসত না। মোটা টাকা অনুদান দিয়ে সেন্ট্রাল পার্কের চার হাজার বেঞ্চ 'দত্তক' নিয়ে নিয়েছে লোকে। তারপর ব্যক্তিগত ফলক লাগিয়েছে ওগুলোতে। বেশিরভাগ ফলকই সাধারণ স্মৃতিচিহ্ন। এই যেমন, সাইমন এখন যেটাতে বসে আছে, তাতে লেখা:

কার্ল ও কোর্কি-র স্মৃতিতে

পেইজ যেসব বেঞ্চে বসতে পছন্দ করত, ওগুলোর সবকটারই ছোট ছোট নিজস্ব গল্প আছে। যেমন:

সি ও বি-এর জন্যে–হলোকাস্টের বিভীষিকা থেকে বেঁচে গিয়ে যারা এ শহরে নতুন জীবন শুরু করেছিল...

প্রিয়তমা অ্যানকে—তোমাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, মনেপ্রাণে চাই।
বিয়ে করবে আমাকে?...
এই জায়গায়, ১৯৪২ সালের ১২ এপ্রিল, শুরু হয়েছিল আমাদের প্রেমের গল্প...

যে বেঞ্চিতে বসতে সবচেয়ে পছন্দ করত পেইজ, যেটাতে ও নোটবই নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত—কে জানে, ওটাই হয়তো প্রথম ইঙ্গিত ছিল—ওটাতে খোদাই করা ছিল রহস্যময় এক ট্রাজেডি:

মিষ্টি মেরিল, বয়স ১৯। জীবন থেকে কত কিছু পাওয়ার ছিল তোমার। তার আগেই চলে গেলে, বড্ড অসময়ে। তোমাকে বাঁচানোর জন্যে সব করতে পারতাম আমি।

এক বেঞ্চ থেকে আরেক বেঞ্চে যেত পেইজ, স্মৃতিফলকগুলোর লেখা পড়ত মন দিয়ে। কোনো একটাকে কাজে লাগাত গল্পের প্লটে। সাইমনও একবার চেষ্টা করেছিল কাজটা করতে। কিন্তু মেয়ের মতো কল্পনাশক্তি ছিল না তার। তবু পেইজের কলম যখন খসখস শব্দ তুলে লিখে চলত, তখন বেঞ্চে বসে থাকত সে। পত্রিকা পড়ত, নইলে ফোনে গুঁতোগুঁতি করত।

পুরনো নোটবইগুলোর কী হয়েছে? ওগুলো এখন কোথায়?

জানে না সাইমন।

এতক্ষণ 'পেনি লেইন' গাইছিল স্ট্রিট মিউজিশিয়ান। এখন দয়া করে সেটা থামিয়ে 'অল ইউ নিড ইজ লাভ' ধরেছে। একটা অল্পবয়সি যুগল বসেছে সাইমনের পাশের বেঞ্চে। ছেলেটা গলা নামিয়ে বলল, 'মেয়েটাকে গান বন্ধ করার জন্য কিছু টাকা দেব নাকি?' জবাবে চাপা গলায় হেসে উঠল তার সঙ্গিনী: 'জন লেননকে আবার খুন করে ফেলার মতো হবে ব্যাপারটা।' কয়েকজন ট্যুরিস্ট কিছু কয়েন ফেলে গেছে মেয়েটার গিটার কেইসে। তবে বেশিরভাগই তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকছে।

কিন্তু সাইমন অখণ্ড মনোযোগে শুনছে—আশা, একটু হলেও সৌন্দর্যের ছোঁয়া ধরতে পারবে গানে, সুরে, কিংবা কথায়। ট্যুরিস্ট, তাদের গাইড কিংবা যে লোকটা পানির বোতল বিক্রি করছে, এক ডলারের বিনিময়ে একটা কৌতুক শোনাচ্ছে যে শুঁটকো লোকটা, তাদের কারো দিকে মন নেই তার। মন নেই জন লেননের সম্মানে ধূপ জ্বালানো এশিয়ান বৃদ্ধা, জগিং করতে আসা, কুকুর নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া, রৌদ্রস্নান করতে আসা মানুষগুলোর দিকেও।

কিন্তু না, কোনো মাধুর্য খুঁজে পেল না সে ওই সংগীতে।

জন লেননের গান গাইছে যে ভিখারি মেয়েটা, তার ওপর চোখ আটকে গেল সাইমনের। জটা পাকানো চুল যুবতীর। গালের হাড় বসে গেছে। কাঠির মতো শুকনো মেয়েটা। রোগা, নোংরা, বিধ্বস্ত, গৃহহীন, পথভ্রষ্ট।

এবং মেয়েটা সাইমনের কন্যা...পেইজ।

***

(2,1) -4- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:15

গত ছয় মাসে–ক্ষমার অযোগ্য কাজটা করার পর থেকে–পেইজকে আর দেখেনি সাইমন।

এবার আর সহ্য হয়নি ইনগ্রিডের। মেয়ে পালিয়ে যাবার পর স্বামীকে বলেছিল, 'ওকে একা ছেড়ে দাও।'

'মানে?' অবাক হয়েছিল সাইমন।

অসাধারণ মা, মমতাময়ী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ–নিজের জীবন যে উৎসর্গ করেছে সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের সাহায্য করতে–সেই ইনগ্রিডের জবাব ছিল, 'আমি চাই না ও এই বাড়িতে ফিরে আসুক।'

'কথাটা তুমি মন থেকে বলছ না।'

'বলছি, সাইমন। মন থেকেই বলছি।'

মাসের পর মাস–ইনগ্রিডকে না জানিয়ে–পেইজকে খুঁজেছে সে। মাঝে মাঝে প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়ে খুব আয়োজন করে, সুশৃঙ্খলভাবে খুঁজেছে। তবে বেশিরভাগ সময়ই খুঁজেছে নিজের মতো করে, এলোমেলোভাবে। বিপজ্জনক নেশার আড্ডাগুলোতে গেছে, মেয়ের ছবি দেখিয়ে মাতালগুলোর কাছে জানতে চেয়েছে ওকে চেনে কি না।

কোনো লাভ হয়নি।

একবার সাইমনের মনে হয়েছিল, ম্যানহাটন ছেড়ে নিজের কলেজে ফিরে যায়নি তো পেইজ? ওখান থেকেই তো ওলটপালট হতে শুরু করেছিল সব। দু-দুটো উইকএন্ডে গাড়ি নিয়ে মেয়ের কলেজে চলে গিয়েছিল সে। উঠেছিল ক্যাম্পাসের পাশের ক্র্যাফটবোরো ইন-এ। হাসপাতালে ডিউটি ছিল বলে কিছু জানতে পারেনি ইনগ্রিড। তাই স্বামীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার সুযোগও পায়নি।

ক্যাম্পাসের পাশের চত্বরে হাঁটবার সময় সাইমনের মনে পড়ে গিয়েছিল, উৎসাহে টগবগ করতে করতে পেইজকে কলেজে নামিয়ে দিতে এসেছিল ওরা সবাই–সে, ইনগ্রিড, স্যাম, আর আনিয়া। ওরা ভেবেছিল ম্যানহাটনে বড় হওয়া মেয়ের জন্যে এই বিশাল সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাস আর বনভূমি আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু কিছুদিনের মাঝেই শুকিয়ে মরে গেল ওদের সমস্ত আশা।

সাইমনের সত্তার একটা অংশ–যে অংশটাকে কখনো মাথাচাড়া দিতে দেয় না–অনেক আগেই চেয়েছিল মেয়েকে খোঁজা বাদ দিয়ে দিতে। পেইজ পালানোর পর জীবন আগের চেয়ে ভালো না হলেও, শান্ত হয়ে উঠেছে। গত বসন্তে হোরাস ম্যান থেকে গ্রাজুয়েশন করা স্যাম কখনো বড় বোনের কথা তোলে না। ওর সমস্ত মনোযোগ আগে ছিল বন্ধু-বান্ধব, গ্রাজুয়েশন আর পার্টির দিকে, এখন অ্যামহার্স্ট কলেজে প্রথম বর্ষের প্রস্তুতির দিকে। তবে আনিয়ার মনে কী চলছে, তা জানে না সাইমন। ছোট মেয়েটা তার সঙ্গে পেজইকে নিয়ে কোনো কথা বলে না–অবশ্য অন্য কোনোকিছু নিয়েও বলে

(1,1) -5- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:15

না। সাইমন নিজে থেকে কথা বলতে গেলে জবাব দেয়ার জন্য কখনো এক শব্দের বেশি খরচও করে না। 'ভালো' আর 'আচ্ছা' দিয়েই কাজ সারে বেশিরভাগ সময়।

তারপর হঠাৎ একদিন অদ্ভুত একটা সূত্র পেয়ে গেল সাইমন।

তিন হপ্তা আগের কথা। এক সকালে এলিভেটরে ওপরতলার প্রতিবেশী, চার্লি ক্রাউলির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। চার্লি চোখের ডাক্তার, শহরের কেন্দ্রে তার কর্মস্থল। টুকটাক সৌজন্য বিনিময়ের পর, এলিভেটরের মেঝের দিকে তাকিয়ে লাজুক গলায় সত্যিকার আফসোসের সুরে চার্লি বলেছিল, তার 'ধারণা', পেইজকে দেখেছে সে।

সাইমনও যথাসম্ভব ভাবলেশহীন কণ্ঠে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিল ।

'ওকে বোধহয় পার্কে দেখেছি,' বলেছিল চার্লি।

'হাঁটছিল?'

'না, ঠিক হাঁটছিল না।' নিচতলায় পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। দরজা খুলে গেছে এলিভেটরের। লম্বা দম নিয়ে চার্লি বলেছিল, 'পেইজ...স্ট্রবেরি ফিল্ডসে গান গাচ্ছিল।' সাইমনের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ দেখে যোগ করেছিল, 'বখশিশের আশায় গাইছিল খুব সম্ভব।'

সাইমনের মনে হচ্ছিল ওর ভেতরটা কেউ ধারালো ছুরি দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। 'বখশিশের আশায়? ভিখারির মতো...'

'ওকে আমি টাকা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু...' থেমে গিয়েছিল চার্লি। তারপর সাইমনকে মাথা দোলাতে দেখে ফের বলতে শুরু করেছিল। '...কিন্তু পেইজের কোনো হুঁশ-জ্ঞানই ছিল না। আমাকে চিনতেই পারেনি। আমি...আমি দুঃখিত, সাইমন।' নিখাদ আন্তরিক কণ্ঠে সমবেদনা জানিয়েছিল চার্লি।

কথাটা ইনগ্রিডকে জানাবে কি না, ভেবেছিল সাইমন। কিন্তু ওর সাথে কথা কাটাকাটি করতেও ইচ্ছে করছিল না। তার বদলে অবসর সময়ে স্ট্রবেরি ফিল্ডসের আশপাশের ঘুরঘুর করতে আরম্ভ করে সে।

কিন্তু কোনোদিন মেয়ের দেখা পায়নি।

কয়েকজন গাইয়ে ভবঘুরেকে টাকা দিয়ে, ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল পেইজকে চেনে কি না। অল্প কয়েকজন বলেছিল, চেনে। তারপর বলেছিল, আর কয়েকটা টাকা দিলে আরো তথ্য দিতে পারবে। টাকা দিয়েছিল সাইমন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, কিছুই জানাতে পারেনি ওরা। বেশিরভাগই স্বীকার করেছিল, পেইজকে চেনে না ওরা। এখন সামনাসামনি, রক্ত-মাংসের মেয়েকে দেখে সাইমন বুঝতে পারছে কেন ওর ছবি দেখে চিনতে পারেনি ভবঘুরেগুলো। ওর একসময়ের মিষ্টি, আদুরে মেয়ের সাথে এই জীবন্ত কঙ্কালের বিন্দুমাত্র মিল নেই!

স্ট্রবেরি ফিল্ডসের যেখানটায় সাইমন বসে আছে, ওখানে একটা সাইনবোর্ড টাঙানো:

নীরব এলাকা—সব ধরনের উঁচু আওয়াজ এবং গানবাজনা নিষিদ্ধ।
নোটিসটাকে কাঁচকলা দেখিয়ে প্রতিদিনই হেঁড়ে গলায় গানের নামে শব্দ দূষণ চালিয়ে যায় ভবঘুরের দল। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সাইমন—এসব বাজিয়েদের কেউই কখনো একতালে কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজায় না।

শেষমেশ পঞ্চাশ ডলার খরচা করে ডেভ নামে এক বদমেজাজি স্ট্রিট মিউজিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় সাইমনের। লোকটার বেশবাস আলুথালু—মাথায় ধূসর চুলের জটলা, পনিটেইল করে বাঁধা। চেহারা দেখে বয়স বোঝার জো নেই—পঞ্চাশও হতে পারে, সত্তর হতেও বাধা নেই।

'তুমি তাহলে গ্যারি ডস স্যান্টোসকে চিনতে?'

'নামটা পরিচিত,' জবাব দিয়েছিল সাইমন।

'হ্যাঁ, ছোটবেলায় যদি এদিকে এসে থাকো, ওকে মনে থাকার কথা। গ্যারি ছিল স্ট্রবেরি ফিল্ডসের স্বঘোষিত মেয়র। বড়সড় লোক। বছর বিশেক শান্তি বজায় রেখেছে এখানে, লোকজনকে ভয় দেখিয়ে। ব্যাটা একটা আস্ত পাগল ছিল। ...তারপর, ২০১৩ সালে, মারা গেল গ্রেগ। লিউকেমিয়া হয়েছিল। মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছিল ওর। আমাদের ফ্যাসিস্ট মেয়র মারা যাওয়ার পর অরাজকতা নেমে এল এই জায়গায়। ম্যাকিয়াভেলি পড়ো তুমি? ওরকমই অবস্থা। রোজই মারামারি বাধতে আরম্ভ করে মিউজিশিয়ানদের মধ্যে। এলাকার দখল নিয়ে, বুঝলে?'

মাথা দোলায় সাইমন। 'হ্যাঁ।'

'নিজেরা নিজেরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল বটে—কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সবারই নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা, কে মানবে নিয়ম? এক হারামজাদা বরাদ্দ পাওয়া সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বাজিয়ে ফেললে আরেক হারামজাদা ওর সঙ্গে সঙ্গেই বাজানো শুরু করে। ব্যস, শুরু হয়ে যায় দুই পক্ষের চেঁচামেচি আর খিস্তিখেউড়ের তুবড়ি। ছোট বাচ্চাদের সামনেও থামাথামি নেই। মাঝে মাঝে তো ঘুষাঘুষিও শুরু হয়ে যায়। তারপর আসে পুলিশ। এতে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছিল—পকেটের ক্ষতির কথা না-ই বা বললাম। কাজেই সবাই একসাথে বসে একটা সমাধানে এলাম।'

'কী সমাধান?'

'শিডিউল বানালাম একটা। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পালা করে বাজাবে সবাই।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে কাজ হলো?'

'শতভাগ না হলেও, মোটামুটি হয়েছে।'

'স্লট পাওয়ার জন্য তোমরা সাইন-আপ করো কীভাবে?' জানতে চাইল সাইমন।

'টেক্সট করে। পাঁচজন নিয়মিত খদ্দের আছে আমাদের। ওরা পিক টাইমে সুযোগ পায়। বাকি যারা আসে, তারা অন্য সময়ে ঢোকে।'

'শিডিউল তুমি ঠিক করো?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিক করি।' গর্বে সিনা টানটান হয়ে গেছিল ডেভের। 'স্লটগুলোকে কীভাবে কাজ করাতে হয়, জানি আমি। যেমন ধরো, হ্যাল আর জুলসের স্লট কখনো পরপর ফেলি না–কারণ ওরা একজন আরেকজনকে দুই চোখে দেখতে পারে না। আমার প্রাক্তন প্রেমিকারাও আমাকে এত ঘৃণা করে না। স্লটে বৈচিত্র্যও রাখার চেষ্টা করি।'

'বৈচিত্র্য?'

'কালো মিউজিশিয়ান, সেক্সি, কমবয়সি, এমনকি এশিয়ানও রাখি দুয়েকজন।' নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল সে। 'শুধু সাদাদের দিয়ে স্লট ভরিয়ে রাখি না। ব্যাপারটা খারাপ প্রভাব ফেলে, বুঝলে?'

সাইমন বুঝেছিল। আরো বুঝেছিল, ডেভকে ঠিকমতো পয়সা খাওয়ালে তার কাজ হলেও হতে পারে। হয়তো জানতে পারবে, আবার কখন সাইন-আপ করবে তার মেয়ে।

অবশেষে আজ সকালে ওকে মেসেজ পাঠিয়েছে ডেভ:

'আজ সকাল ১১টায়। আমার কাছ থেকে খবর পাওনি। আমি কারো খবরী না!

একটু পরই আরেকটা মেসেজ পাঠিয়েছে:

'১০টায় টাকা নিয়ে এসো। ১১টায় আমার ইয়োগা আছে।'

সেই মেসেজ পেয়েই এখানে এসেছে সাইমন। বসে বসে ভাবছে, পেইজ ওকে দেখে ফেলল কি না। দেখে ফেললে কি দৌড়ে পালাবে? কে জানে! মেয়েটা গানবাজনা শেষ করে, জিনিসপত্র গোছগাছ করার সময় ওর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হবে।

ঘড়ি দেখল সাইমন। এগারোটা আটান্ন। পেইজের সময় শেষের দিকে।

সব ধরনের কথা গুছিয়ে রেখেছে সাইমন মাথার মধ্যে। ইতিমধ্যে সোলেমানি ক্লিনিকে ফোন করে একটা রুমও বুক করে ফেলেছে পেইজের জন্যে। তার প্ল্যান হচ্ছে অনুরোধ-উপরোধ, মিষ্টি কথা–যেভাবেই হোক ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি করানো।

পুব দিক থেকে আরেকজন স্ট্রিট মিউজিশিয়ান এসে ঢুকল পার্কে–পরনে রংচটা জিন্স আর ফ্লানেলের শার্ট। পেইজের পাশে এসে বসে পড়ল সে। একটা কালো প্লাস্টিকের ময়লা ফেলার বাক্সে করে গিটার নিয়ে এসেছে। পেইজের হাঁটুতে টোকা দিয়ে কব্জিতে বাঁধা কাল্পনিক ঘড়ি দেখাল সে ইশারায়। মাথা দুলিয়ে গান শেষ করল মেয়েটা। দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল হেঁড়ে গলায়: 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

শ্রোতাদের কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাল না, তালি দেয়া তো অনেক পরের কথা। সামনে জমা হওয়া অল্প কটা দুমড়ানো নোট আর কয়েন কুড়িয়ে

নিয়ে খুব সাবধানে বাক্সে পুরল গিটারটা। দৃশ্যটা দেখে বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল সাইমনের। ওই টাকামাইন জি-সিরিজ গিটারটা সে পেইজের ষোলোতম জন্মদিনে কিনে দিয়েছিল, ওয়েস্ট ফরটি-এইটথ স্ট্রিটের স্যাম অ্যাশ থেকে। জিনিসটা পেয়ে খুশিতে খলবলিয়ে উঠেছিল মেয়েটা। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, পাপা! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ!'

কিন্তু পেইজ এখন আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। নেই সেই নিষ্পাপ আনন্দও। নেশায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা এই জীবন্ত কঙ্কালটার মধ্যে নিজের সেই দেবদূতের মতো মেয়েটাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করল সাইমন আরেকবার। সেই মেয়েটাকে, যাকে সে রোজ নাইনটি সেকেন্ড স্ট্রিটে সাঁতারের ক্লাসে নিয়ে যেত, হ্যামকে শুইয়ে তিন দিনে হ্যারি পটারের দু-দুটো বই পড়ে শুনিয়েছিল–সেই ছোট্ট মেয়েটাকে, যে হ্যালোউইনের জামা দুই হপ্তা আগেই পরে ফেলার আবদার ধরত। কিন্তু সেই মেয়েটার ছায়াও নেই এই কঙ্কালসার তরুণীর মধ্যে।

সামান্য টলে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল পেইজ।

সময় হয়েছে।

মোজাইক করা পাথরের এপাশে সাইমনও উঠে দাঁড়াল। হৃৎপিণ্ডটা দড়াম দড়াম বাড়ি মারছে যেন বুকের খাঁচায়। মাথাব্যথা শুরু হয়েছে, দপদপ করছে কপালের দুপাশের শিরা। একবার বাঁয়ে তাকাল সে, তারপর ডানে।

বয়ফ্রেন্ডটাকে খুঁজছে।

পরিস্থিতি প্রথম কীভাবে জট পাকাতে শুরু করেছিল ঠিক বলতে পারবে না সাইমন। তবে ওর বিশ্বাস, ওর মেয়েকে পাপের সাগরে টেনে নামানোর জন্যে ওই বয়ফ্রেন্ডটাই দায়ী। হ্যাঁ, সাইমন কাগজে বহুবার পড়েছে, নিজের পরিণতির জন্যে নেশাখোর নিজেই দায়ী, অন্য কেউ নয়। এ দায় কেবলই তার। আর সিংহভাগ নেশাখোরের (এবং তাদের পরিবারের) ঝুলিতেই একটা গল্প আছে। হয়তো কোনো অপারেশনের পর কোনো ব্যথানাশক খাওয়ার মাধ্যমেই শুরু হয় তাদের আসক্তি। হয়তো বন্ধু-বান্ধবের চাপে অথবা তথাকথিত একবার চেখে দেখার ইচ্ছা থেকে প্রথম মাদক নেয় তারা। তারপর ক্রমে সেটা পরিণত হয় আসক্তিতে।

সবার হাতের কাছেই একটা-না-একটা অজুহাত তৈরি থাকে।

কিন্তু পেইজের বেলায়–সেটা ওর চরিত্রের দুর্বলতার কারণেই হোক কি বাবা-মা ওকে ঠিকমতো শাসন না করার কারণেই হোক–ব্যাপারটা অনেক সোজাসাপটা:

অ্যারনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের পেইজ এবং পরের পেইজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটো মানুষ।

অ্যারন কর্ভাল একটা পাক্কা হারামি। হারামিপনার সাথে বিশুদ্ধতা মেশালে সেই বিশুদ্ধতা ধুয়েমুছে যায়। অ্যারনের বয়স বত্রিশ, স্যামের মেয়ের

চেয়ে এগারো বছরের বড়। অন্য সময় বয়সের এই ব্যবধান নিয়ে উদ্বিগ্ন হতো সাইমন। কিন্তু ইনগ্রিড তেমন পাত্তা দেয়নি। ও যখন মডেলিং করত, তখন থেকেই এ ধরনের সম্পর্ক দেখে অভ্যস্ত।

অ্যারনের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না আশপাশে।

আশায় বুক ধুকপুক করে উঠল সাইমনের। অ্যারনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে নাকি ওর মেয়ের? হারামির বাচ্চাটা কি মধু খেয়ে কেটে পড়েছে ওর মেয়েকে একা ফেলে?

তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

পার্কের পুব দিকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে হাঁটা দিল পেইজ। জোম্বির মতো হাঁটছে। ওর পিছু নিল সাইমন।

মেয়েটা সঙ্গে আসতে রাজি না হলে কী করবে সে? রাজি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আগেও অনেকবার ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছে সাইমন–প্রতিবারই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে চেষ্টাটা। মেয়ের ওপর জোরও খাটাতে পারবে না সে। সম্বন্ধি রবার্ট প্রেভিডিকে দিয়েও কোর্ট অর্ডার আনানোর চেষ্টা করেছে সাইমন, ওকে নিজের কাছে রাখার জন্যে। তাতেও কাজ হয়নি।

পেইজের পেছনে চলে এসেছে সাইমন। পরনের কাঁধখোলা জরাজীর্ণ জামাটা ঢলঢল করছে ওর গায়ে। বাদামি দাগ দেখা যাচ্ছে পিঠের একদা-মসৃণ ত্বকে। দাগটা কীসের? অসুস্থতার? মারধোরের? রোদে পুড়ে হয়েছে?

'পেইজ?'

ফিরল না মেয়েটা, একবারও না থেমে হেঁটে চলল। মুহূর্তের জন্যে সাইমনের মনে হলো, ভুল হয়নি তো ওর? চার্লি ক্রাউলি ভুল দেখেনি তো? এই দুর্গন্ধের ডিপো, হেঁড়ে গলার জীবন্ত কঙ্কালটা যদি ওর প্রথম সন্তান, ওর পেইজ না হয়?

খাঁকারি গিয়ে গলা সাফ করে, আরেকটু কাছে গিয়ে আবার ডাকল সে, 'পেইজ?'

এবার চলার গতি একটু ধীর হলো মেয়েটার, কিন্তু পিছু ফিরে তাকাল না। একটা হাত রাখল সাইমন ওর কাঁধে। শুকনো, হাড্ডিসার কাঁধ।

'পেইজ।'

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা।

'পেইজ, আমি বাবা।' আকুতিতে গাল ভেঙে এল সাইমনের।

বাবা। শেষ কবে তাকে বাবা ডেকেছে পেইজ?

তবু ফিরে চাইল না মেয়েটা।

'প্লিজ, পেইজ...'

কিছুক্ষণ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল...তারপর সহসা দৌড় শুরু করল জীবন্ত কঙ্কালটা।

মেয়ে আচমকা দৌড় দেয়ায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল সাইমন। চটকা ভেঙে সে-ও দৌড় শুরু করতে করতে ওর চেয়ে তিন কদম এগিয়ে গেছে পেইজ। কদিন ধরে অফিসের পাশের একটা হেলথ ক্লাবে যাচ্ছে সে নিয়মিত। সেজন্যে ওর স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন বেশ ভালো।

লাফিয়ে আগে বাড়ল সাইমন–কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ধরে ফেলল পেইজকে। ওর নলখাগড়ার মতো শুকনো হাতটা ধরে ফেলল খপ করে। টান মেরে থামাল মেয়েটাকে। টানটা বোধহয় একটু বেশিই জোরে হয়ে গেছে। কিন্তু সাইমনের কিছু করার নেই, নিজের অজান্তে, আপনাআপনিই ঘটে গেছে পুরো ঘটনাটা।

পালানোর চেষ্টা করেছিল পেইজ। ওকে থামাবার জন্যে যা করা দরকার ছিল, তা-ই করেছে সে।

'আউ!' ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'ছাড়ো আমাকে!'

অসংখ্য মানুষ চারপাশে, তাদের কেউ কেউ চিৎকার শুনে এদিকে ফিরে তাকিয়েছে। সেদিকে পাত্তা না দিয়ে নিজের কাজে মন দিল সাইম। যত জলদি সম্ভব মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এখন। নইলে আবার কোনো 'ভালোমানুষের বাচ্চা' এগিয়ে আসবে পেইজকে 'উদ্ধার' করতে।

'সোনামণি, আমি বাবা। আয়, বাড়ি যাবি।'

মেয়েটা এখনো তার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সাইমন, যাতে মুখোমুখি কথা বলতে পারে। কিন্তু কনুইয়ের ভাঁজ দিয়ে দুই চোখ ঢেকে রেখেছে পেইজ, কড়া রোদ থেকে চেহারা বাঁচানোর চেষ্টা করছে যেন।

'পেইজ? পেইজ, প্লিজ আমার দিকে তাকা।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটার শরীর, তারপর আচমকা শিথিল হয়ে গেল। মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে, ধীরে ধীরে চোখ তুলে চাইল বাবার দিকে। আবার আশা দানা বাঁধতে লাগল সাইমনের বুকে। হ্যাঁ, মেয়েটার দুই চোখ গর্তে বসে গেছে, রং পাল্টে হলদেটে হয়ে গেছে–কিন্তু তারপরও এই প্রথমবারের মতো ওখানে প্রাণের ছোঁয়া দেখতে পেল সাইমন।

এই প্রথম সেই ছোট্ট, মিষ্টি মেয়েটা উঁকি দিল এখনকার এই বিধ্বস্ত পেইজের আড়াল থেকে। ও যখন মুখ খুলল, বহুদিন পর নিজের মেয়ের কণ্ঠস্বর কানে ধাক্কা মারল সাইমনের: 'বাবা?'

মাথা দোলাল সাইমন। কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল। খানিক বাদে বলল, 'আমি আছি, পেইজ, তোকে সাহায্য করার জন্য।'

কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা। 'আমি...আমি স্যরি।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' এক হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করতে চাইল সাইমন। ঠিক তখুনি আরেকটা গমগমে কণ্ঠস্বর ধারালো ছুরির ফলার মতো এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল যেন ওর সমস্ত আশা।

'ধুস! শালা! হচ্ছেটা কী...?'

ডানে তাকাল সাইমন।

অ্যারন।

তার গলা শুনে ছিটকে সরে গেল পেইজ। প্রাণপণে ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করল সাইমন, কিন্তু এক ঝটকায় নিজেকে ছুটিয়ে নিল ও।

'পেইজ...' ভাঙা গলায় ডাকল সে।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড আগে ওর চোখে যে প্রাণের ঝিলিক দেখেছিল, সেটা এখন হাওয়ায় উবে গেছে। চেঁচিয়ে বলে উঠল মেয়েটা, 'চলে যাও! একা থাকতে দাও আমাকে!'

'পেইজ, প্লিজ...'

এক পা এক পা করে পিছু হটতে শুরু করেছে মেয়েটা। আবার হাত বাড়িয়ে দিল সাইমন ওকে ধরার জন্যে, কিন্তু গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পেইজ।

ঝট করে অনেকগুলো মাথা ঘুরে গেল এদিকে চিৎকারটা শুনে।

পিছু হটল না সাইমন।

'প্লিজ, একবার শোন আমার কথা...'

সেই মুহূর্তে ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল অ্যারন।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে মানুষ দুজন–অ্যারন আর সাইমন। অ্যারনের পেছনে সরে গেল পেইজ। নেশার ঘোরে টলছে লোকটা, পরনে একটা ডেনিম জ্যাকেট আর একটা নোংরা সাদা টি-শার্ট। গলায় অগুনতি চেইন ঝোলানো, পায়ে বুট।

'কিচ্ছু হয়নি, পেইজ,' টিটকারির সুরে বলল অ্যারন, চোখজোড়া এখনো সাইমনের ওপর স্থির। 'তুমি যাও, সোনা।'

মাথা নাড়ল সাইমন। 'না...'

কিন্তু পেইজ ততক্ষণে অ্যারনকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে দৌড়াতে শুরু করেছে।

'পেইজ?' চেঁচিয়ে উঠল সাইমন। 'দাঁড়া! প্লিজ দাঁড়া!'

প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে মেয়েটা। ওর পিছু নেয়ার জন্যে নড়ে উঠল সাইমন, কিন্তু পথ আটকে দাঁড়াল অ্যারন।

'পেইজ প্রাপ্তবয়স্ক,' বলল সে। 'তোমার কোনো অধিকার নেই...'

মুঠো পাকিয়ে সোজা ওর মুখের ওপর ঘুষি বসিয়ে দিল সাইমন।

টের পেল, ওর ঘুষি খেয়ে পাখির বাসার মতো মুচমুচ করে ভেঙে গেছে লোকটার নাক। রক্ত বেরোতে শুরু করেছে স্রোতের মতো।

মাটিতে পড়ে গেল অ্যারন।

দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ফিনল্যান্ড থেকে আসা দুজন ট্যুরিস্ট।

চিৎকার কানে তুলল না সাইমন। পেইজকে দেখতে পাচ্ছে এখনো। বাঁয়ে ঘুরে, পেভমেন্ট ছেড়ে গাছের দঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে ও।

লাফিয়ে ওর উদ্দেশে দৌড় দিল সাইমন, কিন্তু মাটি থেকে ওর পা খামচে ধরল অ্যারন। ঝাঁকি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু আশপাশে ততক্ষণে লোক জমে গেছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ভিড়। সবার উদ্দেশ্যই ভালো, কিন্তু আসল ঘটনা কেউ জানে না। কয়েকজন ফোন বের করে ভিডিয়ো করছে।

সবাই চেঁচিয়ে নড়তে নিষেধ করছে সাইমনকে।

লাথি মেরে পা ছাড়াল সে। তারপর পেইজ যেদিকে গেছে, সেই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ওর পিছে লেগে গেছে লোকজন।

একজন ওকে টেনে ধরে থামানোর চেষ্টা করল। কনুইয়ের গুঁতো মারল সে। শুনতে পেল, 'উফ!' বলে ওর হাত ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। আরেকজন ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। এক ঝটকায় তাকে ছাড়িয়ে নিল সাইমন। এখনো মেয়ের দিকে দৌড়াচ্ছে সে।

কিন্তু ওরা অনেক মানুষ। এত মানুষের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারছে না।

'আমার মেয়ে!' হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল সাইমন। 'প্লিজ...ওকে থামান...'

কারো কানে গেল না ওর আকুতি। একটাই চিন্তা সবার মনে–বিপজ্জনক এই পাগলটাকে থামাতে হবে।

আরেকজন ট্যুরিস্ট ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর আরেকজন।

মাটিতে পড়তে পড়তে মেয়ের অপস্রিয়মাণ অবয়বের দিকে চাইল সাইমন। পরক্ষণেই সর্বশক্তিতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। এবার বৃষ্টির মতো কিল-ঘুষি পড়তে শুরু করল ওর ওপর। পাঁজরের তিনটা হাড় আর দুটো আঙুল ভেঙে ক্ষান্ত হলো উন্মত্ত জনতা। এই মারের চোটে সাইমন মাথায় আঘাত পাবে, ঝাপসা দেখবে সব, শরীরে সেলাই পড়বে মোট তেইশটা।

কিন্তু কোনো ব্যথাই টের পায়নি সে।

আরেকটা দেহ এসে পড়ল ওর ওপর। চিৎকার-চেঁচামেচি, তারপর পুলিশও এসে হামলে পড়ল ওর ওপর। মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল কব্জিতে। চোখ তুলে তাকাল সে। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল, একটা গাছের আড়াল থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে পেইজ।

'পেইজ!'

কিন্তু কাছে এল না মেয়েটা। উল্টো ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল। সাইমন টের পেল, আরেকবার ওকে হারিয়ে ফেলেছে সে।

(1,1) -9- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:17

২

প্রথমে কিছুক্ষণ সাইমনকে স্রেফ মাটিতে ঠেসে ধরে রাখল পুলিশ। হাত দুটো পিছমোড়া করে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। এক মহিলা পুলিশ ঝুঁকে এসে শান্ত কণ্ঠে সাইমনকে জানাল যে, ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর যন্ত্রের মতো গড়গড় করে ওর অধিকারের কথা বলে গেল। নেমট্যাগ থেকে মহিলার নাম জানতে পারল সাইমন–হেইয। প্রবল বেগে গা-ঝাড়া দিল সে, চেঁচিয়ে উঠল মেয়ের নাম ধরে। অনুরোধ করল পেইজকে থামাতে। কিন্তু কেউ পাত্তা দিল না ওর অনুনয়-বিনয়ে। একমনে আসামির অধিকার জানিয়ে চলল হেইয।

কথা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। ফের মেয়ের নাম ধরে চেঁচাতে শুরু করল সাইমন। কেউ কান দিচ্ছে না ওর চিৎকারে। তাই মাথা ঠান্ডা করে আরো মার্জিত স্বরে ডাকতে শুরু করল সে।

'অফিসার? ম্যাম? স্যার?'

ওর দিকে নজরই দিল না কোনো পুলিশ অফিসার, সাক্ষীদের জবানবন্দি নিতে লাগল। কয়েকজন পর্যটক ঘটনাটার ভিডিয়ো দেখাচ্ছে পুলিশকে। সাইমন আন্দাজ করল, মোটেও ওর পক্ষে কথা বলছে না কেউ।

'আমার মেয়ে,' আবার মুখ খুলল সে। 'মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম আমি। ওকে কিডন্যাপ করেছে লোকটা।'

শেষের কথাটা আধা-মিথ্যা। ওই কথায় অন্তত কেউ প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলে আশা করছে সে। মিছে আশা–কেউ ফিরেও তাকাল না ওর দিকে।

ডানে-বাঁয়ে মাথা ঘোরাল সাইমন। অ্যারনকে খুঁজছে। লোকটার টিকিটিও দেখতে পেল না।

'ও কোথায়?' আবারও মানসিক বিকারগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল সে।

অবশেষে ওর দিকে ফিরল হেইয। 'কে?'

'অ্যারন।'

কিছু বলল না হেইয।

(2,1) -9- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:17

'যে লোকটাকে আমি ঘুষি মেরেছি। ও কোথায়?'

এবারও কোনো জবাব নেই।

ধীরে ধীরে উত্তেজনা থিতিয়ে এল সাইমনের। চাপা ব্যথা আর বমি বমি ভাব ছড়িয়ে পড়ল গোটা শরীরে। অবশেষে–কতক্ষণ পর, ধারণা নেই সাইমনের–ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল হেইয আর বুকে 'হোয়াইট' নেমট্যাগ লাগানো লম্বা, ফর্সা এক পুলিশ। তারপর দুজন দুপাশ থেকে ধরে ধরে ওকে নিয়ে চলল পুলিশের গাড়ির দিকে। সাইমনকে পেছনের সিটে বসিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে বসল হোয়াইট, হেইয বসল তার পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে। আসামির মানিব্যাগ হেইযের হাতে–সে এবার পিছু ফিরে বলল, 'এবার বলুন, কী হয়েছিল, মি. গ্রিন?'

'আমি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মাঝখানে বাধা দেয় ওর বয়ফ্রেন্ড। তাকে সামনে থেকে সরানোর চেষ্টা করি...'

চুপ হয়ে গেল সাইমন।

'তারপর?' তাগাদা দিল হেইয।

'ওর বয়ফ্রেন্ডকে আটক করেছেন? আমার মেয়েকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবেন, প্লিজ?'

'তারপর কী হলো?' ফের তাগাদা দিল হেইয।

রাগে মাথাখারাপ হয়ে গেল সাইমনের, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাভাবিক রাখল চেহারা। 'তারপর ঝগড়া হয়।'

'ঝগড়া?'

'হ্যাঁ?'

'একটু খুলে বলুন।'

'কী খুলে বলব?'

'ঝগড়াটার ব্যাপারে।'

'আগে আমার মেয়ের খবর জানান,' মরিয়া কণ্ঠে বলল সাইমন। 'ওর নাম পেইজ গ্রিন। ওর বয়ফ্রেন্ড ওকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রেখেছে। লোকটার নাম অ্যারন কর্ভাল। মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম আমি।'

'হুম,' অস্ফুটে বলল হেইয। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তাহলে একটা গৃহহীন লোককে ঘুষি মেরেছেন?'

'আমি...' এইটুকু বলেই থেমে গেল সাইমন। চুপ করে থাকাই ভালো এখন।

'ঘুষি মেরেছেন?' আবার জিজ্ঞেস করল হেইয।

জবাব দিল না সাইমন।

'আচ্ছা, ব্যাপার তাহলে আমি যা ভেবেছিলাম, তা-ই,' হেইয বলল। 'আপনার সারা গায়ে রক্ত। এমনকি সুন্দর টাইখানাও রক্তে মাখামাখি। কোন্ ব্র্যান্ড? হার্মিস?'

হার্মিসেরই–কিন্তু জবাব দিল না সাইমন। ওর শার্টের বোতাম এখনো গলা পর্যন্ত আঁটা, টাইও সুচারুভাবে বাঁধা।

'আমার মেয়ে কোথায়?'

'জানি না,' হেইযের নির্লিপ্ত জবাব।

'তাহলে আমার উকিল না আসা পর্যন্ত আর কিছু বলার নেই।'

'বেশ।'

সামনে ফিরল হেইয; আর কিছু বলল না। টেন্থ অ্যাভিনিউয়ের কাছে, ফরটি নাইন্থ স্ট্রিটের মাউন্ট সিনাই ওয়েস্টের একটা ইমারজেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হলো সাইমনকে। ওখানে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে করানো হলো ওকে। অল্পবয়সি এক ডাক্তার ওর আঙুলগুলো স্প্লিন্টে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার কাটা সেলাই করে দিল। পাঁজরের ভাঙা হাড়ের জন্যে কোনো চিকিৎসা নেই, ডাক্তার জানাল ওকে, কেবল হপ্তা ছয়েক বিশ্রামে থাকা ছাড়া।

এর পরের সব ঘটনা ঘটল ঘোরের মধ্যে। হাসপাতাল থেকে ১০০ সেন্টার স্ট্রিটের সেন্ট্রাল বুকিং-এ যাওয়া, ছবি তোলা, আঙুলের ছাপ নেয়া, জেলখানায় ঢোকা...সবই অবাস্তব মনে হলো সাইমনের। ওকে একটা ফোন করতে দিল ওরা, সিনেমায় যেমনটা দেখায়। ইনগ্রিডকে কল করতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্থির করল, ওর সম্বন্ধি রবার্টকে ডাকবে। ম্যানহাটনের শীর্ষস্থানীয় উকিল সে।

'এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছি,' ওর সমস্যা শোনার পর বলল রবার্ট।

'তুমি সামলাতে পারবে না?'

'আমি ক্রিমিনাল লইয়ার না।'

'আমার কি আসলে ক্রিমিনাল লইয়ার দরকার...?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া আমি আর ইভোনি এখন সিবিচের বাড়িতে আছি। এখান থেকে আমার আসতে অনেকক্ষণ লেগে যাবে। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি লোক পাঠাচ্ছি।'

আধঘণ্টা বাদে, ছোটখাটো গড়নের এক মহিলা এসে হাজির হলো সাইমনের সেলে। মহিলার বয়স সত্তরের কোঠায়; মাথায় কোঁকড়া সোনালি চুল, তাতে পাক ধরেছে; চোখে অগ্নিদৃষ্টি।

'হেস্টার ক্রিমস্টাইন,' করমর্দন করে নিজের পরিচয় দিল সে। 'রবার্ট পাঠিয়েছে।'

'আমি সাইমন গ্রিন।'

'জানি। আমি ঝানু উকিল, তাই সব জেনেই এসেছি। যাকগে, এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো: "নির্দোষ।"'

'কী?'

'আমি যা বললাম, তা-ই বলো।'

'নির্দোষ।'

'দারুণ। খুব ভালো বলেছ, চোখে পানি এসে গেছে আমার।' মক্কেলের কাছে ঘেঁষে এল হেস্টার ক্রিমস্টাইন। 'তোমাকে কেবল এই একটা কথা বলার অনুমতি দিলাম। মাত্র একবার বলতে হবে কথাটা–জজ যখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলেন। আমার কথা পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার।'

'রিহার্সালের দরকার আছে?'

'না, এমনিতেই পারব।'

'লক্ষ্মী ছেলে।'

আদালতকক্ষে ঢোকার সময় মহিলা গলা চড়িয়ে নিজের নাম ঘোষণা করল: 'হেস্টার ক্রিমস্টাইন, আসামিপক্ষ।' সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল গোটা কামরায়। মাথা উঁচিয়ে ফেললেন বিচারক, ভুরু কোঁচকানো।

'কাউন্সেলর ক্রিমস্টাইন, আপনি! এ তো আমার জন্য সম্মানের ব্যাপার। এই অধমের কোর্টে আপনার আগমন কেন জানতে পারি?'

'এসেছি আইনের একটা গুরুতর ভুল প্রয়োগ ঠেকাতে।'

'আচ্ছা।' দু-হাত ভাঁজ করে হাসলেন বিচারক। 'আবার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালো লাগছে, হেস্টার।'

'কথাটা মন থেকে বলেননি।'

'ঠিক ধরেছেন,' বললেন বিচারক। 'মন থেকে বলিনি।'

খুশির ঝিলিক দেখা দিল হেস্টারের চেহারায়। 'আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে, ইয়োর অনার। কালো গাউনে আপনাকে মানিয়েছে ভালো।'

'কী...এই পুরনো কাপড়ে?'

'ওটার জন্য আপনাকে শুকনো দেখাচ্ছে।'

'তাই নাকি?' চেয়ারে হেলান দিলেন বিচারক। 'আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামি কিছু বলতে চায়?'

সাইমনের দিকে তাকাল হেস্টার।

'নির্দোষ,' বলল সে।

মাথা দোলাল ওর উকিল, চেহারায় সন্তুষ্টি। জামিনের জন্য পাঁচ হাজার ডলার দাবি করল প্রসিকিউটর। অঙ্কটা নিয়ে মুলামুলি করল না হেস্টার। কাগজপত্র সই-সাবুদ করার দীর্ঘ, ক্লান্তিকর আইনি প্রক্রিয়া শেষ হবার পর আদালতকক্ষ থেকে বেরোনোর জন্য মূল দরজার দিকে এগোল সাইমন। কিন্তু হাত ধরে ওকে আটকাল হেস্টার ক্রিমস্টাইন।

'ওদিক দিয়ে না।'

'কেন?'

'ওরা অপেক্ষা করছে।'

'কারা?'

(1,1) -11- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:17

জবাব না দিয়ে এলিভেটরের বোতাম চাপল হেস্টার। এলিভেটরের দরজা খোলার পর বলল, 'আমার সঙ্গে এসো।'

নিচে নেমে এল ওরা। বিল্ডিঙের পেছনের দিকে নিয়ে চলল ওকে হেস্টার। মোবাইল বের করল মহিলা পকেট থেকে।

'কোথায় তুমি, টিম? মালবেরির ইগলু-তে? বেশ। থাকো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'হচ্ছেটা কী?' উত্তর দাবি করল সাইমন।

'অদ্ভুত।'

'মানে?'

'যখন কথা বলতে মানা করি, তখনই বকবক শুরু করো তুমি,' বিরক্ত গলায় বলল মহিলা।

একটা অন্ধকার করিডর ধরে হাঁটছে দুজনে। হেস্টার চলেছে আগে আগে। ডানে ঘুরল সে, খানিক পর আবার ডানে মোড় নিল। অবশেষে একটা প্রবেশদ্বারে পৌঁছল ওরা। কেবল কর্মচারীরা ঢোকে এদিক দিয়ে। পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে সবাইকে। কিন্তু হেস্টার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বেরোনোর দরজার দিকে এগোল।

'এদিকে দিয়ে যেতে পারবেন না,' বাধা দিল এক গার্ড।

'পারব না? তাহলে গ্রেপ্তার করো।'

আর কিছু বলল না লোকটা। এক মুহূর্ত পর বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। বেক্সটার স্ট্রিট পেরিয়ে, কলম্বাস পার্ক ধরে পৌঁছে গেল মালবেরি স্ট্রিটে।

'আইসক্রিম পছন্দ করো?' জানতে চাইল হেস্টার।

সাইমন উত্তর দিল না। ইশারায় বন্ধ মুখ দেখাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল উকিল। 'কথা বলার অনুমতি দেয়া হলো।'

'হ্যাঁ, করি।'

'ইগলুর একটা আইসক্রিম স্যান্ডউইচ আছে, ক্যাম্পফায়ার স্মোরস। দারুণ স্বাদ। আমার ড্রাইভারকে দুটো কিনে রাখতে বলেছি।'

কালো মার্সিডিজটা অপেক্ষা করছিল ইগলুর সামনে। ড্রাইভারের হাতে দুটো আইসক্রিম স্যান্ডউইচ। একটা দিল হেস্টারকে।

'ধন্যবাদ, টিম। সাইমন?'

দ্বিতীয় আইসক্রিমটা সাইমনের দিকে বাড়িয়ে ধরল ড্রাইভার। মাথা নেড়ে মানা করে দিল সে। *কী-আর-করা* ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল হেস্টার। 'তাহলে তুমিই খাও, টিম।' নিজের আইসক্রিমে কামড় দিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসল সে। সাইমন বসল তার পাশে।

'আমার মেয়ে...'

'পুলিশ ওকে খুঁজে পায়নি।'

'অ্যারন কর্ভালকেও পায়নি?'

'কাকে?'

'যে লোকটাকে ঘুষি মেরেছিলাম।'

'ও-কথা আর মুখেও এনো না। বলো, যে লোকটাকে তুমি ঘুষি মেরেছ বলে অভিযোগ উঠেছে।'

'একই কথা।'

'উঁহু, এক কথা না। একা থাকার সময়ও ও-কথা মুখে আনবে না।'

'ঠিক আছে। তা লোকটা কোথায় জানো...'

'ও-ও ভেগেছে।'

'"ভেগেছে" মানে?'

'কেন, "ভেগেছে" শব্দটা কি এতই কঠিন যে মানে বুঝতে পারছ না? পুলিশ তার সঙ্গে কথা বলার আগেই ব্যাটা ভেগেছে। ব্যাপারটা তোমার জন্য ভালো। ভিক্টিম নেই তো অপরাধও নেই।' আইসক্রিমে আরেকটা কামড় বসিয়ে ঠোঁটের কোনা মুছল মহিলা। 'কেসটা শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু...। শোনো, আমার এক বন্ধু আছে। নাম মেরিকুইটা ব্লামবার্গ। জাঁদরেল মহিলা–আমার মতো মিষ্টি স্বভাব না ওর। কিন্তু শহরের সেরা পিআর হ্যান্ডলার ও। এক্ষুনি মেরিকুইটাকে দিয়ে তোমার জনসংযোগ ক্যাম্পেইন শুরু করাতে হবে।'

গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। উত্তরে খানিকটা এগিয়ে, ডানে মোড় নিয়ে বেয়ার্ড স্ট্রিটে পড়ল মার্সিডিজ।

'জনসংযোগ ক্যাম্পেইন? এসব লাগবে কেন আমার...?'

'বলছি। তবে আগের কথা আগে সেরে নিই। প্রথমে, ঠিক কী ঘটেছিল বলো আমাকে। সব বলবে। একদম আগাগোড়া।'

সব খুলে বলল সাইমন। চুপচাপ সব শুনল হেস্টার। ওর মতো মানুষরাই 'অখণ্ড মনোযোগ' শব্দ দুটোকে শিল্পে পরিণত করেছে। মহিলা দারুণ চটপটে আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সেই প্রাণশক্তি এখন লেজার লাইটের মতো পড়ছে সাইমনের ওপর। সহমর্মিতা নিয়ে প্রতিটা কথা শুনছে হেস্টার।

সাইমনের কথা শেষ হবার পর আন্তরিক কণ্ঠে বলল, 'খুব দুঃখজনক ব্যাপার।'

'ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে পারছ।'

'হ্যাঁ।'

'পেইজকে খুঁজে বের করতে হবে। কিংবা অ্যারনকে।'

'ডিটেকটিভ লাগাব আমি। তবে আমার ধারণা, ওরা দুজনেই পালিয়ে গেছে।'

নীরবতা নেমে এল গাড়ির মধ্যে। শরীরব্যথা শুরু হয়েছে সাইমনের। ক্রমেই বাড়ছে যেন ব্যথাটা।

'কিন্তু পিআর ক্যাম্পেইন করতে হবে কেন?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল সে।

মোবাইল ফোন বের করে কিছু একটা খুঁজতে লাগল হেস্টার। 'এসব জিনিস আমার দুচোখের বিষ। খুব বেশি তথ্য দেয়, ব্যবহারও হয় খুব বেশি–কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই মানুষের জীবন নষ্ট করার জন্য। তোমার বাচ্চাকাচ্চা আছে না? ওহ, আছেই তো। ওরা দিনে কয় ঘণ্টা অনলাইনে ঘোরাঘুরি...' মিইয়ে গেল মহিলার কণ্ঠ। 'এখন এসব নিয়ে লেকচার দেয়ার সময় না। এই দেখ।'

ফোনটা মক্কেলের হাতে দিল সে।

একটা ইউটিউব ভিডিয়ো দেখতে পেল সাইমন। দুই লক্ষ ঊননব্বই হাজারবার দেখা হয়েছে। স্ক্রিনশট প্রিভিউ আর শিরোনাম দেখে ওর বুক ধুকপুক শুরু হলো:

পয়সাঅলার মার খেল পয়সাহীন
ওয়ালস্ট্রিট পেটাল গৃহহীনকে
ড্যাডি ওয়ারবাক ধ্বংস করে দিল নিঃস্বকে
সর্বহারাকে মারল খেয়ালি ধনী

হেস্টারের দিকে চাইল সে চোখ তুলে। সহানুভূতির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ওর উকিল। তর্জনীর ছোঁয়ায় ভিডিয়োটা চালু করে দিল সে। ভিডিয়োটা করেছে *জোরাস্টিলেটো* নামের এক লোক, পোস্ট করেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। মৃদু-মন্থর গতিতে হাঁটছিল *জোরাস্টিলেটো*। সঙ্গে তিনজন মহিলা–সম্ভবত তার বউ আর দুই মেয়ে। হাঁটার সময় একটা গোলমাল তার নজর কাড়ে। হুট করে করে ডানে ঘুরে যায় ক্যামেরার লেন্স। ক্যামেরা ফোকাস হয় সাইমনের ওপর। বেশ আত্মম্ভরি দেখাচ্ছে ওকে ভিডিয়োতে। দামি স্যুটটা খুলে নিলেই পারত–তাহলে এত বিশ্রী দেখাত না ব্যাপারটা। নিদেনপক্ষে টাইটা তো খুলতে পারত গলা থেকে! ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, পেইজ দূরে সরে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে–আর ওদের দুজনের মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে অ্যারন। দেখেই মনে হচ্ছে, পয়সাঅলা কোনো পুঁজিবাদী লোক একটা মেয়েকে গাল বকছে–ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে এক গৃহহীন লোক।

অসহায়, ভীতা মেয়েটা তার ত্রাতার পেছনে আশ্রয় নিতেই চেঁচামেচি শুরু করল স্যুট পরা লোকটা। তা শুনে ভয়ে পালিয়ে গেল তরুণী। নিরাশ্রয় লোকটাকে ধাক্কা মেরে সামনে থেকে সরিয়ে মেয়েটার পিছু নিল স্যুট পরা পয়সাঅলা। এরপর কী বীভৎস ব্যাপার ঘটবে, জানে সাইমন। তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো ফোনের পর্দায় তাকিয়ে রইল সে–চোখ দুটো বড় বড়, তাতে আশার ছায়া। যেন ভিডিয়োর ওই স্যুট পরা লোকটা বোকার মতো ঘুষি বসিয়ে দেবে না গৃহহীন ভবঘুরের মুখে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘুষিটা পড়তে দেখে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে নেমে এল সাইমন।

মুখ থুবড়ে শক্ত ফুটপাতে পড়ে গেল দয়ালু ভবঘুরে। বেপরোয়া স্যুট পরা পয়সাঅলা তাকে মাড়িয়ে আগে বাড়তে চাইল, কিন্তু তার পা আঁকড়ে ধরল গৃহহীন ভবঘুরে। ঠিক তখুনি বেজবল ক্যাপ পরা এক এশিয়ান–এই লোকটাও খুব দয়ালু–উদয় হলো দৃশ্যপটে। তার নাকেও কনুইয়ের গুঁতো মারল স্যুটধারী।

চোখ মুদে ফেলল সাইমন। 'উফ! জঘন্য ব্যাপার।'

'হুঁ।'

চোখ খুলে সবচেয়ে ভয়াবহ কাজটাই করল সাইমন। ভিডিয়োর মন্তব্যগুলো পড়তে শুরু করল একে একে।

'পয়সাঅলারা ভাবে এসব জঘন্য কাজ করেও পার পেয়ে যাবে ওরা।'

'মেয়েটাকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছিল ব্যাটা! কপাল ভালো, ওই সাহসী লোকটা বাধা দিয়েছে।'

'ড্যাডি ওয়ারবাককে চোদ্দ শিকের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া উচিত।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, টাকার কুমিরটা ছাড়া পেয়ে গেছে। লোকটা কালো হলে, গুলি করে মারা হতো।'

'মেয়েটাকে বাঁচিয়েছে যে লোকটা, সে ভীষণ সাহসী।'

'ভালো খবর,' হেস্টার বলল, 'অল্প কয়েকজন ফ্যান আছে তোমার।' ফোনটা নিয়ে স্ক্রল করে নিচে নামল সে। সাইমনের সমর্থনে করা কয়েকটা মন্তব্য দেখাল। ওর সব 'সমর্থকের' প্রোফাইল অবতারই ঈগল অথবা আমেরিকান পতাকা।

'ভয়াবহ অবস্থা,' গুঙিয়ে উঠল সাইমন। 'সাইকোগুলো সব আমার পক্ষে।'

'অত অবহেলা কোরো না। ওদের কয়েকজন জুরি বোর্ডে থাকতে পারে। এই কেস অবশ্য জুরিদের কাছে যাচ্ছে না। ট্রায়ালেই যাচ্ছে না। একটা কাজ করো।'

'কী?'

'রিফ্রেশ বাটনে চাপো,' বলল হেস্টার।

ওপরের কোনার দিকের তির চিহ্নে আঙুল ছোঁয়াল সাইমন। রিলোড হলো ভিডিয়োটা। কতজন দেখেছে আঙুল তুলে দেখাল দুঁদে উকিল। দুই লাখ ঊননব্বই হাজার থেকে এক লাফে চার লাখ তিপ্পান্ন হাজারবার দেখা হয়ে গেছে ওটা। মাত্র দু-মিনিটে।

'অভিনন্দন,' হেস্টার বলল। 'তুমি এখন ভাইরাল।'

(1,1) -13- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:18

৩

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সাইমন। পার্কের পরিচিত সবুজ এলাকাটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টকে বাঁয়ে ফেলে ওয়েস্ট সিক্সটি-সেভেন্থ স্ট্রিটে গাড়ি পড়ার পর শুনতে পেল হেস্টার বিড়বিড় করে বলছে, 'উহ-আহ।'

তার দিকে চোখ ফেরাল সাইমন।

নিউজ ভ্যান গিজগিজ করছে ওর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। ডজন দুয়েক বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছে নীল কাঠের ব্যারিকেডের পেছনে। ব্যারিকেডে লেখা:

পুলিশ লাইন—এই ব্যারিকেড অতিক্রম করবেন না।
এনওয়াইপিডি

'তোমার বউ কোথায়?' জানতে চাইল হেস্টার।

ইনগ্রিড। ওর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সাইমন। ঘটনাটা জানার পর ওর প্রতিক্রিয়া কী হবে, ভুলে গিয়েছিল তা-ও। এখন কটা বাজে সে ব্যাপারেও কোনো ধারণা নেই। হাতঘড়ি দেখল সে। সাড়ে পাঁচটা।

'কাজে।'

'ও তো শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, না?'

মাথা দোলাল সাইমন। 'নিউ ইয়র্ক-প্রেসবিটারিয়ানে, ১৬৮ নম্বর স্ট্রিটে।'

'ওর ডিউটি শেষ হবে কখন?'

'আজ রাতে সাতটায়।'

'নিজে ড্রাইভ করে বাড়ি ফেরে?'

'সাবওয়ে ধরে।'

'কল করো। টিম নিয়ে আসবে ওকে। তোমার বাচ্চারা কোথায়?'

'জানি না।'

'ওদেরও ফোন করো। মিডটাউনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে আমাদের ফার্মের। আজ রাতটা তোমরা ওখানে কাটাবে।'

'হোটেলে উঠতে পারি।'

মাথা নেড়ে মানা করল হেস্টার। 'তাহলে ওরা তোমাদের খুঁজে বের করে ফেলবে। অ্যাপার্টমেন্টে ওঠাই ভালো। ভেবো না, মাগনা থাকতে দেব না তোমাদের। চার্জ নেব।'

সাইমন কিছু বলল না।

'খারাপ সময়টা কেটে যাবে, সাইমন। আমরা যদি আগুনে ঘি না ঢালি, লোকে সব ভুলে যাবে। কাল, বড়জোর পরশুর মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে পড়বে পাগলগুলো। আমেরিকা কখনো এক জিনিসে বেশিক্ষণ মন বসাতে পারে না।'

ইনগ্রিডকে ফোন করল সে। কিন্তু আজ ওর ডিউটি ইমারজেন্সি রুমে, তাই সরাসরি ভয়েসমেইলে চলে গেল কলটা। সবকিছু বিস্তারিত জানিয়ে একটা মেসেজ দিল সাইমন। তারপর স্যামকে কল করল। ও ইতিমধ্যে সব জানে।

ছেলেটা জানাল, 'ভিডিয়োটার হিট এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে।' একইসঙ্গে হতবিহ্বল আর মুগ্ধ মনে হচ্ছে ওকে। 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না অ্যারনকে তুমি ঘুষি মেরেছ।' তারপর আবার বলল, 'তুমি!'

'তোমার বোনের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলাম।'

'সবাই এমনভাবে বলছে, যেন ঘটনাটা কোনো লম্পট বড়লোকের খামখেয়ালি।'

'ওরকম কিছু করিনি আমি।'

'জানি।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

'টিম তাহলে তোমাকে নিতে আসছে...'

'লাগবে না। আমি বার্নস্টাইনদের সঙ্গে থাকব।'

'নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'ওর বাবা-মার আপত্তি নেই তো?'

'ল্যারি বলেছে, কোনো সমস্যা নেই। প্র্যাকটিস শেষে ওর সঙ্গে যাব।'

'ঠিক আছে, তোমার যেটা ভালো লাগে। সিদ্ধান্ত বদলালে...'

'চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক থাকব।' তারপর গলার স্বর আরো কোমল করে ফেলল স্যাম: 'ভিডিয়োতে...পেইজকে দেখলাম...ওকে...'

কথা হারিয়ে চুপ করে গেল সে।

'আচ্ছা, রাখছি এখন।' ফোন কেটে দিল সাইমন।

এরপর আনিয়াকে তিনবার কল করল সে। জবাব পেল না। কিছুক্ষণ পর ওর নম্বর থেকে ফিরতি কল এল। ফোনটা রিসিভ করল সাইমন—আনিয়ার গলা ভেসে এল না ওপাশ থেকে।

'হ্যালো, সাইমন, সুজি ফিস্ক বলছি।'

সুজি ওদের দোতলা নিচে থাকে। তিন বছর বয়স থেকে আনিয়ার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে তার মেয়ে ডেলিয়া।

'আনিয়া ঠিক আছে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ। মানে, চিন্তা করার কিছু নেই। স্রেফ একটু আপসেট হয়েছে আরকি। ভিডিয়োটা দেখে।'

'ওটা দেখেছে ও?'

'হ্যাঁ। অ্যালিসা এডওয়ার্ডসকে চেনো? বাচ্চাদের নিতে আসার সময় সব বাবা-মাকে ওটা দেখাচ্ছিল ও। কিন্তু বাচ্চারা ততক্ষণে...জানোই তো আজকাল ওদের কাছে কিছুই চেপে রাখা যায় না।'

'আনিয়াকে একটু দেবে, প্লিজ?'

'সেটা বোধহয় ঠিক হবে না, সাইমন।'

রাগ হলো সাইমনের। ওর মেয়ের জন্যে কী ঠিক, কী বেঠিক, সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব কে দিল সুজিকে? কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখল সাইমন। আগেরবার মাথাগরম করার ফল তো এখন হাতেনাতেই পাচ্ছে। তাছাড়া সুজি ভুলও বলেনি।

গলা খাঁকারি দিল সাইমন, তারপর যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'প্লিজ, ফোনটা একটু আনিয়াকে দেবে?'

'চেষ্টা করব।' সুজির কণ্ঠস্বর ফিকে হয়ে এল। 'আনিয়া–তোমার বাবা, কথা বলবে...আনিয়া?' খানিকক্ষণের নীরবতা। 'ও শুধু মানা নাড়ছে, সাইমন। কথা বলবে না। তুমি চিন্তা কোরো না, যতক্ষণ খুশি আমাদের এখানে থাকতে পারে ও। পরে ওর মেজাজ ঠান্ডা হলে তুমি বা ইনগ্রিড ফোন করতে পারো।'

আর জোরাজুরি করার মানে হয় না। 'ধন্যবাদ, সুজি।'

'আমি–সত্যিই দুঃখিত।'

'আরে না, না। আমারই দোষ। সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

যোগাযোগ কেটে দিল সে। হাতের আইসক্রিম স্যান্ডউইচের দিকে তাকিয়ে আছে হেস্টার। বলল, 'তখন আইসক্রিমটা নিলে না কেন ভেবে আফসোস করছ নিশ্চয়ই? টিম?'

'বলো, হেস্টার।'

'কুলারে বাড়তি আইসক্রিমটা আছে?'

'আছে।' ওটা বের করে মালকিনের হাতে দিল লোকটা।

সাইমন বলল, 'আইসক্রিমের বিলও নেবে আমার কাছ থেকে, না?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমি নিচ্ছি না।'

'তোমার ফার্ম নিচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মহিলা। আইসক্রিমটা দিল সাইমনকে। ওতে কামড় বসাল সে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আগের চেয়ে ভালো বোধ করল।

কিন্তু অনুভূতিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

***

ল ফার্মের অ্যাপার্টমেন্টটা একটা বিজনেস টাওয়ারে, হেস্টারের অফিসের নিচতলায়। ফার্মটা দেখার মতোই বটে। মেঝেতে হলদেটে ধূসর বর্ণের পশমি কার্পেট পাতা। আসবাবপত্র, এমনকি দেয়ালের রংও হালকা ধূসর। সবই হালকা ধূসর রঙের।

'দারুণ ইন্টেরিয়র ডেকোরেটিং, না?' পাশ থেকে বলল হেস্টার।

'ধূসর রং পছন্দ হলে ভালো লাগবে।'

'ধূসর না, "মেটে"।'

'মেটে রং,' বিড়বিড় করল সাইমন। 'ধুলোর মতো।'

ফোন বেজে উঠল হেস্টারের। মেসেজ এসেছে। ওটা পড়ল সে। তারপর বলল, 'তোমার বউ আসছে–রাস্তায়। আমি নিচে গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ।'

ইনগ্রিডকে নিয়ে আসতে গেল হেস্টার। সাহস করে ঝটপট একবার নিজের ফোনে চোখ বুলিয়ে নিল সাইমন। অগুনতি মেসেজ আর মিসড কল দেখতে পেল। ইনগ্রিডের বোন, ইভোনির কাছ থেকে আসা মেসেজটা বাদে বাকিগুলোর দিকে চোখ তুলেও তাকাল না সে। পিপিজি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে ওর পার্টনার ইভোনি। কাজেই তাকে একটা ব্যাখ্যা দেয়া সাইমনের কর্তব্য। তাই ঝটপট মেসেজ পাঠাল সে:

আমি ঠিক আছি। লম্বা কাহিনি।

সাথে সাথে সাড়া দিল ইভোনি:

আমরা কিছু করতে পারি?

না। কাল কাভারেজ দরকার হতে পারে।

কোনো চিন্তা কোরো না।

যখন পারি, পুষিয়ে দেব।

কিছু ইমোজি পাঠিয়ে ওকে আশ্বস্ত করল ইভোনি। চিন্তা করতে নিষেধ করে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাকি মেসেজগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বোলাল সাইমন।

ইনগ্রিডের কোনো মেসেজ নেই।

কয়েক মিনিট অ্যাপার্টমেন্টের ধূসর কার্পেটের ওপর অস্থির চিত্তে পায়চারি করে বেড়াল সাইমন। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখল কিছুক্ষণ, কাউচে বসে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল, তারপর আরো খানিকক্ষণ পায়চারি করল। যতগুলো ফোনকল এল, সব পাঠিয়ে দিল ভয়েসমেইলে। শেষমেশ আনিয়ার

স্কুল থেকে একটা ফোন আসাতে রিসিভ করল। সে 'হ্যালো' বলতে ওপাশ থেকে চমকে উঠল যেন ফোনদাতা।

'ওহ্,' অ্যাবারনেথি একাডেমির প্রিন্সিপাল, আলি করিমের গলা চিনতে পারল সাইমন। 'আপনি ফোন ধরবেন আশা করিনি।'

'সব ঠিক আছে তো?'

'আনিয়া ঠিক আছে। ওর জন্য ফোন করিনি।'

'আচ্ছা,' বলল সাইমন। 'তাহলে আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, আলি?'

'একটু স্পর্শকাতর ব্যাপার।'

'হুম।'

'ব্যাপারটা আগামী মাসের অভিভাবকদের চ্যারিটি বল নিয়ে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সাইমন।

'জানেন বোধহয়, কাল রাতে কমিটির মিটিং।'

'জানি। ইনগ্রিড আর আমি কো-চেয়ার।'

'হ্যাঁ। এই ব্যাপারেই কথা বলতে চাই।'

সাইমন টের পেল, ফোনের ওপর অস্বাভাবিক জোরে চেপে বসেছে ওর হাতের আঙুল। প্রিন্সিপাল ওর মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু মুখ খুলল না সে।

'কয়েকজন অভিভাবক মনে করেন, কাল আপনাদের না আসাটাই ভালো হবে।'

'কোন্ কোন্ অভিভাবক মনে করেন?'

'তাদের নাম বলতে চাচ্ছি না।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা জটিল করে তুলবেন না, সাইমন। ওই ভিডিয়োটার ব্যাপারে ওরা আপসেট হয়ে আছেন।'

'হুমম,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সাইমন।

'কী বললেন?'

'এ কথা বলতেই ফোন করেছিলেন?'

'উম...ঠিক তা না।'

এবারও সাইমনের মুখ খোলার আশায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল প্রিন্সিপাল। এবারও আগের মতোই চুপ করে রইল সাইমন।

অগত্যা প্রিন্সিপালই কথা বলল শেষমেশ। 'জানেনই তো, চ্যারিটি বলে এ বছর গৃহহীনদের কোয়ালিশনের জন্য তহবিল তোলা হবে। সাম্প্রতিক ঘটনার জেরে আমাদের মনে হচ্ছে, আপনি আর ইনগ্রিড কো-চেয়ার হিসেবে বহাল না থাকাটাই ভালো হবে।'

'সাম্প্রতিক কোন্ ঘটনা?'

'আপনি জানেন।'

'লোকটা উদ্বাস্তু ছিল না। ও একটা ড্রাগ ডিলার।'

'ওসব আমি জানি না...'

'আমি জানি, আপনি জানেন না,' বাধা দিল সাইমন। 'সেজন্যই জানাচ্ছি।'

'...কিন্তু বেশিরভাগ সময় আসল ব্যাপারের চেয়ে দেখে যা মনে হয়, তা-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।'

'হুম। ...বাচ্চাদেরকে আপনারা এসবই শেখান?'

'চ্যারিটির ভালোর জন্যই করতে হচ্ছে এসব।'

'আচ্ছা। কাজটা যে উপায়েই করা হয়ে থাকুক, ফলাফলটাই আসল, তাই না?'

'আমি তা বলছি না।'

'আপনি মহান শিক্ষক, আলি।'

'আপনি বোধহয় আমার কথায় রেগে গেছেন।'

'রাগিনি, হতাশ হয়েছি বলতে পারেন। যাকগে, আপনি যা বললেন তা-ই হবে। আমাদের চেকটা ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।'

'স্যরি?'

'আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য আমাদেরকে কো-চেয়ার বানাননি আপনারা। বানিয়েছিলেন বলের জন্য মোটা টাকা অনুদান দিয়েছিলাম বলে। এখন যেহেতু আমরা আর কো-চেয়ার নেই...'

'দাতব্য তহবিলে যে টাকা দান করেছেন, সেটা ফেরত চান আপনারা?' আলির কণ্ঠে তীব্র অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ। আজ রাতের মধ্যেই চেকটা পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে দুদিন পরে পাঠালেও চলবে। ভালো থাকবেন, আলি।'

সংযোগ কেটে দিয়ে ফোনটা কাউচের ওপর ছুঁড়ে ফেলল সাইমন। এত বড় ভণ্ডামি সে করতে পারবে না। অনুদানটা দেবে, তবে স্কুলের বলনাচের তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে নয়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, ইনগ্রিড আর হেস্টার দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে।

'আইনি না, একটা ব্যক্তিগত উপদেশ দেই,' হেস্টার বলল। 'ঘণ্টা কয়েক কারো সাথে যোগাযোগ কোরো না, কেমন? এরকম চাপে লোকে সাধারণত তাড়াহুড়ো করে বোকার মতো সিদ্ধান্ত নেয় বা কাজ করে ফেলে। তুমি অবশ্য ওরকম করবে না। তবে পরে অনুশোচনা করার চেয়ে এখন সতর্ক থাকাই নিরাপদ।'

ইনগ্রিডের দিকে তাকাল সাইমন। বেশ লম্বা ওর স্ত্রী, চেহারায় রাজকীয় আভিজাত্য, চোয়ালের হাড় একটু উঁচু, মাথায় খাটো ধূসর-সোনালি চুল।

কলেজে পড়ার সময় কিছুদিন মডেল হিসেবে কাজ করেছিল। দেখতে খানিকটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের মতো লাগে ওকে। একটু শীতল স্বভাব। তাই ওর শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারটা একটু যেন বেমানান লাগে। এই পেশায় বাচ্চাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়। বাচ্চাদের কাছে অবশ্য ওকে শীতল স্বভাবের মনে হয় না। প্রথম দেখায়ই ওরা ইনগ্রিডকে ভালোবেসে ফেলে, ওর ওপর ভরসা রাখে। ব্যাপারটা একটু অপার্থিবই, ওরা যেন সরাসরি ওর হৃদয় পড়তে পারে।

'তোমরা কথা বলো, আমি যাই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হেস্টার। ও চলে যেতেই *এসব-কী-হচ্ছে* ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ইনগ্রিড, চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি। ওকে পুরো ঘটনা খুলে বলল সাইমন।

'পেইজ কোথায় ছিল, তুমি জানতে?' ওর বলা শেষ হলে জিজ্ঞেস করল ইনগ্রিড।

'বললামই তো, চার্লি ক্রাউলি জানিয়েছিল।'

'আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলে তুমি। তারপর ওই উদ্বাস্তু লোকটা...ডেভ...'

'ও উদ্বাস্তু কি না জানি না। শুধু জানি, মিউজিশিয়ানদের শিডিউল ও ঠিক করে।'

'তুমি কি এখন আমার সাথে শব্দের খেলা খেলতে চাও, সাইমন?'

উঁহু, চায় না।

'তা এই ডেভ...তোমাকে জানাল যে পেইজ আসছে ওখানে?' আবার বলল ইনগ্রিড।

'ওর তা-ই ধারণা ছিল।'

'আর সে কথা তুমি আমাকে জানাওনি?'

'আমি নিশ্চিত জানতাম না,' জবাব দিল সাইমন। 'নিশ্চিত না হয়ে শুধু শুধু তোমাকে আপসেট করে কী লাভ?'

মাথা নাড়ল ইনগ্রিড।

'কী?'

'তুমি কখনো আমার সঙ্গে মিথ্যে বলো না, সাইমন।'

কথাটা সত্যি। বউয়ের সঙ্গে সে কখনো মিথ্যে বলে না। এক অর্থে, এখনো বলছে না। কিন্তু সত্যটাকে খানিকটা চাপা দিচ্ছে। এই কাজটাও যথেষ্ট খারাপ হচ্ছে।

'স্যরি,' বলল সাইমন।

'আমাকে জানাওনি, কারণ তুমি ভয় পাচ্ছিলে, আমি তোমাকে যেতে দেব না।'

'আংশিক সত্যি,' স্বীকার করল সাইমন।

'আর কী কারণে বলোনি?'

'কারণ এটুকু বললে বাকিটুকুও বলতে হতো তোমাকে। জানাতে হতো ওকে কীভাবে খুঁজছিলাম আমি।'

'ওকে না খোঁজার ব্যাপারে আমরা একমত হওয়ার পরও?'

সত্যি বলতে, সাইমন একমত হয়নি। আইনটা ইনগ্রিডই করেছিল, সে তার প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু এখন এসব নিয়ে কথা কাটাকাটির সময় না। 'আমি...আমি...ওকে ওভাবে যেতে দিতে পারিনি।'

'তোমার কি মনে হয়, আমি পেরেছি?'

কিছু বলল না সাইমন।

'তোমার কি ধারণা, আমার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছ তুমি?'

'না, মোটেই না।'

'ফালতু কথা। তোমার ধারণা, ওর ব্যাপারে খুব বেশি শীতল আচরণ করছিলাম আমি।'

না বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দমে গেল।

'তোমার প্ল্যান কী ছিল, সাইমন? আবার ওকে রিহ্যাবে পাঠাতে?'

'হ্যাঁ, কেন পাঠাব না?'

চোখ বন্ধ করে ফেলল ইনগ্রিড। 'কতবার চেষ্টা করেছি আমরা, বলো তো...?'

'যতবারই করি, কোনোবারই যথেষ্ট না।'

'ওকে তুমি সাহায্য করতে পারবে না। ব্যাপারটা পেইজের নিজের উপলব্ধির। সেটা বুঝতে পারছ না? পেইজকে "চলে যেতে দিয়েছি" মানে এই না যে ওকে আমি আর ভালোবাসি না। ওকে যেতে দিয়েছি, কারণ ও চলে গেছে। কারণ ওকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? আমরা ওকে ফিরিয়ে আনতে পারব না। ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে কেবল ও-ই।' একটানা কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল ইনগ্রিড।

ধপ করে কাউচে বসে পড়ল সাইমন। ইনগ্রিডও বসল ওর পাশে। কিছুক্ষণ পর স্বামীর কাঁধে মাথা রাখল সে।

'আমি একটা চেষ্টা করেছিলাম,' ক্লান্ত স্বরে বলল সাইমন।

'জানি।'

'চেষ্টা করতে গিয়ে সব জট পাকিয়ে ফেলেছি।'

ওর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ইনগ্রিড। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সাইমন। যদিও জানে, ঠিক হবে না, কক্ষনো ঠিক হবে না।

৪

তিন মাস পর।

নিজের অফিসে বসে আছে সাইমন। মিশেল ব্র্যাডি বসে রয়েছে ওর সামনে। অফিসটা আটত্রিশতলায়। এককালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার যেখানে ছিল, সেই জায়গাটা দেখা যায় এখান থেকে। টাওয়ারটার ওপর যেদিন হামলা চালানো হয়, সেদিন অফিসেই ছিল সে। নিজের চোখে দেখেছে টাওয়ারটাকে ধ্বংস হতে। কিন্তু এ নিয়ে কখনো কারো সঙ্গে কথা বলেনি। সাইমন কখনো নয়-এগারোর ওপর বানানো কোনো তথ্যচিত্র বা খবর দেখে না, জায়গাটাতে যেতেও পারে না। ডানে তাকালে চোখে পড়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। আটত্রিশতলা থেকে ভাস্কর্যটাকে খুব ছোট দেখায়। মাঝে মাঝে সাইমন খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে ওটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে–তখন সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় ওর।

'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' সজল চোখে বলল মিশেল। 'বন্ধু হিসেবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছ তুমি।'

কথাটা ভুল, সাইমন তার বন্ধু না। সে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, মহিলা ওর মক্কেল। তবে মিশেলের কথা ওর মন ছুঁয়ে গেছে। এ কথাগুলোই শুনতে চায় সে। তাছাড়া একদিক থেকে ও তো বন্ধুই, তাই না?

পঁচিশ বছর আগে–রিক আর মিশেল ব্র্যাডির প্রথম সন্তান, এলিজাবেথের জন্মের পর–সাইমন একটা হেফাজতি অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়, যাতে সন্তানের কলেজ খরচের জন্য টাকা জমাতে পারে রিক আর মিশেল।

তেইশ বছর আগে, তাদের প্রথম বাড়ির জন্যে বন্ধকের ব্যবস্থা করে দেয় সাইমন।

একুশ বছর আগে, ব্র্যাডিরা যেন চীন থেকে তাদের মেয়ে মেই-কে দত্তক নিতে পারে সেজন্যে সমস্ত কাগজপত্র ঠিক করে দেয় সে।

বিশ বছর আগে, রিককে ঋণের ব্যবস্থা করে দেয় সাইমন। সেই টাকায় বিশেষায়িত প্রিন্টিং সার্ভিস চালু করে রিক। ব্যবসাটা এখন পঞ্চাশটা স্টেটে বিস্তৃত।

আঠারো বছর আগে, ওর সাহায্যে নিজের প্রথম আর্ট স্টুডিয়ো খোলে মিশেল।

এই বছরগুলোতে বহুবার রিকের সঙ্গে ব্যবসা বাড়ানো, ব্যবসার পরিকল্পনা আর ভালো-মন্দ নিয়ে আলাপ করেছে সাইমন। বিনিয়োগ, কোম্পানির বেতন দেয়ার নীতি, পারিবারিক ছুটির খরচ, লেকের ধারে ফিশিং কেবিন কেনা–এসব নিয়েও পরামর্শ করেছে দুজনে। মোদ্দা কথা, ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রায় সব কাজেই সাইমন পরামর্শ দিয়েছে রিককে।

দু-বছর আগে, এলিজাবেথের বিয়ের খরচ জোগাড় করবার জন্যে রিক ও মিশেলকে সবচেয়ে ভালো উপায়টা বাতলে দেয় সাইমন। বিয়েতে সে-ও গিয়েছিল। মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর সময় কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রিক আর মিশেল।

এক মাস আগে, যে গির্জায় মিশেলের বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল, সেই একই গির্জায় যায় সাইমন–এবার রিকের শেষকৃত্যে।

এখন সে মিশেলকে স্বামীবিয়োগের শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে। মহিলাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কী করে ব্যবসার কাজকর্ম সামলাতে হবে। রিক অবশ্য প্রায় সব কাজই গুছিয়ে দিয়ে গেছে–খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হবে না তার স্ত্রীকে।

'তোমাদের সাহায্য করতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল সাইমন।

'সব ঠিকঠাক করে রেখে গেছে রিক,' আর্দ্র স্বরে বলল মিশেল।

'জানি।'

'মনে হচ্ছে, চলে যেতে যে হবে তা যেন জানত ও। অথচ সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল ওর। নাকি আমার কাছ থেকে কোনো অসুখ-বিসুখের কথা লুকিয়েছিল? তোমার কি মনে হয়, ও জানত এত তাড়াতাড়ি চলে যাবার কথা?'

মাথা নাড়ল সাইমন। 'না, আমার তা মনে হয় না।'

আটান্ন বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে রিক। সাইমন পেশায় উকিল বা ইনস্যুরেন্স এজেন্ট না হলেও, কারো অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হওয়া মানেই তার বিষয়সম্পত্তির ভালো-মন্দ দেখভাল করা। তাই এ ব্যাপারে রিকের সঙ্গে কথা বলতে সে। তার বয়সের বেশিরভাগ মানুষের মতোই রিকও কখনো নিজের মৃত্যু নিয়ে কোনো কথা বলত না।

সহসা বেজে উঠল সাইমনের পকেটের ফোন। একটা কঠোর নিয়ম মেনে চলে সে: মক্কেলের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য কোনোদিকে মন দেয়া যাবে

না। তার অফিসে লোকে আসে তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর একটা, টাকা, নিয়ে কথা বলতে।

টাকায় হয়তো সুখ কেনা যায় না, কিন্তু... দুত্তোর, ওসব বাজে কথা। টাকা আসলে এমন কিছু জিনিস কিনতে পারে, যেসবের সমন্বয়ে সুখ নামক অলীক জিনিসটা গড়ে ওঠে। অর্থের সুবাদে ভালো শিক্ষা, খাবার-দাবার, সেরা ডাক্তার পাওয়া যায়। এসবের ফলে পাওয়া যায় মনের শান্তি। টাকা মানুষকে আরাম-আয়েশ আর স্বাধীনতা এনে দেয়। এর বদৌলতে মানুষ অভিজ্ঞতা এবং নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা পায়। অর্থের সবচেয়ে বড় সুফল হলো, এর বিনিময়ে মানুষ সময় কিনতে পারে। সময় জিনিসটা পরিবার ও স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

সে কারণেই সাইমনের অখণ্ড মনোযোগ দাবি করতে পারে মিশেল ব্র্যাডি। তাই এ সময় পকেটের ফোন বেজে ওঠা মানে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

আড়চোখে কম্পিউটারের পর্দার দিকে চাইল সে। একটা মেসেজ এসেছে ওদের নতুন সহকারী, খলিলের কাছ থেকে:

একজন পুলিশ ডিটেকটিভ এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত মেসেজটার দিকে তাকিয়ে রইল সাইমন। ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল মিশেলের। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ। একটা...'

'কী?'

'হুট করে একটা কাজ পড়ে গেছে আরকি।'

'ওহ, আচ্ছা। আমি তাহলে পরে আসি?' বলল মিশেল।

'দুইটা সেকেন্ড সময় দিতে পারবে শুধু...?' ইশারায় ডেস্কের ওপর রাখা ফোন দেখাল সে মহিলাকে।

'অবশ্যই।'

রিসিভার তুলে খলিলের লাইন ধরল সাইমন।

'আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে নামের এক ডিটেকটিভ আসছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে,' জানাল খলিল।

'কোথায় এখন? এলিভেটরে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি না বলা পর্যন্ত তাকে রিসেপশনে আটকে রাখতে বলো।'

'ঠিক আছে।'

'মিসেস ব্র্যাডির ক্রেডিট কার্ডের ফর্ম পূরণ করে রেখেছ তো?'

'জি।'

(2,1) -18- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:20

'তাহলে ওর স্বাক্ষর নিয়ে নাও। দেখো, আজই যেন ওর আর মেইয়ের কার্ডটা ইশ্যু হয়ে যায়। অটোমেটিক পেমেন্ট কীভাবে করতে হয়, দেখিয়ে দিয়ো ওকে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার কাজ শেষ হতে হতে আমার কাজও হয়ে যাবে।'

ফোন নামিয়ে রেখে মিশেলের দিকে ফিরল সাইমন। 'হুট করে বাধা পড়ে গেল। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'কোনো সমস্যা নেই,' স্মিত হেসে বলল মহিলা।

না, সমস্যা আছে। 'ইয়ে...কয়েক মাস ধরে আমার অবস্থার কথা তো জানোই।'

মাথা দোলাল মিশেল। সবাই-ই জানে। ভাইরাল ভিডিয়োটার সৌজন্যে কুখ্যাত খলনায়কে পরিণত হয়েছে সাইমন। ঘটনার পরদিনই এবিসি, এনবিসি আর সিবিএস-এর সকালের শো-তে ভিডিয়োটা প্রচার করে ওটা নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করা হয়। কেইবল নিউজও রেহাই দেয়নি। অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল হেস্টার ক্রিমস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী। ঘটনার পরের কয়েকটা দিন বাজার গরম করে রাখে ভিডিয়োটা। তারপর মাসের শেষদিকে মিইয়ে যায় সমস্ত উত্তেজনা—লোকের মনোযোগ সরে যায় অন্যদিকে। প্রথম হপ্তায় ভিডিয়োটা দেখা হয়েছিল আশি লক্ষবার। প্রায় তিন মাস পেরিয়ে যাবার পর দেখেছে পঁচাশি লক্ষেরও কম মানুষ।

'কেন, নতুন কিছু হয়েছে?' জানতে চাইল মিশেল।

তাকে কিছু জানানো ঠিক হবে কি না ভাবল সাইমন। খানিক ভেবে জানানোই স্থির করল। 'একজন পুলিশ আসছে আমার সাথে দেখা করতে।'

'রিক তো বলেছিল, অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

'দেয়া হয়েছিল।'

এ ব্যাপারেও ঠিক অনুমান করেছিল হেস্টার। গত তিন মাসে অ্যারন কিংবা পেইজ, কারো টিকিটিরও দেখা পাওয়া যায়নি। কোনো ভিক্টিম যেহেতু নেই, তাই কোনো কেসও দাঁড় করানো যায়নি।

এরপর আর কোনো গোলমাল হয়নি। বিব্রতকর কোনো পরিস্থিতিতেও পড়তে হয়নি সাইমনকে। ঘটনার দুই হপ্তা পর ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে প্রিন্সিপাল করিম। সরাসরি মাফ চায়নি সে, তবে ঠারেঠোরে নিজের সমর্থন জানিয়েছে। মনে করিয়ে দিয়েছে, সাইমন আর ইনগ্রিডও অ্যাবারনেথি একাডেমি 'পরিবারের' সদস্য। তাকে গোল্লায় যেতে বলতে চেয়েছিল সাইমন, কিন্তু ইনগ্রিড মনে করিয়ে দেয় যে, আনিয়া ওই স্কুলেই পড়ছে। কাজেই জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখে সে, অনুদানের চেকটাও ফিরিয়ে দেয়। তারপর থেকে নির্বিঘ্নেই কাটছে জীবন।

নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের একমাত্র ছোট্ট ঝামেলাটা হলো, সাইমনকে সমস্ত অভিযোগ থেকে একেবারে দায়মুক্তি দেবার আগে কিছুদিন অপেক্ষা করতে চায় ম্যানহাটন ডিএ।

'পুলিশটা এখানে আসছে কেন, জানো?' জিজ্ঞেস করল মিশেল।

'না,' সাইমনের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তোমার বোধহয় উকিলকে ফোন করা উচিত।'

'আমিও তা-ই ভাবছি।'

উঠে দাঁড়াল মিশেল। 'আমি তাহলে আসি।'

'তোমাকে ঠিকমতো সময় দিতে পারলাম না। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'ধুর, আমি কিছু মনে করিনি।'

সাইমনের অফিসটা কাচে ঘেরা। খলিল দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে ইশারায় তাকে ভেতরে ঢুকতে বলল সে। তারপর মিশেলের দিকে ফিরে বলল, 'খলিল তোমার সব কাগজপত্র ঠিকঠাক করে দেবে। পুলিশ অফিসারের সাথে কথা শেষ হলেই আমি...'

'আমার কোনো তাড়া নেই। তুমি ধীরে-সুস্থে কাজ সারো,' মিশেল বলল।

সাইমনের সঙ্গে করমর্দন সেরে উঠে দাঁড়াল সে। তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল খলিল। লম্বা দম নিল সাইমন। ফোন তুলে নিয়ে হেস্টার ক্রিমস্টাইনের অফিসের নম্বর ডায়াল করল। কল রিসিভ করতে দেরি করল না মহিলা।

'কী খবর?'

'একজন পুলিশ এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'কোথায়?'

'আমার অফিসে।'

'সত্যি?'

'না, হেস্টার। তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি।'

'দারুণ! রসিক ক্লায়েন্টদের আমি খুব পছন্দ করি।'

'এখন কী করব?'

'শালা,' খিস্তি ঝাড়ল হেস্টার।

'কী?'

'শালারা জানে আমি তোমার উকিল। তারপরও আমাকে না জানিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত না ওদের।'

'আমি তাহলে কী করব এখন?'

'এখুনি আসছি আমি। লোকটার–কিংবা মহিলাটার সঙ্গে কথা বোলো না।'

‘লোকটা,’ বলল সাইমন। ‘ভেবেছিলাম, ডিএ সব অভিযোগ তুলে নিচ্ছে...কোনো কেস দাঁড় করায়নি।’

‘ওরা খুব বজ্জাত। খিঁচ মেরে বসে থাকো। একটা কথাও বলবে না।’

টোকা পড়ল দরজায়; পরক্ষণেই ভেতরে ঢুকল ইনগ্রিডের বোন, ইভোনি প্রেভিডি। বোনের মতো এত সুন্দর না ইভোনি, তবে তার চেয়ে অনেক বেশি ফ্যাশনদুরস্ত। তার পরনে গোলাপি পেন্সিল স্কার্ট, ক্রিম রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে চার ইঞ্চি উঁচু ভ্যালেন্টিনো জুতো।

ইনগ্রিডের আগে ইভোনির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাইমনের, মেরিল লিঞ্চে, ট্রেনিং প্রোগ্রামে। দেখা হওয়ার সাথে সাথে প্রাণের বন্ধু হয়ে যায় দুজনে। সেসব ছাব্বিশ বছর আগের ঘটনা। প্রশিক্ষণ শেষ হবার কদিন পরই ইভোনির বাবা, বার্ট প্রেভিডি, তার বাড়ন্ত ফার্মে দুজন পার্টনার নেন—তার নিজের মেয়ে ইভোনি আর সাইমন গ্রিন। সাইমন তখনও তার মেয়েকে বিয়ে করেনি।

পিপিজি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট—নামটার দুটো পি দুই প্রেভিডির প্রতিনিধিত্ব করে, জি প্রতিনিধিত্ব করে গ্রিনের।

ফার্মটার মূলনীতি: *আমরা সৎ, কিন্তু নামের ব্যাপারে খুব সৃজনশীল নই*।

‘কী ব্যাপার, হঠাৎ পুলিশ কেন?’ জানতে চাইল ইভোনি।

চার সন্তানের বাবা-মা ইভোনি আর রবার্ট। থাকে শর্ট হিলসের শহরতলিতে। স্যামের জন্মের পর সাইমন আর ইনগ্রিডও কিছুদিন আপার ওয়েস্ট সাইডের শহরতলিতে থাকার চেষ্টা করেছিল। অনেকেই প্রথম এক-দুই সন্তানের জন্মের আগ পর্যন্ত শহরে থাকে। তারপর ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে চলে যায় শহরতলিতে। খোলামেলা বড়সড় কোনো বাড়িতে বসবাস শুরু করে। বাচ্চাদের ভর্তি করে দেয় ভালো কোনো স্কুলে—ওদের দৌড়-ঝাঁপের জন্যে প্রচুর জায়গা থাকে বাড়িতে। কিন্তু শহরতলি ভালো লাগেনি সাইমন আর ইনগ্রিডের। শহরের হই-হট্টগোল, প্রাণচাঞ্চল্য, ব্যস্ততা ছেড়ে থাকতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল ওরা। বড় শহরে রাতের বেলায় হাঁটতে বেরোলে দেখার মতো কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবেই। শহরতলিতে রাতে হাঁটতে বের হলে জন-মনিষ্যির দেখাও পাওয়া যায় না। চারপাশের নীরবতা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে বুকের ওপর। দু-বছর মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে ওরা, পারেনি। শেষমেশ বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছে ম্যানহাটনে।

ফিরে এসে কি ভুল করেছিল?

সাইমনের তা মনে হয় না। শহরতলিতে থাকলেই যে ছেলেমেয়েরা শান্ত-সুবোধ থাকত, তার কী নিশ্চয়তা আছে? তাছাড়া পেইজ তো হাই স্কুল পর্যন্ত ঠিকই ছিল। সব ওলটপালট হয়ে গেল ও যখন বড় শহর ছেড়ে মফস্বল পরিবেশের কলেজে গেল পড়তে। তখন থেকেই শুরু হলো সব গোলমাল।

‘লোকটাকে দেখেছ?’ জিজ্ঞেস করল সাইমন।

মাথা দোলাল ইভোনি। 'এইমাত্র রিসেপশনে ঢুকেছে। কেন এসেছে বলো তো?'

'জানি না।'

'হেস্টারকে ফোন করেছ?'

'হ্যাঁ। আসছে।'

'লোকটা দেখতে দারুণ।'

'কে?'

'পুলিশটা। *জিকিউ* ম্যাগাজিনের কাভার মডেল হতে পারত।'

মাথা দোলাল সাইমন। 'খুব দরকারি একটা তথ্য দিলে। অজস্র ধন্যবাদ।'

'মিশেলের সাথে কথা বলব আমি?'

'খলিল আছে ওর সঙ্গে। তবে তুমি একটু দেখলেও ভালো হয়।'

'ঠিক আছে।'

বেরোনোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ইভোনি; সেই মুহূর্তে চকচকে ধূসর স্যুট পরা লম্বা, কালো এক লোক উদয় হলো দোরগোড়ায়। 'মি. গ্রিন?'

হ্যাঁ, *জিকিউ*-এর মডেল হওয়ার মতো সুদর্শনই বটে লোকটা। পরনের স্যুট দেখে মনে হচ্ছে ওটা শুধু তার জন্যেই বানানো হয়েছে, অন্য কারো গায়ে মানাবে না। সুপারহিরোরা যেমন আঁটসাঁট স্যুট পরে, সে-ও একই কায়দায় পরেছে ওটা। লোহার মতো পেটানো গড়ন লোকটার। মাথা কামানো, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে ছাঁটা। হাত দুটো বিশাল।

ইভোনি ইশারায় সাইমনকে বলল, 'কি, বলেছিলাম না?'

'আমি এনওয়াইপিডি-র ডিটেকটিভ আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে।'

'আপনার তো এখানে আসার কথা না,' বলল সাইমন।

ঝকঝকে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল লোকটা। হাসিটা এতই সুন্দর, এক পা পিছিয়ে গেল ইভোনি। 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করার জন্য আসিনি, তাই না?' পকেট থেকে ব্যাজ বের করল সে। 'এসেছি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে।'

ইভোনি এখনো জায়গা ছেড়ে নড়েনি।

'হাই,' তার দিকে ফিরে বলল ডিটেকটিভ।

হাত নাড়ল ইভোনি, মুখে কথা জোগাচ্ছে না। ভুরু কোঁচকাল সাইমন।

'আমার উকিলের জন্য অপেক্ষা করছি,' বলল সে।

'কে, হেস্টার ক্রিমস্টাইন?'

'হ্যাঁ।'

আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে অফিসে ঢুকে পড়ল আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল সাইমনের সামনে। 'ভালো উকিল মহিলা।'

'হুম।'

'শুনেছি, সেরাদের একজন।'

'ঠিকই শুনেছেন। ও আসার আগে আপনার সঙ্গে কথা বলতে মানা করেছে।'

ভুরু নাচিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল ফ্যাগবেনলে। 'মানা করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি না?'

'রাজি না, তা তো বলিনি। আমি শুধু আমার উকিলের আসার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'তাহলে আপনি এখন আমার সঙ্গে কথা বলবেন না?'

'বললামই তো, আমার উকিল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'আমাকেও অপেক্ষা করতে বলছেন?'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে গোয়েন্দার কণ্ঠ। সাইমন আড়চোখে দেখল, উৎকর্ণ হয়ে ওদের কথা শুনছে ওর শালী।

'তা-ই বলছেন আপনি, সাইমন? এটাই আপনার চূড়ান্ত জবাব?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি।'

'মানে, সত্যিই আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি না আপনি?'

'বলব, আমার উকিল এলেই বলব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'ঠিক আছে, আসি তাহলে।'

'আপনি কিন্তু রিসেপশনে অপেক্ষা করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা হবে না।'

'যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে হেস্টার।'

'সাইমন? ভালো কথা, আপনাকে শুধু সাইমন বলে ডাকলে কিছু মনে করবেন না তো?'

'মোটেও না।'

'আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের খুব ভালো দেখভাল করেন, না?'

চট করে ইভোনির দিকে তাকাল একবার সাইমন, তারপর ফ্যাগবেনলের দিকে ফেরাল নজর। 'চেষ্টা করি।'

'আমি বলতে চাইছি, তাদের পয়সা নষ্ট করেন না আপনি, ঠিক?'

'ঠিক।'

(1,1) -21- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:20

'আমিও ঠিক তা-ই। আমার ক্লায়েন্ট হচ্ছে নিউ ইয়র্কের করদাতারা। তাদের কষ্টার্জিত ডলার আমি আপনার রিসেপশনে বসে, অর্থনৈতিক ম্যাগাজিন পড়ে নষ্ট করছি না। বুঝতে পেরেছেন?'

কিছু বলল না সাইমন।

'আপনার উকিল এলে তাকে নিয়ে একবার স্টেশনে আসবেন।' ডলে স্যুটের ভাঁজ মসৃণ করল ফ্যাগবেনলে। তারপর পকেট থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে গুঁজে দিল সাইমনের হাতে।

'আসি তাহলে।'

কার্ডটা পড়ল সাইমন। কিছু একটা দেখে অবাক হয়ে গেল সে। 'ব্রঙ্কস?'

'কিছু বললেন?'

'এতে লেখা, আপনার স্টেশন ব্রঙ্কসে।'

'হ্যাঁ। আপনারা, ম্যানহাটনের লোকেরা, মাঝে মাঝে ভুলে যান যে নিউ ইয়র্কে পাঁচটা বরো[১] আছে। ব্রঙ্কস, কুইন্স...'

'কিন্তু হামলাটা...' জিভ কামড়ে থেমে গেল সাইমন, ঝটপট শুধরে নিল নিজেকে, '...কথিত হামলাটা তো হয়েছে সেন্ট্রাল পার্কে। জায়গাটা ম্যানহাটনে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' আবার সেই ঝলমলে হাসি ফিরে এসেছে ফ্যাগবেনলের মুখে। 'কিন্তু খুনটা? ওটা তো হয়েছে ব্রঙ্কসে।'

---

[১] পৌরসভা আছে যে নগরে।

৫

ইতস্তত করতে করতে বিশাল অফিসটায় ঢুকে পড়ল ইলেনা রেমিরেজ।

‘দাঁড়াও। তুমি রেমিরেজ?’ একটা লোক থামাল ওকে।

এ ধরনের সন্দেহমিশ্রিত বাধা পেয়ে অভ্যস্ত ইলেনা।

‘হ্যাঁ, রক্ত-মাংসের ইলেনা আমি,’ জবাব দিল ও।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করতে লাগল ওর ক্লায়েন্ট, তৃতীয় সেবাস্টিয়ান থর্প। লোকটার গায়ে যেন টাকার গন্ধ প্রকট। তার নামের শুরুতে ‘তৃতীয়’ শব্দটা, তার স্যুট, বড়লোকের ননীর গোপালসুলভ লালচে ত্বক, মসৃণ চুল, কাফ লিঙ্ক–সব কিছু থেকে টাকার গন্ধ বেরোচ্ছে।

ইলেনাকে যেন হাঁ করে গিলছে থর্প।

‘দাঁতও দেখবে?’ রেগেমেগে বলল ইলেনা। মুখ হাঁ করে ফেলল।

‘কী?! আরে না।’

‘ঠিক বলছ তো? তুমি চাইলে হেঁটেও দেখাতে পারি।’ একচক্কর হেঁটেও দেখাল ও।

‘থামো তো।’

থর্পের অফিসটা সাদা রং করা। জেব্রার চামড়ার মতো ডোরাকাটা কম্বল বিছানো মেঝেতে। একটা বিশাল সাদা ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। ছোটখাটো একটা হোন্ডা অডিসি দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে ওটার ওপর। ডেস্কটার ওপর একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি রাখা–তার বিয়ের যুগল ছবি।

‘তুমি তো বিরাট রিকমেন্ডেশন নিয়ে এসেছ,’ ব্যাখ্যার সুরে বলল থর্প।

কথাটার মানে হলো, যে পরিমাণ অর্থ খরচ সে করেছে তার বিনিময়ে আরেকটু চকচকে, কেতাদুরস্ত কাউকে আশা করেছিল। মম জিন্স আর শ্যু পরা বেঁটেখাটো–মোটে পাঁচ ফুট লম্বা–মোটাসোটা কোনো মেক্সিকানকে আশা করেনি সে। নাম শুনে আশা করেছিল পেনিলোপ ক্রুজ কিংবা যৌনাবেদনময়ী ফ্ল্যানেমনকো নর্তকীর মতো কারো দেখা পাবে। গ্রীষ্মে বিচ হাউসে কাজ করে

যেসব মেয়ে, ওরকম চেহারার কাউকে দেখবে বলে মোটেও আশা করেনি লোকটা।

'জেরাল্ড বলেছে, এই কাজে তুমিই সেরা,' ফের বলল থর্প।

'আর সবচেয়ে বেশি টাকা খসাই। ওসব খেজুরে আলাপ বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসি? শুনলাম তোমার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

সেলফোন তুলে নিল থর্প। ওটার পর্দা ঘুরিয়ে দিল ইলেনার দিকে। 'হেনরি। আমার ছেলে। চব্বিশ বছর বয়স।'

ছবিতে হেনরির পরনে নীল পোলো শার্ট, মুখে জোর করে ফোটানো আড়ষ্ট হাসি। ভালোমতো দেখার জন্যে সামনে ঝুঁকে এল ইলেনা–কিন্তু ডেস্কটা এত চওড়া যে এপাশ থেকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। তাই দেখার সুবিধার জন্য একটা জানালার পাশে চলে গেল দুজনে। শিকাগো নদী আর শহরের কেন্দ্রস্থল দেখা যায় ওখান থেকে।

'সুন্দর চেহারা তো,' মন্তব্য করল ইলেনা।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল থর্প।

'কতদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না ওকে?' জানতে চাইল মহিলা।

'তিন দিন।'

'পুলিশকে জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে ওরা। আমার কথা মন দিয়ে শুনে রিপোর্ট নিয়েছে, তারপর হেনরিকে সিস্টেম না কীসে যেন ফেলেছে...'

'তোমার কথায় একটা অস্পষ্ট "কিন্তু" শুনতে পাচ্ছি,' ইলেনা বলল।

'কিন্তু ও আমার ফোনে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। মানে, হেনরি।'

'কখন?'

'ও যেদিন নিখোঁজ হলো।'

'কী বলেছিল মেসেজে?'

ফোনটা ইলেনার হাতে তুলে দিল থর্প। মেসেজটা পড়ল ও:

পশ্চিমে যাচ্ছি কয়েকজন বন্ধুর সাথে। দুই সপ্তার মধ্যে ফিরব।

'পুলিশকে এটা দেখিয়েছ?' পড়া শেষ করে জানতে চাইল মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'তারপরও রিপোর্ট লিখেছে ওরা?'

'হ্যাঁ।'

কোনো কালো বা হিস্পানিক বাপ ছেলের নিখোঁজ রিপোর্ট লেখাতে গিয়ে এরকম একটা মেসেজ দেখালে কেমন পরিস্থিতি হতো–ভাবার চেষ্টা করল ইলেনা। গোটা পুলিশ স্টেশনে হাসির রোল উঠত লোকটাকে নিয়ে।

'আরেকটা "কিন্তু" আছে,' বাতাসের দিকে চাইল থর্প।

'কী?'

'কিছু আইনি ঝামেলায় জড়িয়েছে হেনরি।'

'কী ধরনের ঝামেলা?'

'ছোটখাটো ব্যাপার। ড্রাগ। কাউকে জোর করে আটকে রাখা।'

'জেল খেটেছে?'

'না। গুরুতর কোনো ঝামেলায় জড়ায়নি কখনো। সামাজিক সেবা করার শাস্তি পেয়েছে। টুকটাক কিশোর অপরাধ আরকি।'

মাথা দোলাল ইলেনা।

'ও কি আগেও এভাবে উধাও হয়েছে?'

জানালার দিকে চেয়ে রইল থর্প।

'মি. থর্প?'

'বাড়ি থেকে পালিয়েছে।'

'একবারের বেশি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম।'

'হুম,' অস্ফুটে বলল ইলেনা। 'ছেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

বিষণ্ন একটুকরো হাসি ফুটল লোকটার ঠোঁটের কোণে। 'দারুণ ছিল। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম।'

'আর এখন?'

তর্জনী দিয়ে চিবুকে টোকা দিল লোকটা। 'ইদানীং আমাদের সম্পর্কে বেশ টানাপড়েন চলছিল।'

'কেন?'

'অ্যাবিকে পছন্দ করে না হেনরি।'

'অ্যাবি?'

'আমার নতুন বউ।'

ডেস্কের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা তুলে নিল ইলেনা। 'এই অ্যাবি?'

'হ্যাঁ। জানি, তুমি কী ভাবছ।'

মাথা দোলাল ইলেনা। 'কী ভাবছি বলো তো? তোমার বউ খুব সেক্সি—এরকম কিছু?'

ছবিটা কেড়ে নিল থর্প। 'আমি কেমন মানুষ সে বিচার করতে হবে না তোমাকে।'

'তোমাকে বিচার করছি না আমি। করছি অ্যাবিকে। বিচারের রায় হচ্ছে, তোমার বউ দারুণ সেক্সি।'

ভুরু কোঁচকাল থর্প। 'তোমাকে ডাকাটাই বোধহয় ভুল হয়েছে।'

'হয়তো। যাকগে, এসো তোমার ছেলে হেনরির ব্যাপারে আমরা যা যা জানি সব ঝালিয়ে নেয়া যাক। এক, বন্ধুদের সাথে দুই সপ্তার জন্যে পশ্চিমে যাচ্ছে বলে তোমাকে টেক্সট করেছিল ও। দুই, আগেও ও বেশ কয়েকবার

উধাও হয়েছে। তিন, বেশ কিছু ড্রাগ কেসে গ্রেপ্তার হওয়ার ইতিহাস আছে তোমার ছেলের। কিছু বাদ গেল? ও হ্যাঁ, চার, অ্যাবির সাথে তোমার সম্পর্কটা ও মেনে নিতে পারেনি। অ্যাবি আর ও প্রায় সমবয়সি।'

'হেনরির চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় ও,' খেঁকিয়ে উঠল থর্প।

জবাবে কিছু বলল না ইলেনা।

কিছুক্ষণ ফোঁসফোঁস করার পর চুপসে গেল থর্প। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'তুমি এবার আসতে পারো।'

'এত তাড়াতাড়ি না।'

'মানে?'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার–ছেলেকে নিয়ে তুমি বেশ চিন্তায় আছ,' ইলেনা বলল। 'আমার প্রশ্ন হচ্ছেঃ কেন?'

'তাতে কিছু আসে-যায় না। তোমাকে কাজে নিচ্ছি না আমি।'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ইলেনা।

'টেক্সট মেসেজটার জন্য।'

'মেসেজে কী সমস্যা?'

'বললে হাস্যকর শোনাবে।'

'বলে ফেলো।'

'এর আগে হেনরি যতবার পালিয়েছে...প্রতিবারই স্রেফ পালিয়ে গেছে। কাউকে কিচ্ছু জানায়নি।'

মাথা দোলাল ইলেনা। 'মেসেজ পাঠিয়ে কখনো পালানোর কথা জানায়নি। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ তোমাকে মেসেজ পাঠানোর মানে হচ্ছে, ব্যাপারটা বেখাপ্পা–ওর স্বভাবের সাথে যায় না।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল থর্প।

'ব্যস, এটুকুই?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না,' বলল ইলেনা।

'পুলিশও তা-ই বলেছে।'

দুই হাতে মুখ ঘষল থর্প। এই প্রথম লক্ষ করল ইলেনা, ঠিকমতো ঘুম হয়নি লোকটার। চোখ দুটোতে প্রাণ নেই, বড্ড ফ্যাকাসে।

'সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মিস রেমিরেজ। তোমাকে আর দরকার হবে না আমার।'

'আমার তো উল্টোটা মনে হচ্ছে,' বলল ইলেনা।

'মানে?'

'এখানে আসার আগে একটু খোঁজখবর নিয়ে এসেছি আমি।'

এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল থর্প। 'খোঁজখবর নিয়ে এসেছ মানে?'

'তোমার ছেলে ওর ফোন থেকে তোমাকে মেসেজ পাঠিয়েছে বললে।'

'হ্যাঁ।'

'এখানে আসার আগে ওই ফোনে পিং করেছি আমি।'

চোখ সরু করে ইলেনার দিকে চেয়ে রইল থর্প। 'কী বলতে চাইছ? "পিং" করেছ মানে কী?'

'সত্যি বলব? আমিও জানি না। তবে ঘটনা হলো, এসব প্রযুক্তির ব্যাপারে খুব ভালো জানে, এমন একটা ছেলের সাথে পরিচয় আছে আমার। লু নাম ওর। ও একটা জিনিয়াস। যাই হোক, লু যেকোনো ফোনে এই পিং জিনিসটা পাঠাতে পারে। এর ফলে ওই ফোনটাও পাল্টা পিং করে ওটার অবস্থান জানিয়ে দেয়।'

'তার মানে, হেনরি কোথায় আছে, তা জানো তুমি?'

'তাত্ত্বিকভাবে, হ্যাঁ।'

'ওকে খুঁজে বের করে ফেলেছ?'

'লু বের করেছে।'

'কোথায় ও?'

'ঝামেলাটা এখানেই,' ইলেনা বলল। 'আমাদের পিংয়ের কোনো জবাব আসেনি।'

কয়েকবার চোখ পিটপিট করল থর্প। 'বুঝলাম না। তুমি বলতে চাইছ, তোমাদেরকে পাল্টা পিং করার কথা ছিল ওর ফোনের?'

'হ্যাঁ।'

'হেনরি হয়তো ফোন বন্ধ করে রেখেছে।'

'না।'

'না?'

'ওটা একটা ভুল ধারণা। ফোন বন্ধ করলেও ওটার জিপিএস বন্ধ হয় না।'

'তার মানে, যে-কেউ যেকোনো সময় তোমাকে ট্র্যাক করতে পারে?'

'কাগজে-কলমে সেজন্য ওয়ারেন্ট ইশ্যু করতে হয় পুলিশকে। আর উপযুক্ত কারণও দর্শাতে হয়।'

'কিন্তু ওসব ঝামেলায় না গিয়েও কাজটা করতে পেরেছ তুমি,' থর্প বলল। 'কীভাবে?'

জবাব দিল না ইলেনা।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল থর্প। 'হুম...তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই–ওর ফোনে পিং করতে পারোনি তুমি।'

'না পারার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। সম্পূর্ণ নির্দোষ কোনো কারণও থাকতে পারে। হয়তো হেনরি আন্দাজ করেছিল, আমার মতো কাউকে কাজে লাগাতে পারো তুমি। তাই ফোন বদলে ফেলেছে।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চিত নও?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইলেনা। 'আধাআধি সম্ভাবনা। হয়তো এসবের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। হেনরি হয়তো নিরাপদেই আছে কোথাও।'

'কিন্তু তারপরও তোমাকে কাজে লাগানো উচিত বলে মনে করছ?'

'লোকে তো চুরির জন্য বিমা করে। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রতি একশোজনে একজনের বাড়িতেও চুরি হয় না। তাই বলে কি তারা বিমা করবে না?'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল থর্প। 'ভালো বলেছ।'

খানিকক্ষণ ফোন টেপাটিপি করে নিজের যুবক বয়সের একটা ছবি বের করল সে। তার কোলে ছোট্ট একটা বাচ্চা। 'গ্রেচেন...আমার প্রথম স্ত্রী। অনেক চেষ্টার পরও বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছিল না আমাদের। সব ধরনের চিকিৎসা করেছি। হরমোন, সার্জারি, তিন-তিনবার আইভিএফ। কোনো লাভ হয়নি। তারপর আমরা হেনরিকে দত্তক নিই।'

হাসি দেখা যাচ্ছে থর্পের ঠোঁটের কোণে, যদিও জোর করে ফোটানো।

'গ্রেচেন এখন কোথায়?'

'মারা গেছে, দশ বছর আগে। হেনরিকে তখন সবে হাই স্কুলে ভর্তি করেছি। কড়া শাসনে রেখেছিলাম ওকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম আমি। টের পাচ্ছিলাম, একটু একটু করে বখে যাচ্ছে ও। কাজ থেকে ছুটিও নিয়েছিলাম ওর সঙ্গে বেশি বেশি সময় কাটাবার জন্য। কিন্তু ওকে যত শক্ত করে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছি...'

'ততই দূরে সরে গেছে,' কথা শেষ করে দিল ইলেনা।

সজল চোখ তুলে চাইল থর্প। 'তোমাকে এসব বলছি কেন জানি না।'

'অতীত ইতিহাস। সব জানা দরকার আমার।'

'যাকগে, সেজন্যই শিকাগোর সেরা তদন্তকারীকে পাঠাতে বলেছিলাম জেরাল্ডকে। এখন বুঝলে তো, মিস রেমিরেজ, ড্রাগ, ওই মেসেজ, অ্যাবির সঙ্গে ঝামেলা ছাড়াও অন্য ব্যাপার আছে। আমার ছেলেকে আমি চিনি। এবার কুডাক দিচ্ছে আমার মন। মনে হচ্ছে, খুব বড় কোনো ঘাপলা আছে কোথাও। এবার বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ, পারছি,' নরম গলায় বলল ইলেনা।

'মিস রেমিরেজ?'

'ইলেনা বলে ডেকো।'

'প্লিজ, আমার ছেলেকে খুঁজে বের করো, ইলেনা।'

৬

সাইমন জানে ওকে ল্যাজে খেলানো হচ্ছে। সে জানে, ডিটেকটিভ ফ্যাগবেনলে ওকে নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের করে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে ওর মুখ থেকে উল্টোপাল্টা কোনো কথা বের করবার।

'কে খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'তুমি তো বলছিলে উকিল আসার আগে কোনো কথা হবে না।' বিদ্রুপের সুরে আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল ফ্যাগবেনলে।

সাইমনের মুখ শুকিয়ে গেল। 'খুনটা হয়েছে কে? আমার মেয়ে?'

'দুঃখিত। তোমার উকিলের পরামর্শ ছাড়া...'

'দুত্তোর!' এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল ইভোনি। 'মানুষের আবেগের কথা একটু ভাবো।'

'ঠিক আছে, উকিলকে ছাড়াই কথা বলব আমি,' বলল উদ্বিগ্ন সাইমন।

ইভোনির দিকে ফিরল ফ্যাগবেনলে। 'আমাদের আলোচনায় আপনি না থাকলেই ভালো হবে।'

'পেইজ আমার বোনের মেয়ে,' ইভোনি বলল। 'ও ঠিক আছে তো?'

'ও ঠিক আছে কি না জানি না,' জবাব দিল ডিটেকটিভ। 'কিন্তু ও খুন হয়নি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সাইমন। এতক্ষণ অক্সিজেনের অভাবে খাবি খাচ্ছিল যেন।

'তাহলে কে?' জানতে চাইল সে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ফ্যাগবেনলে। ইভোনি বিদেয় হওয়ার আগ পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে রইল। হেস্টারের জন্যে এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে বেরিয়ে গেল ইভোনি। তার পেছনে অফিসের দরজা বন্ধ হতেই সাইমনের দিকে ফিরল ফ্যাগবেনলে।

'কাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন বলবেন, সাইমন?'

'কখন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিটেকটিভ। 'পুরো রাতের কথাই বলুন। ছ'টা থেকেই শুরু করুন নাহয়।'

'ছ'টা পর্যন্ত এখানে ছিলাম। তারপর সাবওয়ে ধরে বাড়ি ফিরি।'

'কোন্ ট্রেন ধরেছিলেন?'

'এক নম্বর।'

'চেম্বার্স স্ট্রিট থেকে?'

'হ্যাঁ। লিঙ্কন সেন্টার স্টপেজে নামি আমি।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্যাগবেনলে, যেন তথ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'বাড়ি যেতে কতক্ষণ লাগে?'

'তিরিশ মিনিট।'

'তার মানে, সাড়ে ছ'টার দিকে বাড়ি ফিরেছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে কেউ ছিল?'

'আমার স্ত্রী আর ছোট মেয়ে।'

'আপনার তো একটা ছেলেও আছে, না?'

'হ্যাঁ। স্যাম। তবে ও এখন কলেজে।'

'কোন্ কলেজে?'

'অ্যামহার্স্ট। ম্যাসাচুসেটসে।'

'হুঁ—অ্যামহার্স্ট কোথায় জানি আমি,' বলল ফ্যাগবেনলে। 'আচ্ছা, আপনি বাড়ি ফিরলেন। আপনার স্ত্রী-মেয়ে বাড়িতেই ছিল...'

'হ্যাঁ।'

'এরপর বাইরে বেরিয়েছিলেন?'

সেকেন্ড দুয়েক ভেবে জবাব দিল সাইমন। 'দুবার।'

'কোথায়?'

'পার্কে।'

'কখন?'

'সাতটায়। তারপর আবার দশটায়। আমাদের কুকুরটাকে হাঁটাতে নিয়ে গেছিলাম।'

'বাহ, চমৎকার। কোন্ জাতের কুকুর পালেন আপনারা?'

'হাভানিজ। ওর নাম লাজলো।'

'লাজলো ছেলেদের নাম না?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সাইমন। স্যামের ষষ্ঠ জন্মদিনে লাজলোকে কিনে এনেছিল ওরা। কুকুরটা ছেলে-মেয়ে যা-ই হোক না কেন, স্যাম গোঁ ধরেছিল ওই নামই রাখতে হবে ওটার। ওসব পুরনো গল্প। স্যাম আর ওর বোনেরা কথা দিয়েছিল, কুকুরটার সব যত্নআত্তি ওরা তিনজনে মিলেই করবে। কিন্তু

শেষতক দেখা গেল সেই দায়িত্বও বর্তেছে ওদের বাপের ঘাড়েই। অথচ কুকুরটা নেয়ার কোনো ইচ্ছেই তার ছিল না।

তবে শিগগিরই লাজলোর ওপর মায়া জন্মে যায় ওর। কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে পছন্দ করে সে। পার্কে ওর সঙ্গে ছোটাছুটি করতে ভালোই লাগে সাইমনের।

লাজলোর বয়স এখন বারো। বয়সের ভারে চলাফেরার গতি ধীর হয়ে এসেছে ওর। শ্রবণক্ষমতাও হারিয়েছে। আগের মতো একটুতেই সাইমনের সাড়া পেয়ে ছুটে আসতে পারে না সে। মাঝে মাঝে তো সাইমন নিজে থেকে দেখা না দিলে টেরও পায় না যে মালিক বাড়িতে আছে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবে, ততই বিমর্ষ হয়ে ওঠে সাইমন। অথচ এত খারাপ লাগার তো কথা ছিল না!

'কুকুরকে হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো সময় বেরিয়েছিলেন?' ডিটেকটিভের প্রশ্নে চটকা ভাঙে সাইমনের।

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে।

'আপনাড়া তিনজন তাহলে সারা রাত বাড়িতেই ছিলেন?'

'তা তো বলিনি।'

চেয়ারে আয়েশ করে হেলান দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল ফ্যাগবেনলে। 'তাহলে বলে ফেলুন।'

'আমার স্ত্রী কাজে গিয়েছিল।'

'উনি তো নিউ ইয়র্ক প্রেসবাইটেরিয়ানে শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ, তাই না? নাইট ডিউটি ছিল বোধহয়। তাহলে সারা আপনি আপনার মেয়ে, আনিয়ার সঙ্গে ছিলেন।'

এবার চিন্তায় পড়ে গেল সাইমন। লোকটা জানে ওর স্ত্রী কোথায় চাকরি করে। ওর মেয়ের নামও জানে। 'ডিটেকটিভ?'

'আইজ্যাক ডাকলেও চলবে।'

'কে খুন হয়েছে?'

ঝটকা মেরে খুলে গেল অফিসের দরজা। হেস্টার ক্রিমস্টাইন মানুষ ছোটখাটো হতে পারে, কিন্তু হাঁটতে পারে লম্বা কদমে। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল সে। ঢুকেই হামলে পড়ল ফ্যাগবেনলের ওপর।

'মস্করা করছ আমার সাথে?'

দুঁদে উকিলের ধমক খেয়েও কোনো বিকার দেখা গেল ফ্যাগবেনলের মধ্যে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল হেস্টারের দিকে। 'হোমিসাইড ডিটেকটিভ আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে। আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগছে।'

স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল হেস্টার। 'চাকরির মতো হাতটাও হারাতে না চাইলে ওটা আমার থেকে দূরে রাখো।' তারপর সাইমনের দিকে ঘুরে গেল তার জ্বলন্ত দৃষ্টি। 'তোমার কাজেও আমি খুশি না।'

একটু বেশিই রেগে গেছে হেস্টার। তারপর সে গোঁ ধরল কনফারেন্স রুমে না বসলে কোনো কথা হবে না। ভেন্যু বদল। নিশ্চয়ই মনস্তাত্ত্বিক খেলা–কিন্তু খেলাটা কীভাবে হবে বুঝতে পারছে না সাইমন। কনফারেন্স রুমে ঢুকেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নিল হেস্টার। লম্বা একটা কনফারেন্স টেবিলের একপাশে বসাল ফ্যাগবেনলেকে। অন্যপাশে সাইমনকে নিয়ে বসল সে।

সবাই সুস্থির হয়ে বসার পর, ডিটেকটিভের দিকে ফিরে মাথা দোলাল হেস্টার। 'ঠিক আছে, এবার বলো।'

'সাইমন...'

'মি. গ্রিন ডাকবে ওকে,' বরফশীতল কণ্ঠে বলল হেস্টার। 'ও তোমার ইয়ার-দোস্ত না।'

ফ্যাগবেনলের চেহারা দেখে মনে হলো, তর্ক করবে–কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলল। 'মি. গ্রিন।' পকেট থেকে একটা ছবি বের করল সে। 'এই লোকটাকে আপনি চেনেন?'

সাইমনের বাহুতে এক হাত রাখল হেস্টার। তার কাছ থেকে অনুমতি আসার আগ পর্যন্ত মুখ খুলতে পারবে না সে। হাত রেখে সেটাই মনে করিয়ে দিল মহিলা।

টেবিলের ওপাশ থেকে ছবিটা এদিকে ঠেলে দিল ফ্যাগবেনলে।

ছবিটা অ্যারন কর্ভালের। হারামিটা দাঁত বের করে হাসছে ওতে–ভদ্র হাসি। একটা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে সে, পেছনে গাছপালা। কোনো একজনের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। সেই মানুষটাকে কেটে ফেলেছে ফ্যাগবেনলে। মানুষটার বাঁ দিকের কাঁধ আছে শুধু ছবিতে। ওই মানুষটা পেইজ ছিল কি না, ভাবল সাইমন।

'হ্যাঁ চিনি,' জবাব দিল সে।

'কে?'

'ওর নাম অ্যারন কর্ভাল।'

'লোকটা আপনার মেয়ের বয়ফ্রেন্ড। ঠিক?'

সাইমনের হাতে চাপ দিল হেস্টার। 'ওদের সম্পর্কের সংজ্ঞা দেয়া ওর কাজ না। পরের প্রশ্ন করো।'

অ্যারনের হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে আঙুল তাক করল ফ্যাগবেনলে। 'অ্যারন কর্ভালকে আপনি কীভাবে চেনেন?'

'মানে?' আবার বাধা দিল হেস্টার।

'কোনো সমস্যা, মিস ক্রিমস্টাইন?'

'হ্যাঁ, সমস্যা। তুমি আমাদের সময় নষ্ট করছ।'

'আমি...'

'থামো।' হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল মহিলা। 'নিজের ইজ্জত নিজে মারছ তুমি। অ্যারন কর্ভালকে আমার ক্লায়েন্ট কীভাবে চেনে, তা আমরা সবাই জানি। আচ্ছা, ধরে নেয়া যাক, ইতিমধ্যে মি. গ্রিন আর আমাকে জেরা করে কুপোকাত করে ফেলেছ তুমি। এখন তাহলে সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথা আসা যাক, কেমন?'

'ঠিক আছে, কাজের কথাই বলছি তাহলে।' সামনে ঝুঁকে এল ফ্যাগবেনলে। 'অ্যারন কর্ভাল খুন হয়েছে।'

খবরটার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত ছিল সাইমন, তবু ডিটেকটিভের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে বনবন করে মাথা ঘোরাতে লাগল ওর। 'আর আমার মেয়ে...?'

ওর হাতে চাপ দিল হেস্টার।

'ও কোথায় আছে আমরা জানি না, মি. গ্রিন। আপনি জানেন?'

'না।'

'শেষ কবে দেখেছেন তাকে?'

'তিন মাস আগে।'

'কোথায়?'

'সেন্ট্রাল পার্কে।'

'অ্যারন কর্ভালকে মারধোর করেছিলেন যেদিন?'

'দারুণ,' হিসিয়ে উঠল হেস্টার। 'তোমার কথাবার্তার ধরনে মনে হচ্ছে, এই রুমে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই।'

ফ্যাগবেনলে বলল, 'আবারও জানতে চাইছি আমি: কোনো সমস্যা?'

'আবারও উত্তর দিচ্ছি আমি: হ্যাঁ, সমস্যা। তোমার কথাবার্তার ধরন আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমার "মারধোর" শব্দ ব্যবহারে আপত্তি আপনার?'

'ঠিক ধরেছ।'

চেয়ারে এলিয়ে বসে ডেস্কের ওপর দুই হাত রাখল ডিটেকটিভ। 'শুনেছি ওই কেসের অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে।'

'তুমি কী শুনেছ-না-শুনেছ তার থোড়াই কেয়ার করি আমি।'

'এতগুলো তথ্য-প্রমাণ থাকার পরও ওভাবে বেঁচে গেলেন! ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।'

'তোমার ইন্টারেস্টিঙেরও থোড়াই কেয়ার করি আমি, ডিটেকটিভ। ওই ঘটনার ব্যাপারে তুমি যে শব্দ ব্যবহার করেছ, তা আমার পছন্দ হয়নি। দয়া করে নিজের কথা শুধরে নাও।'

'এখন কে সময় নষ্ট করছে, কাউন্সেলর?'

'আমি চাই ইন্টারভিউটা সঠিক নিয়ম মেনে হোক।'

'বেশ। শুধরে নিচ্ছি তাহলে–তথাকথিত মারধোর। এবার খুশি? এবার আপনার ক্লায়েন্ট জবাব দিতে পারেন তো?'

'সেন্ট্রাল পার্কের ঘটনার পর আর আমার মেয়েকে দেখিনি,' এবার মুখ খুলল সাইমন।

'অ্যারন কর্ভাল? ওকে দেখেছেন?'

'না।'

'তাহলে গত তিন মাসে আপনার মেয়ে কিংবা মি. কর্ভাল, কারো সঙ্গেই কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়নি আপনার। ঠিক?'

'এই প্রশ্নের জবাব ও দিয়েছে,' আবার ঝাঁঝিয়ে উঠল হেস্টার।

'উত্তরটা ওনাকে দিতে দিন, প্লিজ।'

'কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়নি,' সাইমন বলল।

ফ্যাগবেনলের ঠোঁটের কোণে চোরা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। 'তাহলে আপনার আর আপনার মেয়ে পেইজের সম্পর্ক অত ঘনিষ্ঠ না। কী বলেন?'

কথাটা হজম হলো না হেস্টারের। 'তুমি কি ফ্যামিলি কাউন্সেলর?'

'এত রাগছেন কেন, স্রেফ একটা পর্যবেক্ষণ জানালাম। যাকগে, ছোটমেয়ে আনিয়ার সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

'আনিয়ার পিছে লাগলে কেন?' জানতে চাইল হেস্টার।

'মি. গ্রিন একটু আগেই বলছিলেন, কাল সারা রাত বাড়িতে ছিলেন উনি আর আনিয়া,' জবাব দিল ফ্যাগবেনলে।

'কী?'

'আপনার ক্লায়েন্ট তো তা-ই বললেন।'

আরেকবার অগ্নিদৃষ্টি ছুঁড়ে দিল হেস্টার সাইমনের দিকে।

'মি. গ্রিন, রাত দশটায় কুকুরটাকে নিয়ে আরেকবার হাঁটতে বেরিয়েছিল আপনি। ঠিক?'

'ঠিক।'

'এরপর আপনি আর আনিয়া কি হাঁটতে বেরিয়েছিলেন?'

'বিরতি,' হাত ঝাপটাল হেস্টার।

বিরক্তি খেলে গেল ফ্যাগবেনলের চেহারায়। 'আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমি।'

'আমিও তো চাই হিউ জ্যাকম্যানের সাথে প্রেম করতে,' সমান তেজে বলল হেস্টার। 'কাজেই আমাদের দুজনকেই আরো কিছুক্ষণ হতাশার সাথে ঘর বাঁধতে হচ্ছে।' উঠে দাঁড়াল মহিলা। 'এখানেই থাকো, ডিটেকটিভ। এখুনি আসছি আমরা।'

টানতে টানতে সাইমনকে কনফারেন্স রুম থেকে বের করে আনল হেস্টার। করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে পুরোটা সময় মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকল সে। তার ফাঁকেই বলল, 'তোমাকে বকাঝকা করে আপাতত সময় নষ্ট করছি না।'

'আমার মেয়ে খুন হয়েছে কি না, তা জানার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম–এই কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করছি না আমিও।'

'ওটা একটা ফাঁদ ছিল।'

'হ্যাঁ, আমি যেন জানতাম!'

'যা হওয়ার হয়ে গেছে,' হেস্টার বলল। 'ওকে কী কী বলেছ, সব খুলে বলো।'

সংক্ষেপে ফ্যাগবেনলের সঙ্গে হওয়া কথোপকথন উকিলকে জানাল সাইমন।

'একটু আগে যে একটা মেসেজ পাঠিয়েছি খেয়াল করেছ?' বলল হেস্টার।

'হ্যাঁ।'

'টিকটিকিটার সাথে আবার কথা বলতে যাওয়ার আগে আমার তদন্তকারীকে বলেছি কর্ভালের খুনের ব্যাপারে যতটা সম্ভব তথ্য জোগাড় করতে। খুনের সময়, পদ্ধতি, পরিস্থিতি–যতটুকু জানা যায় আরকি। তুমি চালাক ছেলে। অতএব, গোয়েন্দা সাহেব কোন্ মতলবে এসেছেন, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'আমি একজন সন্দেহভাজন।'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল মহিলা। 'মৃতের সাথে গুরুতর একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলে তুমি। ওকে তুমি ঘৃণা করতে। মেয়ের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ার জন্যে দায়ী করতে ওকে। কাজেই, হ্যাঁ, লোকটার মৃত্যুতে তুমি একজন প্রধান সন্দেহভাজন। তোমার বউও। আর...হ্যাঁ, পেইজও। আমার অনুমান, ও-ই সবচেয়ে বড় সন্দেহভাজন। কাল রাতের জন্য কোনো অ্যালিবাই আছে তোমার কাছে?'

'বললামই তো, কাল সারা রাত আমি বাড়িতে ছিলাম।'

'কার সাথে?'

'আনিয়ার।'

'হুম...তাতে কোনো কাজ হবে না।'

'কেন?'

'আনিয়া অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক কোথায় ছিল?'

'প্রায় সারাক্ষণই নিজের ঘরে।'

'দরজা খোলা ছিল নাকি বন্ধ?'

এবার হেস্টারের কথা অর্থ বুঝতে পারছে সাইমন। 'বন্ধ।'

'ও তো একটা বাচ্চা, না? দরজা বন্ধ করে, কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছিল হয়তো। তার মানে, যেকোনো সময় চুপিসারে বাইরে বেরোতে পারতে তুমি। আনিয়া শুতে গিয়েছিল কখন? ধরা যাক, এগারোটায়। তারপর বের হতে পারো তুমি। তোমার বিল্ডিঙে সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু বিল্ডিঙটা অনেক পুরনো। ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে বেরোনোর অনেক রাস্তা আছে।'

হেস্টারের ফোন বেজে উঠল। কল রিসিভ করল সে। 'বলো।'

কেউ একজন কথা বলতে শুরু করল। শুনতে শুনতে রং সরে গেল হেস্টারের চেহারা থেকে। বেশ কিছুক্ষণ একটা কথাও বলল না সে। অবশেষে যখন মুখ খুলল, অস্বাভাবিক কোমল শোনাল ওর গলা–সচরাচর এত কোমল গলায় কথা বলে না সে। 'রিপোর্টটা আমাকে ইমেইল করো।'

ফোন কেটে দিল দুঁদে উকিল।

'কী হলো?' ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'ওদের ধারণা, খুনটা তুমি করোনি। উঁহু, ভুল হলো–কাজটা যে তুমি করেছ, সেই ধারণা করার *উপায়ই নেই* ওদের।'

৭

টার্গেটকে একটা জরাজীর্ণ বাড়িতে ঢুকতে দেখল অ্যাশ।

‘লোকটা ক্যাডিলাক চালাচ্ছে?’ তাকে জিজ্ঞেস করল ডিডি।

‘তা-ই তো মনে হচ্ছে।’

‘এলডোরাডো?’ ডিডি-র মুখ কখনো বন্ধ থাকে না।

‘নাহ।’

‘নিশ্চিত?’

‘এটিএস। ২০০২ সালে এলডোরাডো মডেল বানানো বন্ধ করে দিয়েছে ক্যাডিলাক।’

‘তুমি কী করে জানো?’

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাশ। অনেক ব্যাপারেই জানাশোনা আছে ওর।

‘আমার বাবার একটা এলডোরাডো ছিল,’ বলল ডিডি।

ভ্রু কোঁচকাল অ্যাশ। ‘তোমার “বাবা”র?’

‘কেন, তোমার কি ধারণা বাবার কথা কিছু মনে নেই আমার?’

ছয় বছর বয়স থেকে বিভিন্ন ফস্টার হোমে বড় হয়েছে ডিডি। অ্যাশ প্রথম ফস্টার হোমে ঢোকে চার বছর বয়সে। পরের চোদ্দ বছরে বিশটারও বেশি হোমে থেকেছে সে। ডি-ও সম্ভবত বিশটার মতোই হোম বদলেছে। তিনবার–মোট আট মাস–একই ফস্টার হোমে থেকেছে ওরা।

‘পুরনো গাড়ি কিনেছিল অবশ্য। বেশ পুরনো। সবগুলো বোতামের রং উঠে গিয়েছিল। কিন্তু বাবা গাড়িটাকে খুব ভালোবাসতো। আমাকে বসাত সামনের সিটে, নিজের সঙ্গে। সিট বেল্ট পরতাম না। সিটের চামড়াগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছিল। গাড়িতে উঠেই চড়া ভলিউমে রেডিয়ো চালু করে দিত বাবা–সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গাইত নিজেও। ব্যস, ছেলেবেলার এতটুকু

স্মৃতিই মনে আছে আমার। বাবার গলার স্বরটা চমৎকার ছিল। গাড়িটাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো, যতদিন...'

'যতদিন কী?' কৌতূহল সামলাতে পারল না অ্যাশ।

'গাড়িটার ব্যাপারে বাবা সত্যি কথা জেনে ফেলার পর থেকেই সব ভজকট পাকিয়ে যায়,' বলল ডিডি।

মেয়েটা যতবার 'বাবা' শব্দটা উচ্চারণ করেছে ততবারই ভীষণ বিরক্ত হয়েছে অ্যাশ।

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে টার্গেট। দশাসই লোকটার পরনে জিন্স, পায়ে টিম্বারল্যান্ড বুট, গায়ে ফ্লানেলের শার্ট। মুখে দাড়ি, মাথায় ক্যামোফ্লাজ রঙের বোস্টন রেড সক্স বেজবল ক্যাপ।

ইশারায় লোকটাকে দেখাল অ্যাশ। 'এই ব্যাটাই আমাদের টার্গেট?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। তা প্ল্যানটা কী?'

গাড়ির পেছনের দরজা খুলল টার্গেট। গাঢ় নীল রঙের স্কুলড্রেস পরা দুটো অল্পবয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে–পিঠে ব্যাকপ্যাক। লোকটার মেয়ে। লম্বা মেয়েটার নাম কেলসি, বয়স দশ। ছোটটার নাম কিয়ারা, বয়স আট।

'অপেক্ষা করব,' বলল অ্যাশ।

চালকের আসনে বসে আছে সে। ডিডি বসেছে প্যাসেঞ্জার সিটে। গত তিন বছর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি অ্যাশের। কদিন পূর্বে ফের দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত ভেবেছিল, মেয়েটা বোধহয় মরে গেছে। দেখা হওয়ার পর দুদিনেই আগের মতো খাতির জমে গেছে ওদের।

'তারপর কী হলো?' জিজ্ঞেস করল অ্যাশ।

'কার?'

'তোমার বাবার এলডোরাডোর। ভজকটটা কোথায় পাকিয়েছিল? কী জেনেছিলেন উনি?'

মুখ থেকে হাসি মুছে গেল ডিডির। সিটের মধ্যে নড়েচড়ে বসল সে।

'ঠিক আছে, বলতে হবে না।'

'না, বলতে চাই,' বলল মেয়েটা।

সামনের জানালা দিয়ে টার্গেটের বাড়ির দিকে চেয়ে আছে দুজনে। কোমরের হোলস্টারে আটকানো পিস্তলে একবার হাত বোলাল অ্যাশ। স্পষ্ট নির্দেশ আছে ওর ওপর। হোঁতকা লোকটা কী করেছে জানে না সে–অবশ্য কোনো টার্গেটের কীর্তি সম্পর্কেই জানে না–কিন্তু মাঝেমধ্যে যত কম জানা যায়, ততই ভালো।

'শুধু মাছ রান্না হয়, এমন একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার করতে গিয়েছিলাম আমরা,' বলতে শুরু করল ডিডি। 'দাদিমা বেঁচে ছিলেন তখনও। তাই খাবার

(2,1) -29- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:22

বিল উনিই দিয়েছিলেন। বাবার পছন্দ ছিল স্টেক। সবসময় তা-ই খেত। মাছ পছন্দ করত না। দুই চোখে দেখতে পারত না।'

মেয়েটার কাহিনি কোন্ দিকে এগোচ্ছে, বুঝতে পারছে না অ্যাশ।

'যা-ই হোক, ওয়েটার এসে সেদিনের স্পেশাল খাবারগুলোর নাম বলতে শুরু করল। অদ্ভুত উচ্চারণে কথা বলত লোকটা। একটা খাবারের ছবি দেখিয়ে বলল, "শেফ এই খাবারটার খুব প্রশংসা করেছে—আখরোট দিয়ে রান্না করা গ্রিলড ডোরাডো।"'

ডিডির দিকে ফিরল অ্যাশ। গত কয়েক বছরে রূপ আরো ফুটে উঠেছে মেয়েটার। বিনুনি করে বাঁধা সোনালি চুলগুলো পিঠের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। পুরুষ্টু ঠোঁট, নিখুঁত ত্বক। পান্নার মতো সবুজ দুই চোখ দেখলে মনে হয় কন্টাক্ট লেন্স পরেছে বুঝি।

'ওয়েটারকে আবার ওই মাছটার নাম বলতে বলল বাবা। বলল লোকটা। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল বাবা। চেয়ার-টেয়ার উল্টে ফেলে দিয়েছিল। তার দুর্দান্ত গাড়িটার নাম একটা মাছের নামে! ব্যাপারটা সে কিছুতেই হজম করতে পারল না, বুঝলে?'

হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল অ্যাশ। 'সত্যি বলছ?'

'অবশ্যই। মিথ্যে বলব কেন?'

'গাড়িটার নাম কোনো মাছের নামে রাখা হয়নি।'

'কী! তুমি কখনো ডোরাডো মাছের নাম শোনোনি?'

'নামটা শুনেছি। কিন্তু এল ডোরাডো দক্ষিণ আমেরিকার এক কিংবদন্তির স্বর্ণশহরের নাম।'

'কিন্তু ওটা তো একটা মাছেরও নাম, তাই না?'

অ্যাশ কিছু বলল না।

'অ্যাশ?'

'হ্যাঁ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল যুবক। 'মাছের নামও।'

গ্যারেজের দিকে যাচ্ছে টার্গেট।

'বাড়ির দিকে নজর রেখো,' সঙ্গিনীকে বলল অ্যাশ।

'এবার সঙ্গে আসব না আমি?' আহত শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ।

'না। হুইল ধরো। গাড়ি চালু রাখবে। বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে এলে আমাকে কল কোরো।'

গ্যারেজে ঢুকে পড়েছে টার্গেট। আর কিছু না বলে সেদিক পা বাড়াল অ্যাশ।

টার্গেটের নাম কেভিন গ্যানো। হাই স্কুলের প্রেমিকা, কোর্টনির সঙ্গে বারো বছরের দাম্পত্য জীবন। ম্যাসাচুসেটসের রিভিয়ার-এ, ডেভন স্ট্রিটের এই বাড়িটার ওপরতলায় বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকে সে। ছয় মাস আগে, লিনের অ্যালস্টন মিট প্যাকিং প্ল্যান্ট থেকে চাকরি খোয়ায় কেভিন। সাত বছর

(1,1) -30- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:22

ওখানে চাকরি করেছিল সে। তারপর থেকেই এখানে-ওখানে ঘুরে মরছিল কাজের সন্ধানে। অবশেষে কোনোমতে কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউয়ের একটা ট্র্যাভেল এজেন্সিতে রিসেপশনিস্ট হিসেবে চাকরি জোটাতে পারে লোকটা।

প্রতিদিন দুপুর দুটোয় মেয়েদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে কেভিন। সেজন্যেই এই কর্মজীবীপাড়া যখন শুনশান, তখন বাড়িতে দেখা যাচ্ছে লোকটাকে।

অ্যাশ যখন গ্যারেজে ঢুকল, তখন ওয়ার্কবেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ডিভিডি বা ব্লু-রে প্লেয়ার খুলছিল কেভিন। ছোটখাটো মেরামতির কাজ করে সামান্য টাকা জমিয়েছে সে। আগন্তুকের পদশব্দ শুনে চোখ তুলে চাইল লোকটা। বন্ধুসুলভ হাসি দিল অ্যাশকে দেখে। অ্যাশও পাল্টা হেসে পিস্তল তাক করল তার দিকে।

‘তুমি চুপ থাকলে ভালোয় ভালোয় কাজ শেষ হয়ে যাবে।’

গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে দিল অ্যাশ। পিস্তল তখনও কেভিনের বুক বরাবর তাক করা। লোকটার হাতে তখনও স্ক্রুড্রাইভার। ডান হাতে।

‘কী চাও?’

‘স্ক্রুড্রাইভারটা নামিয়ে রাখো, কেভিন। আমাকে সাহায্য করো, তাহলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।’

‘ফালতু কথা,’ বলল কেভিন।

‘কী?’

‘ক্ষতি না করলে নিজের চেহারা দেখাচ্ছ কেন আমাকে?’

ভালো যুক্তি।

‘ছদ্মবেশে আছি আমি। চেহারা দেখানো নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।’

‘ফালতু কথা,’ আবার বলল কেভিন।

পার্শ্বদরজার দিকে তাকাল সে, যেন সুযোগ পেলেই ওদিকে দৌড় লাগাবে।

‘কেলসি আর কিয়ারা,’ শান্ত গলায় বলল অ্যাশ।

মেয়েদের নাম শুনে জায়গায় জমে গেল কেভিন।

‘ব্যাপারটা দুইভাবে শেষ হতে পারে। তুমি দৌড় দিলে আমি তোমাকে গুলি করে মারব। তারপর ঘটনাটা এমনভাবে সাজাব, যেন বাড়িতে হামলা হয়েছিল। তার মানে, আমি তোমার বাড়িতে ঢুকব। ভেতরে কেলসি আর কিয়ারা কী করছে, কেভিন? হোমওয়ার্ক করছে? টিভি দেখছে? নাকি খাচ্ছে? যা-ই করুক না কেন, ভেতরে গিয়ে আমি এমন কাজ করব যে মরতে পারলেই বেশি খুশি হবে তুমি।’

মাথা নাড়ল কেভিন, অশ্রু গড়াচ্ছে দু-চোখ বেয়ে। ‘প্লিজ।’

‘অথবা,’ অ্যাশ বলল, ‘এখুনি স্ক্রুড্রাইভারটা নামিয়ে রাখতে পারো তুমি।’

তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করল কেভিন। ঠং করে কংক্রিটের মেঝেতে আছড়ে পড়ল স্ক্রুড্রাইভারটা।

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি কখনো কারো কোনো ক্ষতি করিনি। তাহলে আমার সঙ্গে এসব করছ কেন?'

জবাব না দিয়ে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাশ।

'প্লিজ, আমার মেয়েদের কোনো ক্ষতি কোরো না। তুমি যা বলবে, তা-ই করব। শুধু...' ঢোক গিলল লোকটা। 'এখন...এখন কী?'

চট করে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কেভিনের কপালের পাশে পিস্তলের মাযল ঠেসে ধরল অ্যাশ। সে ট্রিগার টেনে দেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে চোখ বন্ধ করে ফেলল কেভিন।

গুলির আওয়াজে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি উঠল গ্যারেজের ভেতরে। তবে সে আওয়াজ বাইরে যাবার কথা না।

মেঝেতে পড়ার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল কেভিনের শরীর থেকে।

দ্রুত কাজ সারল অ্যাশ। পিস্তলটা কেভিনের ডান হাতে রেখে ট্রিগার টেনে দিল। মেঝেতে গিয়ে আঘাত হানল বুলেট। এবার মৃতের হাতে গানপাউডারের অবশেষ পাওয়া যাবে। কেভিনের প্যান্টের পকেট থেকে ফোন বের করে তার বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে ওটার লক খুলে ফেলল অ্যাশ। তারপর ঝটপট লোকটার স্ত্রীর নম্বর বের করল।

নামের আগে-পরে দুটো হৃদয়-চিহ্ন দিয়ে কোর্টনির নম্বর সেভ করা ফোনে।

হৃদয়। বউয়ের নামের পাশে হৃদয় রেখে দিয়েছে কেভিন।

খুব সাধারণ একটা মেসেজ টাইপ করল অ্যাশ:

দুঃখিত। প্লিজ, আমাকে মাফ করে দিয়ো।

মেসেজ পাঠিয়ে ফোনটা ওয়ার্কবেঞ্চে ফেলে দিল সে। তারপর হাঁটা ধরল গাড়ির দিকে।

তাড়াহুড়ো কোরো না—মনে মনে নিজেকে নির্দেশ দিল অ্যাশ—*দ্রুত হেঁটো না*।

আশি থেকে পঁচাশি শতাংশ সম্ভাবনা, খুনের ঘটনাটাকে আত্মহত্যা হিসেবেই দেখা হবে। মৃতের মাথায়—কপালের ডানপাশে করা হয়েছে গুলিটা। আত্মহত্যা করার সময় ঠিক এভাবেই গুলি করে লোকে। সে কারণেই কেভিন যে হাতে স্ক্রুড্রাইভার ধরে ছিল, সেই হাতের সুইসাইড নোট লিখেছে অ্যাশ। অকুস্থলে একটা সুইসাইড নোট আছে। গানপাউডারও আছে মৃতের হাতে। বাড়তি বুলেটটা দেখে পুলিশ ভাববে প্রথম চেষ্টায় ভয় পেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল কেভিন—তারপর দ্বিতীয় চেষ্টায় সফল হয়েছে।

অতএব, ঘটনাটাকে আত্মহত্যা হিসেবে দেখার সম্ভাবনাই বেশি। তার সাথে যখন কেভিনের চাকরি হারানোর হতাশাটা যোগ হবে, তখন সেই

সম্ভাবনার বিশ্বাসযোগ্যতা আপনাআপনিই বেড়ে যাবে। তবে কোনো অতি-উৎসাহী পুলিশ যদি খুব খুঁটিয়ে তদন্ত করে তবে ছোটখাটো কিছু অসঙ্গতি পাবে। যেমন, প্রযুক্তিতে দক্ষ কোনো অপরাধ-বিশেষজ্ঞ যদি বুলেটের গতিপথ বিশ্লেষণ করে, তাহলে দেখবে দ্বিতীয় গুলিটা করা হয়েছে মেঝের খুব কাছ থেকে।

এই মুহূর্তে কেউ হয়তো অ্যাশকে বা গাড়িটাকে দেখে ফেলেছে। তার মনে হয়তো ঠিকই খটকা লেগেছে ওকে দেখে।

কিন্তু সেসবের সম্ভাবনা খুব কম।

কাজ সেরে ডিডিকে নিয়ে বহু দূরে চলে যাবে সে। গাড়িটাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। ওদেরকে খুঁজে বের করার মতো কোনো চিহ্নই থাকবে না।

উধাও হয়ে যাওয়ার কাজে অ্যাশ খুব দক্ষ।

প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল সে। নাহ, আশপাশের কোনো বাড়ির জানালার পর্দা নড়ে ওঠেনি। কোনো দরজাই খোলেনি। কোনো গাড়ি যায়নি ওদের পাশ কাটিয়ে।

ডিডি জানতে চাইল, ‘কাজ শেষ...?’

মাথা দোলাল অ্যাশ।

স্মিত হেসে গাড়ি চালাতে শুরু করল মেয়েটা।

৮

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল ইনগ্রিড। স্বামী এসে পৌঁছুতেই জড়িয়ে ধরল ওকে।

'মাত্র শুয়েছিলাম, এমন সময় এল পুলিশ।'

'জানি,' বলল সাইমন।

'দরজার বাযার বেজে উঠতে শুনে অবাকই হয়েছিলাম।'

বিল্ডিঙের দারোয়ান জানে, সপ্তায় একদিন নাইট ডিউটি করে ইনগ্রিড। তাই পরদিন দিনেরবেলায় ঘুমায় ও। সেজন্যে সেদিন ওদের জন্যে কোনো জিনিসপত্র এলে সঙ্গে সঙ্গে বাসায় পৌঁছে দেয় না, সাইমনের জন্যে অপেক্ষা করে। সন্ধে সাড়ে ছয়টায় সে ফিরলে ওর হাতে দেয়।

'আমার কোনো অ্যালিবাই আছে কি না জানতে চায় পুলিশটা। আমি যেন সন্দেহভাজন,' ইনগ্রিডের কণ্ঠে ক্ষীণ আতঙ্কের ছোঁয়া।

সাইমন তো জানে, আসলেই সন্দেহ করা হচ্ছে ওর স্ত্রীকে। দারোয়ান ইনগ্রিডকে অসময়ে বিরক্ত করার কারণ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে ফোন করে ও। তক্ষুনি ফার্ম থেকে একজন সহকর্মীকে পাঠায় হেস্টার।

'এইমাত্র ইআর থেকে মেরি ফোন করেছিল। রাতে আমি হাসপাতালে ছিলাম কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওখানেও গিয়েছিল পুলিশ। বিশ্বাস হয়?'

'ওরা আমাকেও জিজ্ঞেস করেছিল অ্যালিবাই আছে কি না,' সাইমন বলল। 'হেস্টার বলেছে এসব স্রেফ রুটিন কাজ।'

'তারপরও কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আসলে কী হয়েছে বলো তো? অ্যারন খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'পেইজ কোথায়?'

'কেউ জানে না।'

সাইমনের পায়ে গা ঘষতে লাগল লাজলো। কুকুরটার দিকে তাকাল স্বামী-স্ত্রী।

'চলো ওকে একটু হাঁটিয়ে নিয়ে আসি,' বলল সাইমন।

পাঁচ মিনিট পর, সিক্সটি-সেভেন্থ স্ট্রিট পেরোল দুজনে। হাতে লাজলোর শেকল। ওদের বাম পাশে, খানিকটা চোখের আড়ালে, ছোট একটা খেলার মাঠ। বহুদিন আগে এখানে পেইজকে নিয়ে আসত ওরা খেলার জন্যে–তারপর স্যামকে, সবশেষে আনিয়াকে। একটা বেঞ্চিতে বসে বাচ্চাদের দৌড়ঝাঁপ দেখত ওরা। বিশাল এই শহরের বুক এই পার্কটা ওদের মনে নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দিত।

বিখ্যাত রেস্তোরাঁ ট্যাভার্ন অন দ্য গ্রিন পেরিয়ে ডানে মোড় নিয়ে দক্ষিণে রওনা দিল গ্রিন দম্পতি। একদল স্কুলপড়ুয়া বাচ্চা চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে। ফিল্ড ট্রিপে বেরিয়েছে। প্রত্যেকের পরনে হলুদ টি-শার্ট, যাতে সহজে খুঁজে বের করা যায়। ওদের কোলাহল মিইয়ে যাবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সাইমন। তারপর বলল, 'খুব নৃশংসভাবে করা হয়েছে খুনটা।'

ইনগ্রিডের পরনে লম্বা, পাতলা একটা কোট। ওটার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। 'তারপর বলো।'

'ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়া হয়েছে।'

'কীভাবে?'

'সত্যিই বিস্তারিত শুনতে চাও?'

হাসির রেখা দেখা দিল ইনগ্রিডের ঠোঁটের কোণে। 'অদ্ভুত।'

'কী?'

'তুমি তো নৃশংস কাটাকুটি আছে যেসব মুভিতে, ওগুলো হজম করতে পারো না,' বলল সে।

'তুমিও তো এমন ডাক্তার, যাকে তেমন রক্তপাত দেখতে হয় না,' পাল্টা জবাব দিল সাইমন। 'যাকগে, হেস্টারের সোর্স জানিয়েছে, জবাই করে খুন করা হয়েছে অ্যারনকে। ছুরিটা খুব গভীর পর্যন্ত বসানো হয়েছিল। মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। লোকটার তিনটা আঙুল কেটে নিয়েছে খুনি। আরো...'

'আগে না পরে?' জানতে চাইল ইনগ্রিড।

'কী?'

'আঙুল কেটেছে কখন? অ্যারন তখনও বেঁচে ছিল?'

'জানি না,' জবাব দিল সাইমন। 'তাতে কি কিছু আসে-যায়?'

'হয়তো।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'অ্যারনের আঙুল কেটে নেয়ার সময় ও যদি জীবিত থাকে, তার মানে,' ইনগ্রিড বলল, 'খুনি সম্ভবত ওর কাছ থেকে কোনো তথ্য আদায় করতে চাইছিল।'

'কী ধরনের তথ্য?'

'জানি না। কিন্তু ব্যাপার হলো, এখন আমাদের মেয়ে কোথায় আছে, কেউ জানে না।'

'তোমার কি মনে হয়...?'

'আমার কিছু মনে হচ্ছে না,' ইনগ্রিড বলল।

দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল ওরা, নিস্পলক। এই নারীকে ভালোবাসে সাইমন। সে-ও ভালোবাসে এই লোকটাকে। একসঙ্গে জীবনের সবচেয়ে প্রতিকূল আর প্রেমময় দিনগুলো পাড়ি দিয়েছে ওরা। সন্তানের জন্ম দিয়েছে, ওদের লালনপালন করেছে। দিন গড়াতে গড়াতে এখন ওরা আবার এক ঝঞ্ঝামুখর সময়ের সামনে উপস্থিত। এই সময়টুকুও পরস্পরের হাতে হাত রেখে পাড়ি দিতে হবে ওদের।ঝ

'পুলিশের কাছে পেইজের ফুটো কড়ি দামও নেই,' ইনগ্রিড বলল। 'ওকে ওরা খুঁজে বের করার চেষ্টাও করবে না। যদি খোঁজেও, সেটা করবে ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য।'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল সাইমন। 'তার মানে, কাজটা আমাদেরই করতে হবে।'

'হ্যাঁ। অ্যারন খুন হয়েছে কোথায়?'

'মট হেইভেনে, ওদের অ্যাপার্টমেন্টে।'

'ঠিকানা জানো?'

মাথা দোলাল সাইমন। হেস্টার দিয়েছে।

'চলো তাহলে,' বলল ইনগ্রিড।

***

দুটো কংক্রিটের ব্যারিয়ার পেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে রাস্তায়। যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় এ ধরনের প্রতিবন্ধক। ওটার কাছে এসে থেমে গেল উবার ড্রাইভার, অ্যাকমেড। 'আর যাওয়া যাবে না,' জানাল সে, তারপর সাইমনের দিকে ফিরে ভ্রু কোঁচকাল। 'এটাই তো?'

'হ্যাঁ।'

সন্দেহের ছায়া খেলে গেল অ্যাকমেডের চেহারায়। 'জায়গা কিনতে চাইলে, এরচেয়ে ভালো জায়গা চিনি আমি...'

'এখানে কোনো সমস্যা নেই আমাদের। ধন্যবাদ,' বলল ইনগ্রিড।

'দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। কথাটা আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলিনি।'

(1,1) -33- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:23

'কিছু মনে করিনি,' জবাবটা দিল সাইমন।

'এর জন্য আমাকে ওয়ান স্টার রেটিং দেবেন না তো?'

'আরে নাহ, পাক্কা ফাইভ স্টার রেটিং তোমার,' প্যাসেঞ্জার ডোর খুলতে খুলতে বলল সাইমন।

'পারলে ছয় তারাই দিতাম,' পাশ থেকে যোগ করল ইনগ্রিড।

টয়োটা থেকে নেমে এল ওরা। সাইমনের পরনে ধূসর সোয়েটশার্ট আর স্নিকার। ইনগ্রিড পরেছে জিন্স আর সোয়েটার। দুজনের মাথায়ই বেজবল ক্যাপ। ইনগ্রিডের ক্যাপে নিউ ইয়র্ক ইয়াঙ্কিস-এর লোগো, সাইমনের ক্যাপে একটা গলফ ক্লাবের লোগো। সাধারণ জামাকাপড় পরেছে, যাতে লোকের বাড়তি নজর না পড়ে ওদের ওপর। কিন্তু তেমন লাভ হয়েছে বলে মনে হলো না।

জরাজীর্ণ, ইট-বেরিয়ে-যাওয়া বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে। ফায়ার এস্কেপ দেখে মনে হয়, যেকোনো মুহূর্তে, সামান্য টোকা লাগলেও ভেঙে পড়বে। ওটায় ধাতুর চেয়ে মরচের পরিমাণই বেশি। সিঁড়ির ধাপগুলো যেন কংক্রিটের ধুলো। ধাতব-ধূসর দরজাটারও বেহাল দশা। সবমিলিয়ে জঘন্য অবস্থা বিল্ডিংটার।

এখানেই থাকে ওদের সন্তান, পেইজ।

ইনগ্রিডের দিকে নজর ফেরাল সাইমন। সে-ও একমনে দেখছে বাড়িটা, চেহারায় বেদনার ছাপ।

'এবার কী করব?' ওকে জিজ্ঞেস করল সাইমন।

চকিতে চারপাশে একবার ঘুরে এল ইনগ্রিডের নজর। 'এখনো ভেবে দেখিনি।'

এগিয়ে গিয়ে গ্রাফিতি আঁকা দরজার নবে মোচড় দিল সে, তারপর গায়ের জোরে ঠেলা দিল। ক্যাঁচকোঁচ, মড়মড় আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে খুলে গেল দরজা। একটা হলঘরমতো জায়গায় ঢুকল ওরা। পচা টক টক গন্ধ ভেতরে–গা গুলিয়ে ওঠে। একটা নগ্ন বাল্ব দুর্বলভাবে আলো বিলাচ্ছে মাথার ওপরের সিলিং থেকে।

পেইজ থাকত এখানে, ভাবল সাইমন।

মেয়েটা ঠিক কী কারণে এমন জীবন বেছে নিয়েছিল, ভাবছে সে। দোষটা বোধহয় সাইমনেরই, তাই না? নিশ্চয়ই ওর কোনো গাফিলতিতেই এই পথে নেমেছে ওর মেয়ে। লেখালেখি করতে চেয়েছিল পেইজ। সাইমন যদি মেয়েটার কোনো লেখা ওর বন্ধুর স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে পাঠাত, তবে কেমন হতো? অনুদানের বিনিময়েও যদি লেখাটা ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারত সে, কেমন হতো তাহলে? পেইজ কি তাহলে লেখালেখিতে আরো বেশি মন দিত? প্রথমে কলাম্বিয়ায় ভর্তির আবেদন করেছিল পেইজ, সুযোগ পায়নি। সাইমনের কি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ

কাজে লাগিয়ে মেয়েকে ওখানে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল? উইলিয়ামসের বোর্ডে ছিলেন ইভোনির শ্বশুর। সাইমন অনুরোধ করলে ইভোনি ওখানে কিছু একটা করতে পারত। ওখানে ভর্তি হলেও হয়তো পেইজ ভুল পথে পা বাড়াত না। ডর্ম রুমে রাখার জন্যে একটা বেড়াল চেয়েছিল মেয়েটা, কিন্তু কিনে দেয়নি সাইমন। সেভেন্থ গ্রেডে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, মেরিলি-র সঙ্গে ঝগড়া করেছিল পেইজ। সেই ঝগড়া মিটমাট করে দেবার কোনো উদ্যোগ নেয়নি সাইমন। টার্কি স্যান্ডউইচে পনির পছন্দ করত পেইজ–কিন্তু মাঝেমধ্যে সেটা দিতে ভুলে যেত ওর বাবা। হয়তো এরকম ছোট ছোট অসংখ্য কারণ মিলে বড় ঢেউয়ের মতো ধাক্কা দিয়ে পথ সরিয়ে দিয়েছিল মেয়েটাকে।

বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল ও। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেয়ে। কোনো ধরনের ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করত না পেইজ। ছোটখাটো কোনো ঝামেলা পাকালেও কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলত বেচারি–তখন আর ওকে বকাঝকা করতে মন সরত না সাইমনের। কিন্তু একটু বকাবকি করা দরকার ছিল হয়তো। তাতে হয়তো একটু ভালোই হতো। অল্পতেই কেঁদে ফেলত মেয়েটা। তাতেই মন গলে যেত সাইমনের–কারণ সে-ও অল্পতে...খুব অল্পতেই কেঁদে ফেলত। একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে। কিন্তু কখনো কাউকে বুঝতে দিত না–ভান ধরত, যেন চোখে ময়লা পড়েছে, কিংবা কন্টাক্ট লেন্সে ঝামেলা হয়েছে। বাপকে কাঁদতে না দেখে মেয়েটা হয়তো তাকে খুব বীরপুরুষ ভাবত। কিন্তু মেয়ের সামনে মাঝে মাঝে কাঁদলে ও হয়তো বাপের সঙ্গে আরেকটু শক্ত বন্ধন টের পেত। তাতে হয়তো সাইমনের কাছ থেকে এত দূরে সরে যেত না ও।

ইনগ্রিড যে কখন ভাঙাচোরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করেছে, খেয়ালই করেনি সে। ও যখন খেয়াল করল সাইমন আসছে না সঙ্গে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী হলো, আসছ না কেন? ঠিক আছ তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধাতস্থ হলো সাইমন। তারপর নড করে স্ত্রীর পিছু নিল। 'তিনতলা। অ্যাপার্টমেন্ট *বি*।'

প্রথম ল্যান্ডিঙে কিছু ভাঙাচোরা জিনিসপত্র দেখতে পেল ওরা। দেখে মনে হলো, জিনিসগুলো এককালে সোফা ছিল। দোতলায় উঠে হল-এ উঁকি দিল সাইমন। হ্যাংলা, কালো এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে হলওয়ের শেষ মাথায়। লোকটার মুখভর্তি ঘন কোঁকড়া, সাদা দাড়ি।

তৃতীয় তলায় উঠেই হলুদ টেপের সামনে পড়ে গেল দুজনে। একটা ভারী ধাতব দরজার সামনে ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মতো করে লাগানো টেপ। তাতে লেখা: *ক্রাইম সিন। ডু নট ক্রস।* দরজাটায় খোদাই করে আরেকটা ইংরেজি হরফ লেখা: *বি*। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ইনগ্রিড–হাঁটার গতিও কমাল না মুহূর্তের জন্য। নবে হাত ধরে মোচড় দিল ওতে।

ঘুরল না নবটা।

পিছিয়ে গিয়ে ইশারায় সাইমনকে বলল চেষ্টা করতে। চেষ্টা করল সে। নবটা ধরে ঘোরাল, মোচড়াল, টানল, ঠেলা দিল। লাভ হলো না কোনো।

তালা মারা।

চারপাশের দেয়ালের অবস্থা এতই খারাপ যে, সাইমন হাতের ঘুষিতে ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারবে। কিন্তু দরজাটা কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।

'অ্যাই।'

স্বাভাবিক গলায় বলা এই সাধারণ শব্দটাই বন্দুকের গুলির মতো তীব্র আওয়াজ তুলল বদ্ধ জায়গায়। আঁতকে উঠে শব্দের উৎসের দিকে ফিরে তাকাল সাইমন আর ইনগ্রিড। ঘন দাড়িঅলা কালো লোকটা। পালানোর পথ আছে কি না দেখল সাইমন। ওরা যেদিক দিয়ে এসেছে, সেদিকে ছাড়া আর কোনো পথে বেরোনো যাবে না। সেই পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে শুঁটকো লোকটা।

নিজের অজান্তেই–সহজাত প্রবৃত্তির বশে–চট করে ইনগ্রিডের সামনে চলে গেল সাইমন। স্ত্রী আর নবাগত লোকটার মাঝখানে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল।

কয়েক মুহূর্ত কথা জোগাল না কারো মুখেই। বিষণ্ন করিডরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মানুষ। ওপরের তলায় গান ছেড়ে দিল কেউ। বাজনার ধুমধুম আর গায়কের গলা ফাটানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আবছাভাবে।

কয়েক মুহূর্ত পর লোকটা বলল, 'পেইজকে খুঁজছ তোমরা।'

প্রশ্ন করেনি সে।

'তুমি,' হাড় জিরজিরে একটা আঙুল তাক করল সে ইনগ্রিডের দিকে। 'ওর মা।'

'তুমি কীভাবে জানো?' জিজ্ঞেস করল ইনগ্রিড।

'দেখতে তুমি অবিকল ওর মতো। নাকি ও দেখতে তোমার মতো?' কোঁকড়া দাড়িতে হাত বোলাল লোকটা।

'পেইজ কোথায়, জানো তুমি?' সাইমনের প্রশ্ন।

'সেজন্যেই এসেছ তোমরা? ওকে খুঁজছ?'

লোকটার দিকে এক পা এগিয়ে গেল ইনগ্রিড। 'হ্যাঁ। ও কোথায় আছে জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল সে। 'দুঃখিত, জানি না।'

'কিন্তু ওকে চিনতে তো, না?'

'হ্যাঁ, চিনতাম। ওদের নিচের তলায়ই থাকি আমি।'

'আর কেউ আছে, যে জানতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'আর কে থাকবে?'

'ওর বন্ধু-বান্ধব।'

লোকটা হাসল। 'আমি ওর বন্ধু।'

'অন্য কোনো বন্ধু থাকতে পারে না?'

'আছে বলে মনে হয় না।' দাড়ির ইশারায় দরজা দেখাল লোকটা। 'ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছ?'

স্ত্রীর দিকে চাইল সাইমন। ইনগ্রিড বলল, 'হ্যাঁ। কিছু পাওয়া যায় কি না...'

'কী পাবে?' সরু হয়ে এল লোকটার চোখ।

'সত্যি বলতে কী, জানি না,' জবাব দিল ইনগ্রিড।

'আমরা ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি,' পাশ থেকে কথা জোগাল সাইমন।

খানিকক্ষণ দাড়িতে হাত বোলাল লোকটা। তারপর বলল, 'আমি তোমাদের ভেতরে নিতে পারি।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। পরক্ষণেই একটা চাবি বের করে আনল।

'তোমার কাছে কীভাবে...?'

'বললামই তো, আমি ওর বন্ধু। বাড়ির ভেতর আটকে গেলে বের করার জন্যে কোনো বন্ধুর কাছে দরজার চাবি দিয়ে রাখো না তোমরা? এমন কোনো বন্ধু নেই তোমাদের?' গ্রিন দম্পতির দিকে এগোল সে। 'পুলিশ যদি টেপ ছেঁড়ার জন্যে হম্বিতম্বি করে, আমি কিন্তু তোমাদের ওপর দোষ চাপাব। এখন চলো, ভেতরে ঢুকি।'

***

অ্যাপার্টমেন্টটা একটা বদ্ধ খুপরিরই নামান্তর। সাইজে পেইজের কলেজের ডর্ম রুমের অর্ধেক। বিছানা বলতে দুদিকে দুটো সিঙ্গেল মাদুর পাতা–একটা ডানপাশের দেয়াল ঘেঁষে, অন্যটা বামের দেয়াল ঘেঁষে। খাট-টাটের বালাই নেই। নেই অন্য কোনো আসবাবও।

ডান দিকের দেয়ালের এক কোণে পেইজের গিটারটা ঠেস দিয়ে রাখা। তার পাশে ওর কাপড়ের তিনটে স্তূপ। পুরো ঘরটা যেন একটা জঙ্গল–কেবল মেয়েটার কাপড়গুলো সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। স্থির চোখে সেদিকে চেয়ে রইল সাইমন। টের পেল, ওর হাতের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আলতো করে চেপে ধরেছে ইনগ্রিড। পেইজ বরাবরই নিজের কাপড়চোপড় যত্ন করে রাখে।

ঘরের বাম দিকে, মেঝের কাঠের ওপর, রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে–শুকিয়ে গেছে।

'তোমাদের মেয়ে কখনো কারো কোনো ক্ষতি করেনি,' কালো লোকটা বলল। 'নিজের ছাড়া।'

তার দিকে ফিরে চাইল ইনগ্রিড। 'তোমার নাম কী?'

'কর্নেলিয়াস।'

'আমি ইনগ্রিড। ও পেইজের বাবা, সাইমন। কিন্তু তুমি ভুল বলেছ, কর্নেলিয়াস।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'মেয়েটা নিজের ছাড়াও অন্যের ক্ষতি করেছে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবার পর মাথা ঝাঁকাল কর্নেলিয়াস। 'তা হয়তো ঠিক, ইনগ্রিড। কিন্তু ওর ভেতরে ভালোমানুষিটা বড় বেশি। আমার সঙ্গে প্রচুর দাবা খেলত।' সাইমনের চোখে চোখ রাখল সে। 'আমাকে বলেছে, তুমি শিখিয়েছ ওকে।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সাইমন, কথা বলতে ভয় পাচ্ছে।

'ক্লো-কে নিয়ে হাঁটতে যেতে পছন্দ করত ও। ক্লো আমার কুকুর। ককার স্প্যানিয়েল। বলেছিল, বাড়িতে ওর একটা কুকুর ছিল। কুকুরটার কথা খুব মনে পড়ত ওর। জানি, পেইজ তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েছে–কিন্তু আমি ওর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কথা বলছি। শয়তান ঢুকে গিয়েছিল ওর ভেতরে। নানান রূপ ধরে আমাদেরকে ফাঁদে ফেলে শয়তান। কখনো জুয়া, কখনো নেশার রূপ ধরে।' ঘুরে মেঝের রক্তের দিকে তাকাল সে। 'কখনো কখনো মানুষের রূপও নেয়।'

'অ্যারনকেও বোধহয় চিনতে তুমি, না?' জানতে চাইল সাইমন।

স্থির দৃষ্টিতে রক্তের দিকে চেয়ে রইল কর্নেলিয়াস। 'কখনো কখনো মানুষের রূপ নিয়েই আসে শয়তান। সে-ই করে দেয় শয়তানের কাজ।' চোখ তুলে গ্রিন দম্পতির দিকে চাইল সে। 'কারো মৃত্যু কামনা করতে পছন্দ করি না আমি। কিন্তু তারপরও...মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখতাম পঙ্কিলতার মাঝে ডুবে রয়েছে সে–পেইজও। ওকে দেখতাম, আর ভাবতাম...'

ক্ষীণ হয়ে এল তার কণ্ঠ।

'পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ইনগ্রিড।

'ওরা বলেছে আমার সাথে। কিন্তু বলার মতো কিছু ছিল না আমার।'

'পেইজকে শেষ কখন দেখেছ?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল কর্নেলিয়াস। 'আমি আশা করেছিলাম তোমরা বলবে।'

'মানে কী?'

একটা হুটোপুটির শব্দ ভেসে এল করিডর থেকে। দরজা দিয়ে বাইরে মাথা বের করে দিল কর্নেলিয়াস। একটা অল্পবয়সি যুগল টলতে টলতে আসছে ওদের দিকে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

'কর্নেলিয়াস,' জড়ানো গলায় বলল তরুণ। 'কী হচ্ছে বলো তো?'

'সব ঠিক আছে, এনরিক। কেমন আছ, ক্যান্ডি?'

'লাভ ইউ, কর্নেলিয়াস।'

'লাভ ইউ, টু।'

'জায়গাটা পরিষ্কার করছ?' এনরিকের প্রশ্ন।

'নাহ। সব ঠিক আছে কি না দেখছি আরকি।'

'ব্যাটা অকর্মার হদ্দ ছিল।'

'এনরিক!' ঝাঁঝিয়ে উঠল ক্যান্ডি।

'কী?'

'লোকটা মারা গেছে।'

'তাহলে ব্যাটা মরে যাওয়া অকর্মার হদ্দ। এবার ভালো শোনাচ্ছে?'

দরজায় উঁকি দিয়ে সাইমন আর ইনগ্রিডকে দেখল এনরিক। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কারা তোমার সঙ্গে?'

'কেউ না, পুলিশ,' জবাব দিল কর্নেলিয়াস।

সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল যুগলের আচার-আচরণ। সহসা বন্ধ হয়ে গেল ওদের টলমল ভাব।

'ওহ, দেখা হয়ে ভালো লাগল,' ক্যান্ডি বলল।

তড়িঘড়ি হলের শেষপ্রান্তের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল দুজনে। ওরা চোখের আড়াল হওয়ার আগ পর্যন্ত মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখল কর্নেলিয়াস।

'কর্নেলিয়াস?' ডাকল ইনগ্রিড।

'হুম।'

'পেইজকে শেষ কখন দেখেছ?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, বিষণ্নতা খেলছে চোখে। বলল, 'এখন তোমাদের যা বলব, সেটা সঙ্গত কারণেই পুলিশকে বলিনি।'

নীরবে অপেক্ষা করছে ইনগ্রিড আর সাইমন।

'একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে তোমাদের। পেইজ বখে গিয়েছিল। একেবারেই বখে গিয়েছিল। বলতে ভালো লাগছে না, তবু বলি। ও যখন আমার বাসায় দাবা খেলতে বা আড্ডা দিতে যেত, ওর ওপর কড়া নজর রাখতাম আমি। সারাক্ষণই ভয়ে ভয়ে থাকতাম, কখন না জানি কিছু চুরি করে বসে ও। বখে যাওয়া নেশাখোররা সবসময়ই এ কাজ করে।'

সাইমন জানে, কথাটা সত্যি। ওদের কাছ থেকেও চুরি করেছে পেইজ। প্রায়ই টাকা উধাও হয়ে যেত সাইমনের ওয়ালেট থেকে। ইনগ্রিডের কয়েকটা গহনা উধাও হয়ে যাবার পর অম্লান বদনে দোষ অস্বীকার করেছিল পেইজ।

বখে যাওয়া নেশাখোররা সবসময়ই চুরি করে।

বখে যাওয়া নেশাখোর।

ওর মেয়ে একটা বখে যাওয়া নেশাখোর। কথাটা সাইমন নিজে কখনো উচ্চারণও করেনি, কিন্তু আজ কর্নেলিয়াসের মুখ থেকে শুনে মনে হলো, দশমণী ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে যেন কেউ ওর মুখে।

'অ্যারন খুন হবার দুদিন আগে পেইজকে দেখি আমি। সদর দরজার সামনে। আমি তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় উড়ে নিচে

(1,1) -36- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:24

নামছিল ও, হোঁচট খেতে খেতে। দেখে মনে হচ্ছিল, কেউ তাড়া করছে ওকে। এত দ্রুত নামছিল, ভয় হচ্ছিল যেকোনো সময় পা হড়কে পড়ে যেতে পারে।'

চোখ ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকে চাইল কর্নেলিয়াস, যেন এখনো মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে।

'ওকে থামানোর জন্য হাত তুলি আমি।' দুই বাহু তুলে নমুনা দেখাল সে। 'ডেকেছিলামও। কিন্তু পাত্তা না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ও। মুহূর্তের জন্যেও গতি কমায়নি। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'কেমন ঘটনা?' জানতে চাইল ইনগ্রিড।

ওর দিকে মনোযোগ ফেরাল কর্নেলিয়াস। 'পেইজের আমাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। দেখে মনে হতো দিক্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও, আমাকে চেনে না। বহুবার পাগলের মতো দৌড়ে পাশের ঘরগুলোতে গেছে। গেছে পাশের বিল্ডিঙেও। এমন আচরণ কখন করে জানো তো?'

মাথা দোলাল দুজনেই।

'রোকোর কাছ থেকে জিনিস আনতে যায় ওখানে।'

'রোকো?'

'স্থানীয় ডিলার। ওর হয়ে কাজ করত অ্যারন।'

'অ্যারন ড্রাগ কেনাবেচা করত?' জানতে চাইল ইনগ্রিড।

ভ্রু নাচাল কর্নেলিয়াস। 'অবাক লাগছে?'

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল সাইমন আর ইনগ্রিড। মোটেই অবাক হয়নি।

'ঘটনা হচ্ছে, নেশাখোরের যখন নেশার জিনিস লাগবে, তখন তার সামনে সেনাবাহিনী দাঁড় করিয়ে দিলেও পাত্তা দেবে না সে। তাই বলছি, পেইজের ওভাবে দৌড়ে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা না।'

'তাহলে ঘটনাটা অস্বাভাবিক হলো কেন?' প্রশ্ন করল সাইমন।

'ওর চেহারায় জখমের দাগের কারণে।'

সাইমন টের পেল, ওর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বহু দূর থেকে ভেসে এল যেন ওর কণ্ঠ। 'জখমের দাগ?'

'রক্তও ছিল খানিকটা। দেখে মনে হচ্ছিল, মারধোর করা হয়েছে ওকে।'

মুঠো পাকিয়ে ফেলল সাইমন। রাগে পুরো শরীর গরম হয়ে উঠছে ওর। ড্রাগ, বখে যাওয়া সন্তান...এসব কোনো-না-কোনোভাবে সহ্য করেছে সে।

কিন্তু কেউ ওর ছোট্ট মেয়েটাকে মেরেছে–এই ব্যাপারটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না।

দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে সাইমন, নিষ্ঠুর একটা হাত মুঠো পাকিয়ে একের পর এক ঘুষি মেরে যাচ্ছে ওর অসহায় মেয়ের মুখে।

রাগ, ক্রোধ, প্রতিহিংসার ঢেউ গ্রাস করে নিল ওকে।

অ্যারন যদি কোনোভাবে বেঁচে থাকত এক মুহূর্ত না ভেবে তাকে খুন করে ফেলত সাইমন। বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ কিংবা অনুশোচনা হতো না ওর এজন্য।

সহসা বাহুতে ইনগ্রিডের হাতের স্পর্শ টের পেল সে। স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করছে বোধহয়।

'তোমার কেমন লাগছে বুঝতে পারছি,' সাইমনের চোখে চোখ রেখে বলল কর্নেলিয়াস।

'তাহলে তুমি কী করছিলে?' জানতে চাইল সাইমন।

'তোমার কেন মনে হলো যে, আমি কিছু করেছিলাম?'

'কারণ আমার কেমন লাগছে, তা বুঝতে পারছ তুমি,' সাইমনের জবাব।

'বুঝতে পারছি মানে এই না যে, আমি কিছু করেছি। আমি ওর বাপ না।'

'তার মানে, স্রেফ কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে চলে গিয়েছিলে?'

'হয়তো।'

মাথা নাড়ল সাইমন। 'ওরকম কিছু সহ্য করার লোক না তুমি।'

'ওকে আমি খুন করিনি,' বলল কর্নেলিয়াস।

'করলেও, সেই তথ্য এই ঘরের বাইরে যাবে না,' সাইমন বলল।

ইনগ্রিডের দিকে তাকাল কর্নেলিয়াস। মাথা দুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল যেন সে। বলল, 'প্লিজ, বাকিটা বলো আমাদের।'

ধূসর-সাদা দাড়ি চুলকাল লোকটা ঘ্যাসঘ্যাস করে। আরেকবার ঘরের চারদিকে নজর বোলাল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এখানে এসেছিলাম আমি।'

'তারপর?'

'তারপর দরজায় ধাক্কা দিই। তালা মারা ছিল। তাই নিজের চাবি বের করি আমি। আজকের মতোই। দরজা খুলি...'

ওপরতলার গানবাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে এখন পিনপতন নিস্তব্ধতা।

ডান দিকে পেতে রাখা মাদুরটার দিকে তাকাল কর্নেলিয়াস। 'ঠিক ওখানে শুয়ে ছিল অ্যারন। বেহেড মাতাল। বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছিল। ভীষণ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল শরীর থেকে–নিশ্বাসই নিতে পারছিলাম না। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম যেন। ইচ্ছে করছিল দৌড়ে বেরিয়ে যাই এই ঘর থেকে, ভুলে যাই সবকিছু।'

থেমে গেল লোকটা।

'তারপর কী করলে?' জানতে চাইল ইনগ্রিড।

'ওর আঙুলের গাঁট পরীক্ষা করে দেখলাম।'

'কী?'

'অ্যারনের ডান হাতের আঙুলের গাঁট পরখ করে দেখলাম। ছেলা ছিল গাঁটগুলোর চামড়া। নতুন ছেলাও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম–অবশ্য অবাক হইনি–মেয়েটাকে ও-ই পিটিয়েছে। সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি...'

আবার থেমে গেল কর্নেলিয়াস। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে এবার। তারপর বলল, 'সুযোগ পেলে হয়তো কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতাম। হারামিটা সজাগ থেকে নিজের অপকর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলে হয়তো পিটিয়ে খুন করে ফেলতাম ওকে। কিন্তু বেহুঁশ আবর্জনার স্তূপটার দিকে তাকিয়ে করুণা আর বিবমিষা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি টের পেলাম না নিজের মধ্যে।'

চোখ খুলল লোকটা।

'তারপর তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে,' বলল ইনগ্রিড।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল কর্নেলিয়াস। 'আজকের মতোই হল ধরে ঘরে ফিরছিল এনরিক আর ক্যান্ডি। দরজা বন্ধ করে নিচতলায় ফিরে যাই আমি।'

'ব্যস, ওখানেই শেষ ঘটনা?'

'ওখানেই শেষ,' বলল কর্নেলিয়াস।

'এরপর আর পেইজকে দেখনি তুমি?'

'না। অ্যারনকেও দেখিনি। তোমরা আসার পর মনে হলো, আমার ধারণা হয়তো ভুল ছিল।'

'কোন্ ধারণা?'

'রোকোর কাছ থেকে নেশার জিনিস কিনতে যাওয়ার ধারণা। তোমাদের দেখে মনে হলো, হয়তো দৌড়ে মা-বাবার কাছে ফিরে গিয়েছিল ও। তাদেরকে জানিয়েছিল, কী হয়েছে ওর সঙ্গে। হয়তো সেজন্যেই এখানে এসেছ তোমরা।'

ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল কর্নেলিয়াস।

'ওরকম কিছু হয়নি,' বলল সাইমন।

'হ্যাঁ, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,' ফের বলল সাইমন।

'সেটাও দেখতে পাচ্ছি।'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর ও কোথায় গেছে, তা জানতে হবে।'

মাথা দোলাল কর্নেলিয়াস। 'সেজন্যে রোকোর সাথে দেখা করতে হবে তোমাদের।'

৯

রোকোর সঙ্গে দেখা করার উপায় বাতলে দিয়েছে কর্নেলিয়াস। 'এই বিল্ডিঙের একপাশের বেড়ায় একটা ফোকর আছে। সেই ফোকর দিয়ে অন্যপাশের পরিত্যক্ত বিল্ডিঙটায় ঢুকলেই পাবে ওকে।'

ওখানে গিয়ে কী দেখবে, বুঝে উঠতে পারছে না সাইমন। টিভিতে প্রচুর ড্রাগ লেনদেনের দৃশ্য দেখেছে সে। ভয়ংকর চেহারার মানুষগুলো পিস্তল-বন্দুক হাতে নেশাদ্রব্য আদান-প্রদান করে। ছোট ছোট বাচ্চাদের ব্যবহার করা হয় এ কাজে, যাতে জেলে গেলেও সাজা কম হয়। এসবই বোধহয় অতিরঞ্জিত দৃশ্য। ইনগ্রিডকে নিয়ে বেড়ার ফোকরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাইমন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। টিভির মতো অস্ত্র হাতে পাহারায়ও নেই কেউ। দূর থেকে অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, পরিত্যক্ত ভবন থেকে আসছে বোধহয়। কিন্তু প্রত্যাশিত বিপদের দেখা এখনো পাওয়া যায়নি।

তবে তার মানে কিন্তু এই নয় যে, পরিস্থিতি এখন নিরাপদ।

'আবার জিজ্ঞেস করছি,' ইনগ্রিডের ফিরে বলল সাইমন। 'আমাদের প্ল্যান কী?'

'জানলে তো ভালোই হতো।'

বেড়ার ফোকরটার দিকে তাকাল ওরা।

'প্রথমে আমি যাই,' সাইমন বলল। 'জায়গাটা নিরাপদ না-ও হতে পারে।'

'আমাকে এখানে একা ফেলে? তখন বুঝি খুব নিরাপদ থাকব?'

যুক্তি আছে ইনগ্রিডের কথায়।

'তোমাকে বাড়িতে রেখে এলেই পারতাম,' অস্ফুটে বলল ওর স্বামী।

'তা পারতে,' একমত হলো সে। তারপর চট করে ওপাশে ঢুকে পড়ল বেড়ার ফোকর গলে।

ওর পিছু নিল সাইমন। হাঁটু-সমান লম্বা হয়ে জন্মেছে আগাছা। সাবধানে বাতিল জিনিসপত্রের স্তূপ এড়িয়ে হাঁটছে দুজনে। ইনগ্রিড সব গয়নাগাটি খুলে রেখেছে, এমনকি বিয়ের আঙটিটাও। সাইমনের সঙ্গে দামি কোনো জিনিসপত্র নেই। দুজনের সাথে নগদ টাকা আছে শ'খানেক ডলার। কাজেই ওদের কাছে ছিনতাই করার মতো কিছু পাবে না ড্রাগের কারবারিরা।

সেলারের স্টিলের দরজাগুলো খোলা। মুখব্যাদান করে রাখা অন্ধকার দরজাগুলোর দিকে তাকাল সাইমন আর ইনগ্রিড। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে কংক্রিটের মেঝে দেখতে পেল। নানা রকমের আওয়াজ ভেসে আসছে মাটির নিচ থেকে–অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, ফিসফিসানি, হাসির আওয়াজ। আগে বাড়ল ইনগ্রিড, কিন্তু চট করে কয়েক লাফে ওর সামনে চলে গেল সাইমন। ঝটপট দরজা পেরিয়ে নেমে গেল কংক্রিটের মেঝেতে।

ভেতরে পা রাখতেই দুর্গন্ধটা ধাক্কা মারল নাসারন্ধ্রে। পচা ডিমের সাথে অ্যামোনিয়ার মতো কোনোকিছুর গন্ধ মেশালে এরকম দুর্গন্ধ হয়।

কণ্ঠস্বরগুলো এখন অনেকটাই স্পষ্ট। শব্দের উৎসের দিকে হাঁটা ধরল সাইমন। নিঃশব্দে হাঁটার কোনো চেষ্টাই করছে না সে। এসব লোকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে যাওয়ার চেয়ে বড় ভুল আর নেই। লোকগুলোকে চমকে দিয়ে কোনো অঘটন ঘটাতে চায় না সে।

দ্রুত পা চালিয়ে ওকে ধরে ফেলল ইনগ্রিড। ওরা বেজমেন্টের মাঝখানে পৌঁছতেই কেউ যেন সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল কণ্ঠগুলো। দুর্গন্ধটা অসহ্য লাগছে সাইমনের। হাঁ করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করল সে। ওর ডান দিকে হাত-পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে আছে চারজন মানুষ। দেখে মনে হয়, ওদের শরীরে যেন হাড়গোড়ের কোনো অস্তিত্বই নেই। ভেতরে আলো অত্যন্ত ক্ষীণ। সেই আলোয় সাইমন দেখতে পেল, মানুষগুলো চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। একসময় সস্তা ওয়াইন রাখা হতো, এমন সব কার্ডবোর্ডের বাক্সকে ব্যবহার করা হচ্ছে টেবিল হিসেবে। চামচ, লাইটার, বার্নার আর সিরিঞ্জ পড়ে রয়েছে ওগুলোর ওপর।

কেউ নড়াচড়া করছে না। সাইমন আর ইনগ্রিডও স্থির দাঁড়িয়ে রইল। চারজন মানুষ মেঝেতে। চারজনই? এর বেশিও হতে পারে–বোঝা যাচ্ছে না। স্থির শুয়ে আছে মানুষগুলো।

আরো কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর নড়ে উঠল একজন। একটা লোক। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। পানির নিচ থেকে গডজিলা যেভাবে মাথা তুলত, ঠিক সেভাবে উঠে দাঁড়াল দৈত্যাকার লোকটা। সিলিং ছুঁই-ছুঁই করছে তার মাথা। হোঁচট খেতে খেতে দুই আগন্তুকের দিকে এগোল বিশালদেহী লোকটা।

'বলো তোমাদের জন্য কী করতে পারি?' বন্ধুসুলভ, খুশি খুশি গলায় বলল সে।

'রোকোকে খুঁজছি আমরা,' সাইমন বলল।

'আমিই সেই অধম।'

করমর্দনের জন্যে বিশাল হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। হাত তো নয়, যেন থাবা। থাবাটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল সাইমন। লোকটার থাবার ভাঁজে ওর হাত যেন হারিয়েই গেল। হাসি ফুটল রোকোর মুখে। তার মাথায় ইয়াঙ্কিস ক্যাপ, ইনগ্রিডের মতোই। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটার পরনে ডেনিম শর্টস, আর বার্কেনস্টকের স্যান্ডেল।

'বলো, তোমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

আগের মতোই খুশি খুশি গলায় করল সে প্রশ্নটা। রুমের বাকিরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আবার। লাইটার দিয়ে বার্নার জ্বালিয়ে, প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা অপরিচিত পাউডার সেবন করছে।

'আমরা আমাদের মেয়েকে খুঁজছি,' ইনগ্রিড বলল। 'ওর নাম পেইজ।'

'জানতে পেরেছি, দুদিন আগেই এখানে এসেছিল ও,' যোগ করল সাইমন।

'ওহ, তাই?' দুই হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল রোকো। 'কীভাবে জানলে?'

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল সাইমন আর ইনগ্রিড। 'শুনেছি,' জবাবটা দিল সাইমন।

'কার কাছ থেকে?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সাইমন, 'পেইজকে তুমি চিনতে, না?'

'হ্যাঁ, চিনতাম।'

'ও কি...' এইটুকু বলে থেমে গেল ইনগ্রিড, উপযুক্ত শব্দ খুঁজছে, '...তোমার খদ্দের?'

'আমার খদ্দেরদের নিয়ে বাইরের কারো সঙ্গে আলাপ করি না। আমার ব্যবসায় গোপনীয়তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গোপনীয়তা বজায় রাখতে না পারলে খদ্দেররা আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না।'

'তোমার ব্যবসা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই,' ইনগ্রিড বলল। 'আমরা শুধু আমাদের মেয়েকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

'তোমাকে দেখে চমৎকার মহিলা মনে হচ্ছে, মিস...?'

'গ্রিন। আমি ডাক্তার।'

'তোমাকে চমৎকার মহিলা মনে হচ্ছে, ডা. গ্রিন। আমাদের আড্ডাটা একবার দেখ।' দুই বাহু দুদিকে ছড়িয়ে দিল রোকো, যেন পারলে পুরো বেজমেন্টটাকে জড়িয়ে ধরে। 'জায়গাটা দেখে কী মনে হয় তোমার? আমাদের দেখে কি মনে হয় যে লোকজনকে বলে দেব তাদের আত্মীয়স্বজন কোথায় লুকিয়ে আছে?'

'সত্যি?' সাইমন বলল পাশ থেকে।

'কী সত্যি?'

'সত্যিই কি পেইজ আমাদের থেকে লুকিয়ে আছে?'

'সেটা আমি তোমাদের বলব না।'

'দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে বলবে?' জানতে চাইল সাইমন।

মৃদু গুঞ্জন উঠল দলটার মধ্যে।

আরেক কদম এগিয়ে এল রোকো। 'গলা নামিয়ে কথা বলো।'

'প্রস্তাবটা কিন্তু এখনো কার্যকর আছে,' সাইমন বলল।

চিবুক ঘষল রোকো। 'টাকাটা তোমার সঙ্গে আছে।'

ভুরু কোঁচকাল সাইমন। 'প্রশ্নই ওঠে না।'

'সঙ্গে নগদ কত আছে?'

'আশি...বড়জোর একশো ডলার। কেন, ছিনতাই করতে চাও?' গলা চড়াল সাইমন। 'কিন্তু একটু আগে যে প্রস্তাবটা দিলাম, সেটা এই রুমের সবার জন্য প্রযোজ্য: পেইজের খোঁজ যে দিতে পারবে, সে-ই দশ হাজার ডলার পাবে।'

রোকোর চোখে চোখ রাখল ইনগ্রিড। জোর করেও চোখ সরিয়ে নিতে পারল না লোকটা। 'প্লিজ,' অনুনয়ের সুরে বলল ইনগ্রিড। 'আমার বিশ্বাস, ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে পেইজ।'

'অ্যারনের সাথে যা ঘটেছে, সেটার কারণে?'

রোকোর মুখ থেকে নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল কামরার আবহাওয়া।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ইনগ্রিড।

মাথা ঝাঁকাল রোকো। 'ওখানে কী হয়েছিল বলে মনে হয় তোমার, ডা. গ্রিন?'

আগের মতোই শান্ত-স্বাভাবিক লোকটার কণ্ঠ–কিন্তু সাইমনের মনে হলো, একটু যেন তীক্ষ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে তাতে। লোকটা ড্রাগের কারবারি। আর অ্যারনকে যেরকম নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, তাতে ড্রাগ ডিলারদের সংঘর্ষের কথাই মনে পড়ে যায়। আচ্ছা, অ্যারন যদি রোকোর জন্যে কাজ করত...

'অ্যারনকে নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই,' ইনগ্রিড বলল। 'এই জায়গা কিংবা তোমার ব্যবসা নিয়েও কোনো মাথাব্যথা নেই আমাদের। অ্যারনের যে পরিণতি হয়েছে, তার সাথে পেইজের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'তুমি কীভাবে জানো?' চাঁছাছোলা প্রশ্ন রোকোর।

'কী?'

'তুমি কীভাবে জানো যে, অ্যারনের খুনের সাথে জড়িত না পেইজ?'

এই সুযোগটা নিল সাইমন। 'পেইজকে চিনতে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তোমার জানার কথা।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল রোকো। 'আমি জানি, সামান্য ঝড়ের ঝাপটাতেই কুপোকাত হয়ে যেত মেয়েটা। কিন্তু তার মানে এই না যে, একটা লোককে ড্রাগ দিয়ে বেহুঁশ করে তাকে খুন করতে পারবে না সে।'

'দশ হাজার ডলার,' আবার বলল সাইমন। 'আমরা শুধু আমাদের মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে চাই।'

থমথমে নীরবতা নেমে এল নোংরা, স্যাঁতসেঁতে বেজমেন্টে। ভাবলেশহীন চেহারায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রোকো। প্রস্তাবটা বোধহয় ভেবে দেখছে। তার চিন্তায় বাধা দিল না সাইমন আর ইনগ্রিড।

সহসা একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'অ্যাই, তোমাকে আমি চিনি।'

কোনার দিকে ঘুরে গেল সাইমন। লোকটার নাম হিপস্টার গ্রামার টম। শাসানির ভঙ্গিতে সাইমনের দিকে আঙুল তুলল সে। 'তুমিই ওই লোক।'

'কীসের কথা বলছ, টম?'

'এই ব্যাটাই ওই লোক, রোকো।'

'কোন্ লোক?'

বেল্ট ধরে জিন্সের প্যান্ট খানিকটা ওপরে তুলে নিল হিপস্টার গ্রামার টম। 'ওই ভিডিয়োর লোক। এই ব্যাটাই ঘুষি মেরেছিল অ্যারনকে। পার্কে।'

কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে সাইমনের দিকে চেয়ে রইল রোকো। তারপর বলল, 'ঠিকই ধরেছ বোধহয়।'

'আমি বলছি, রোকো, এই ব্যাটাই ওই লোক।'

সাইমনের দিকে চেয়ে হাসল রোকো। 'সত্যি নাকি? ভিডিয়োর ওই লোকটা তুমিই?'

'হ্যাঁ।'

চেহারায় কৃত্রিম আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়ে তুলল রোকো। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ওহ, ঈশ্বর! প্লিজ, আমাকে আবার মেরে বোসো না।'

খিকখিক করে হেসে উঠল হিপস্টার গ্রামার টম। আরো কয়েকজন যোগ দিল তার সঙ্গে।

সেই গুহাযুগ থেকেই অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে আদিম একটা প্রবৃত্তি কাজ করে মানুষের মধ্যে। সেই প্রবৃত্তির বশে আসন্ন বিপদের গন্ধ টের পায় সে। আধুনিক মানুষ প্রবৃত্তিটার নাম দিয়েছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

সেই প্রবৃত্তির বশেই লোকটা যখন টলতে টলতে এগিয়ে এল, সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল সাইমনের ঘাড়ের সবকটা পসম।

রোকো ডাকল, 'লুথার?'

(1,1) -40- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:25

ওস্তাদের ডাক শুনে চট করে দাঁড়িয়ে গেল লুথার নামের যুবক। বিশের কোঠায় বয়স ছেলেটার। গায়ে শার্ট নেই, পাকানো পেশি কিলবিল করছে। খেলা শুরু করার জন্যে অস্থির মুষ্টিযোদ্ধার মতো লাফাচ্ছে যুবক। তার বড় বড় চোখ দুটো সাইমন আর ইনগ্রিডের ওপর এসে স্থির হলো। পরক্ষণেই, বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে, একটা পিস্তল বের করে আনল সে।

'লুথার!'

নিশানা ঠিক করল লুথার। আর কোনো কথা হলো না, সতর্কও করা হলো না কাউকে। নিষ্কম্প হাতে পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিল লুথার।

কানফাটানো আওয়াজ তুলে, সাইমনের নাক ঘেঁষে চলে গেল বুলেটটা। ওটার তীক্ষ্ণ হিশ! হিশ! শব্দ শুনতে পেল সে। ওকে পেরিয়ে চলে গেল বুলেটটা। পরক্ষণেই রক্তের ছিটা লাগল ওর গালে।

রক্ত...

ঝাপসা হয়ে এল ইনগ্রিডের চোখ, পরক্ষণেই মেঝেতে পড়ে গেল সে।

সিনেমার মতো ধীর গতিতে ওকে পড়ে যেতে দেখল সাইমন। যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চিরকাল বিপদের আভাস দেয়, আজ সে ব্যর্থ হয়েছে। পালাবার কোনো সুযোগই পায়নি সাইমন। চোখের সামনে ওর গোটা পৃথিবী, ইনগ্রিডকে শক্ত কংক্রিটের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখল সে। রক্ত বেরোচ্ছে ওর শরীর থেকে। এবার দ্বিতীয় একটা প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিল সাইমনের মধ্যে।

রক্ষা করতে হবে ইনগ্রিডকে...

ঝট করে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল সাইমন। তারপর অনেকটা অবচেতন মনেই স্ত্রীকে আড়াল করল নিজের দেহ দিয়ে। বর্ম হয়ে শত্রুর বুলেট থেকে রক্ষা করতে চাইছে ওকে। সেইসাথে বোঝার চেষ্টা করছে প্রাণ আছে কি না ওর দেহে...রক্তপাতের উৎসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

সাইমনের মস্তিস্কের আরেকটা অংশ ওকে সতর্ক করে দিতে চাইছে, যেকোনো মুহূর্তে আবার গুলি চালাতে পারে লুথার। কিন্তু সেই হুঁশিয়ারিকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে একটাই চিন্তা–*ইনগ্রিডকে রক্ষা করো...*

ঝুঁকি নিয়ে চোখ তুলে চাইল সাইমন। এগিয়ে এসে ওর মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল তুলেছে লুথার। একসঙ্গে ডজনখানেক চিন্তা ঝড় তুলে গেল মাথার মধ্যে–*ছেলেটা আবার গুলি করার আগেই সরে যাও।*

কিন্তু কিচ্ছু করার নেই ওর। স্পষ্ট বুঝতে পারছে সাইমন।

নিজেকে বাঁচানোর মতো সময় নেই ওর হাতে। সেজন্যে ইনগ্রিডকে আরো ভালোমতো জড়িয়ে ধরল, যাতে ওকে একটুও দেখতে না পায় খুনি। মাথা নিচু করে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল সে।

গুলির আওয়াজটা শুনতে পেল সাইমন।

পরক্ষণেই হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে দেখল লুথারকে।

১০

কফির কাপটা টেবিলের ওপর রাখল অ্যাশ। মাথা নিচু করে প্রার্থনা করছে ডিডি। খানিক বাদে প্রার্থনা শেষ হলে অ্যাশ গিয়ে বসল ওর পাশে। টার্গেটের নাম ডেমিয়েন গর্স। এই মুহূর্ত ওরা যেখানে বসে আছে, সেই হাইওয়ের উল্টোপাশের নিউ জার্সি স্ট্রিপ মলে একটা ট্যাটু পার্লারের মালিক লোকটা। পার্লারের নাম লেখা সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে।

আচমকা খিলখিলিয়ে হাসতে শুরু করল ডিডি।

'কী হলো, হাসছ কেন?'

'পার্লারটার নাম দেখ।'

'কেন, নামে কী সমস্যা?'

'ট্যাটুস হোয়াইল ইউ ওয়েট,' বলল ডিডি। 'একটু ভেবে দেখ। অপেক্ষা না করে কেউ ট্যাটু করায় কী করে? কাজটা তো আর এক মিনিটের ব্যাপার না। দোকানে গিয়ে তো বলতে পারবে না, "এই নাও আমার হাত। এতে একটা ট্যাটু এঁকে দাও। দু-ঘণ্টা পর এসে হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"'

মুখে হাতচাপা দিয়ে খলবলিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে ওকে।

'ভালো বলেছ,' তারিফ করল অ্যাশ। সে-ও হাসছে এখন। হয় ইয়ার্কিটা ওর ভালো লেগেছে বলে, নইলে সঙ্গিনীর হাসিটা ছোঁয়াচে বলে। ডিডি ওকে পাগল করে দেয়। মেয়েটার অনেক আচার-আচরণই বিরক্তিকর, সন্দেহ নেই–কিন্তু তারপরও ওকে ভালো লাগে অ্যাশের। সারাক্ষণই সে ভয়ে ভয়ে থাকে, শিগগিরই এই কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে–তারপর মেয়েটা আবার হারিয়ে যাবে ওর জীবন থেকে।

ডিডি হঠাৎ হাসি থামিয়ে খেয়াল করল, ছেলেটা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। 'কী হলো?'

'কিছু না।'

'অ্যাশ...'

'তোমাকে ফিরে যেতে হবে না,' যুবকের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাগুলো।

অসহ্য রকমের সুন্দর একজোড়া সবুজ চোখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল ডিডি। 'ফিরতে তো হবেই।'

'শাইনিং ট্রুথে সত্যের লেশমাত্র নেই। ওটা স্রেফ একটা কাল্ট।'

'তুমি বুঝতে পারছ না।'

'সব কাল্টবাদীরাই এই কথা বলে। এখানে তোমার নিজের জীবন বেছে নেয়ার সুযোগ আছে।'

'শাইনিং ট্রুথ ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই আমার।'

'প্লিজ, ডিডি।'

সিটে হেলান দিয়ে বসল মেয়েটা। 'তোমাকে বলিনি, ওখানে আমি ডিডি না?'

'মানে কী?'

'ট্রুথ হেইভেন-এ আমাকে ওরা হলি নামে ডাকে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ?'

'ওরা তোমার নাম বদলে দিয়েছে?'

'ওরা কিছু বদলায়নি। হলিই আমার সত্য।'

'নাম বদল হচ্ছে কাল্টের নিয়ম নম্বর ১০১।'

'এর অর্থ, আমি এখন নতুন মানুষ। আমি আর ডিডি নই−ডিডি হয়ে থাকতেও চাই না।'

ঠোঁট বাঁকাল অ্যাশ। 'তাহলে তুমি চাও, তোমাকে আমি হলি বলে ডাকব?'

'তুমি ডাকবে না, অ্যাশ।' টেবিলের এপাশে চলে এসে ওর হাতে হাত রাখল মেয়েটা। 'একমাত্র তুমিই সবসময় হলিকে দেখেছ আমার মাঝে।'

ডিডির হাতের উষ্ণতা অনুভব করল সে নিজের হাতে। আরো কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল এভাবে। অ্যাশের মনে হচ্ছিল, সময়টা স্থির হয়ে গেলে বড় ভালো হতো। কিন্তু সে বাস্তবতা জানে। জানে, কোনোকিছুই চিরকাল থাকে না। তাই জোর করে ভাবাবেগ সরিয়ে দিল মন থেকে।

অ্যাশের দিকে চেয়ে হাসল ডিডি, যেন ওর মনের কথা পড়তে পারছে। কে জানে, হয়তো সত্যিই পড়তে পারে। অবশ্য মেয়েটা ওকে এমন একটা দিক থেকে পড়তে পারে, যা অন্য কেউ পারে না। অ্যাশের হাতে কয়েকবার আলতো চাপড় দিল সে। তারপর বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের পজিশন নেয়া উচিত।'

(2,1) -41- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:26

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল অ্যাশ। চুরি করে আনা গাড়িটার দিকে এগোল ওরা। উত্তরের হাইওয়ে ধরে ডাউনিং স্ট্রিটে বেরিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। স্থানীয় রাস্তাটা শপরাইট সুপারমার্কেটে চলে গেছে। মার্কেট থেকে বেরোনোর রাস্তার কাছে, সার্ভেইলেন্স ক্যামেরার আওতা থেকে দূরে গাড়ি পার্ক করল ওরা। তারপর একটা গাছপালায় ঘেরা জায়গা পেরিয়ে ট্যাটু পার্লারের পেছনে চলে এল।

কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল অ্যাশ। আর বিশ মিনিট পর বন্ধ হবে পার্লার।

ঠিকমতো করতে জানলে খুনের চেয়ে সহজ কাজ আর হয় না। বেশি জটিলতায় না গেলেই কাজটা সহজভাবে সারা যায়।

দুই হাতে দস্তানা পরে নিয়েছে অ্যাশ। আপাদমস্তক কালো পোশাক পরে এসেছে সে। স্কি মাস্ক পরলে অসহ্য গরম লাগে বলে ওটা খুলে রেখেছে। তবে হাতের কাছেই রেখেছে জিনিসটা।

বাতিল জিনিসপত্র ফেলার একটা কনটেইনার আছে ট্যাটু পার্লারের পেছনে। সবুজ রঙের কনটেইনারটায় মরচে ধরে গেছে। একটা জানালায় নিয়নবাতির সাইনবোর্ড ঝুলছে–**'পিয়ার্সিং: এনিহোয়্যার, এভ্রিহোয়্যার'**।

জানালা দিয়ে পার্লারের ভেতরে একটা মানব-অবয়বকে নড়াচড়া করতে দেখল অ্যাশ। পার্কিং লটে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে–একটা টয়োটা টুন্ড্রা পিকআপ ট্রাক, খুব সম্ভব দিনের সর্বশেষ খদ্দের; আর পেছনের দিকে, বাতিল জিনিস ফেলার কন্টেইনারের কাছে একটা কাঠের প্যানেলিং করা ফোর্ড ফ্লেক্স। দ্বিতীয় গাড়িটা ডেমিয়েন গর্সের। ওটা হাইওয়ে থেকে চোখে পড়ে না।

অ্যাশের পরিকল্পনা হচ্ছে, ডেমিয়েন গর্সকে দোকান বন্ধ করে গাড়ি পর্যন্ত যেতে দেবে। তারপর খুন করবে তাকে। ঘটনাটা এমনভাবে সাজাবে, যাতে মনে হয় চুরি করতে গিয়ে মালিকের সামনে পড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাকে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা।

দোকানের ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে পেল অ্যাশ। পরক্ষণেই খুলে গেল পার্লারের সামনের দরজা। লালচুলো একটা লোক পা রাখল বাইরে। মাথার চুলগুলো পনিটেইল করে বাঁধা। পিছু ফিরে হাঁক ছাড়ল সে, 'ধন্যবাদ, ডেমিয়েন।'

ডেমিয়েনও পাল্টা হাঁক ছেড়ে কিছু একটা বলল, ওরা শুনতে পেল না। মাথা দুলিয়ে টয়োটা টুন্ড্রার দিকে এগিয়ে গেল পনিটেইলঅলা। লোকটার পুরো হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাঁটতে হাঁটতে হাতটা দেখছে আর আদুরে হাসি দিচ্ছে সে।

দোকানের ভেতর ছায়ামূর্তিটার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। টয়োটা নিয়ে চলে গেল সর্বশেষ খদ্দের।

অ্যাশের কাছে ঘেঁষে এল ডিডি। অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ আসছে ওর গা থেকে। রূপসী নারীদের গা থেকেই কেবল এরকম গন্ধ আসে। ও কাছে

(1,1) -42- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:26

থাকলেই কাজ থেকে মনোযোগ ছুটে যায় অ্যাশের। ব্যাপারটা তার পছন্দ না। মেয়েটার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে মুখে স্কি মাস্ক পড়ল সে।

সমস্ত আলো নিভে গেল দোকানের ভেতর।

'খেলা শুরু,' চাপা গলায় বলল ডিডি।

'এখানেই থাকো।'

মাথা নিচু করে, পার্কিং লট ধরে আরো খানিকটা এগিয়ে গেল অ্যাশ। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল একটা গাছের আড়ালে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল ধৈর্য ধরে। ফোর্ড ফ্লেক্সটার দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। কৃত্রিম কাঠের প্যানেলিঙের জন্যে ওটাকে ফ্যামিলি কারের মতো লাগছে দেখতে। অবশ্য গর্স অবিবাহিত, কোনো সন্তানও নেই। গাড়িটা বোধহয় তার মায়ের। কিংবা বাবার। আরেকটু সময় পেলে এসব তথ্যও জেনে নিত অ্যাশ। অবশ্য ওসব জানার কোনো দরকার নেই। ওর কাজ স্রেফ টার্গেটকে খুন করা, তারপর পেছনে কোনো চিহ্ন না রেখে উধাও হয়ে যাওয়া।

এরপর শুধু আজ এখানে, কাল ওখানে ভেসে বেড়ানো।

পরিকল্পনাটা আরেকবার মনে মনে ঝালিয়ে নিল অ্যাশ। ও যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে গাড়িটার কাছে পৌঁছুতে দশ সেকেন্ডও লাগবে না। কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা যাবে না। প্রতিক্রিয়া দেখানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়া যাবে না লোকটাকে। স্রেফ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গিয়ে বুকে গুলি করে দিতে হবে–দুবার। ও সাধারণত মাথায় গুলি করতেই পছন্দ করে, কিন্তু কোনো চোর-ডাকাত ও-কাজ করবে না। তাছাড়া কেভিন গ্যানোকেও মাথায় গুলি করেই খুন করেছে। দুটো খুনের ধরনে কোনো মিল রাখা যাবে না।

অবশ্য ডেমিয়েন গর্স আর কেভিন গ্যানোকে এক সুতোয় গাঁথার মতো কোনো যোগসূত্র নেই। দুই খুনে একেবারেই আলাদা ধরনের দুটো হ্যান্ডগান ব্যবহার করছে অ্যাশ। খুন দুটো করছেও ভিন্ন পদ্ধতিতে। একটা খুনকে সাজিয়েছে–গ্যানোরটা–বোস্টন এলাকায়, আত্মহত্যা হিসেবে। অন্যটাকে সাজাবে–গর্সেরটা–নিউ জার্সিতে, ডাকাতির ঘটনা হিসেবে।

দুটো ঘটনায় কোনো মিল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এছাড়াও, কেভিন গ্যানো আর ডেমিয়েন গর্সসহ যত মানুষকে অ্যাশ খুন করেছে, তাদের কারো সাথেই কারোর কোনো ধরনের যোগাযোগ বা মিল নেই। মানুষগুলোর বয়স চব্বিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে। সবাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। প্রত্যেকের পড়াশোনাই আলাদা স্কুলে, পেশাও আলাদা। দু-একজনের মধ্যে খুঁজলে হয়তো ছোটখাটো দু-একটা মিল পাওয়া যেতে পারে–বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়ার সুযোগ পেলে হয়তো মিলগুলো জানতে পারত অ্যাশ। কিন্তু আপাতত সেই সময়, সুযোগ বা প্রয়োজন–কোনোটাই নেই।

ট্যাটু পার্লারের ঘণ্টি বেজে উঠল।

(2,1) -42- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:26

পিস্তল উঠে এল অ্যাশের দস্তানা পরা হাতে। স্কি মাস্ক পরে নিয়েছে মুখে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানে অ্যাশ, মাস্কের ভেতর দিয়ে ভালো দেখা যায় না। তাই চোখের ফুটো দুটো আরেকটু বড় করে নিয়েছে সে। চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে। সহসা বাঁয়ে তাকিয়ে দেখতে পেল, জায়গা ছেড়ে এগিয়ে আসছে ডিডি। ভুরু কোঁচকাল সে। নড়াচড়া করার বিপদ সম্পর্কে ভালো করেই জানে মেয়েটা। চুপচাপ বসে থাকা উচিত ওর। কিন্তু মেয়েটা আর কেউ নয়, ডিডি। ওর কাছ থেকে এরকম খামখেয়ালি ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়।

ডান দিক থেকে অ্যাশের দিকে আসছে গর্স। ডিডি ওর বাঁয়ে। গুলি খাওয়ার আগে ওকে দেখার সুযোগ নেই লোকটার।

মেয়েটা স্রেফ ভালোমতো দেখার জন্যে জায়গা বদলেছে।

তবু, কাজটা পছন্দ হয়নি অ্যাশের।

নুড়ি বিছানো পথে কারো হেঁটে হাসার খচমচ শব্দে বিল্ডিঙের দিকে চোখ ফেরাল সে।

ডেমিয়েন গর্স।

দারুণ!

লোকটার বুকে বুলেট সেঁধিয়ে দেয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। তবে এখনো গোলমাল পাকিয়ে যাবার সুযোগ আছে অনেক। কে জানে, বিপদ আঁচ করে গর্স হয়তো রাস্তা বা দোকানের দিকে উল্টো-দৌড় দেবে। তবে সেই সম্ভাবনা কম। আবার অ্যাশের পৌঁছতে দেরি হলে গর্স গাড়িতে উঠে যেতে পারে। তবে গাড়ির কাচের বুলেট আটকানোর ক্ষমতা নেই।

তবে তেমন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। টাইমিংটা নিখুঁত হয়েছে।

গাড়ির রিমোট হাতে নিল গর্স। গাড়ি আনলক হওয়ার পরিচিত বিপ-বিপ শব্দ কানে এল অ্যাশের। ডেমিয়েন গর্স পেছনের বাম্পারে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল লোকটার উদ্দেশে। পরক্ষণেই মনে মনে ধমক লাগাল নিজেকে–*দৌড়াস না, গাধা*। দৌড়ালে গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে।

সবে গাড়ির দরজার হাতলে হাত রেখেছে গর্স, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে পেল সে অ্যাশকে। জিজ্ঞাসু চেহারায় আগন্তুকের দিকে ফিরল সে। পিস্তল তুলে তার বুকে পরপর দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিল অ্যাশ। যতটা ভেবেছিল, গুলির আওয়াজ হলো তারচেয়ে বেশি। অবশ্য তাতে কোনো অসুবিধে নেই–জনমনিষ্যির চিহ্নও নেই আশপাশে। গাড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ল গর্স। সেকেন্ড দুয়েক তাকে সিধে করে দাঁড় করিয়ে রাখল গাড়িটা। তারপর নুড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা।

দ্রুত পায়ে স্থির দেহটার দিকে এগোল অ্যাশ। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, ভালোমতো দেখার জন্যে এগিয়ে আসছে ডিডি। নিচু হয়ে

গর্সের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলো অ্যাশ, তারপর লোকটার পকেট হাতড়াতে লাগল। ওয়ালেট বের করে নিল পকেট থেকে। গর্সের কব্জিতেও একটা ট্যাগ হিউয়ার ঘড়ি বাঁধা। ওটাও খুলে নিল সে।

একেবারে কাছে চলে এসেছে ডিডি।

'স্থির হয়ে একটু জায়গায় বসে থাকতে পারো না?' ধমকে উঠল অ্যাশ।

উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হচ্ছিল সে, কিন্তু ডিডির চেহারা দেখে থমকে গেল।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। পেট গুলিয়ে উঠল অ্যাশের।

'অ্যাশ?' চিবুকের ইশারায় পেছনে দেখাল ডিডি।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল যুবকা। একটা লোক, হাতে ময়লার ব্যাগ। ময়লা ফেলার সবুজ কনটেইনারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা—না, ছেলেটা, টিনেজার—নিশ্চয়ই দোকানের পেছন দিয়ে এসেছে ময়লা ফেলতে। তার হাতের ব্যাগটা এখনো শূন্যেই ঝুলছে। এইমাত্র দেখা ভয়াবহ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আতঙ্কে জায়গায় জমে গেছে সে।

স্কি মাস্ক পরা অ্যাশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলেটা। তাকিয়ে আছে ডিডির দিকেও—ওর মুখে কোনো মাস্ক নেই।

ধুস, শালা! মনে মনে গাল পাড়ল অ্যাশ।

আর কোনো উপায় নেই। পিস্তল তুলে গুলি করল সে। কিন্তু ছেলেটা ঠিক সেই মুহূর্তে নড়তে শুরু করেছিল। ফস্কে গেল গুলি। ঝাঁপ দিয়ে ময়লার কনটেইনারের পেছনে পড়ল সে। সেদিকে দৌড় দিল অ্যাশ। দৌড়াতেই দৌড়াতেই গুলি করল আরেকবার। হাত আর কনুইয়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে আছে ছেলেটা—কাঁপছে থরথর করে। ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। হুড়মুড় করে হামাগুড়ি দিয়ে এক্সিট ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে—পরক্ষণেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

সর্বনাশ!

আজকের কাজের জন্যে রিভলভার নিয়ে এসেছে অ্যাশ। ছয়টা গুলি থাকে এতে। ইতিমধ্যে চারটা বুলেট খরচ হয়ে গেছে। বাকি আছে মাত্র দুটো। ওগুলো নষ্ট করা যাবে না কিছুতেই। এদিকে সময়ও নষ্ট করবার জো নেই। পুলিশে ফোন করতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগবে না ছেলেটার...

অ্যালার্মের গগনবিদারী আওয়াজে পিলে চমকে উঠল অ্যাশের। আওয়াজটা এতই তীক্ষ্ণ যে, মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল সে। কানচাপা দিল দুই হাত তুলে। বন্ করে ডিডির দিকে ঘুরল। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ওকে, 'পালাও!'

মাথা দোলাল মেয়েটা—প্রটোকল বুঝতে পেরেছে। পেছাতে লাগল ও। অ্যাশেরও পালানোর লোভ হলো ওর সঙ্গে। ইচ্ছে করছে পুলিশ আসার

আগেই ল্যাজ তুলে ভাগতে। কিন্তু ছেলেটা ডিডির চেহারা দেখে ফেলেছে। ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে পুলিশের কাছে।

তার মানে, ছেলেটাকে মরতে হবে।

পেছনের দরজার নব ঘুরিয়ে খোলার চেষ্টা করল অ্যাশ। খুলে গেল। প্রথম গুলিটা করার পর সম্ভবত পাঁচ সেকেন্ডের মতো পেরিয়েছে। দোকানে কোনো বন্দুক থেকে থাকলেও, এত অল্প সময়ের মধ্যে ওটা খুঁজে পাওয়ার কথা না ছেলেটার। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে ভেতরে ঢুকে পড়ল অ্যাশ। চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল হন্যে হয়ে।

ছেলেটার কোনো চিহ্ন নেই।

লুকিয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ সময় পাবে অ্যাশ? বেশিক্ষণ না। অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ সারতে হবে ওকে।

ঝড়ের বেগে চিন্তা খেলে যাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে। ছেলেটা ডিডির চেহারা দেখে ফেলেছে। ওকে শনাক্ত করতে পারবে সে। কাজেই ওকে জ্যান্ত রাখা মানেই ডিডিকে পরিষ্কার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া।

সুতরাং, করণীয় এখন একটাই: খুন করতে হবে ছেলেটাকে।

কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টো চিন্তা খেলে গেল অ্যাশের মাথায়। বুঝতে পারল, একটু বেশি বেশিই চিন্তা করে ফেলছে সে। হ্যাঁ, ছেলেটা ডিডিকে দেখে ফেলেছে। ওকে শনাক্তও হয়তো করতে পারবে। কিন্তু ঠিক কী বলবে সে পুলিশকে? লম্বা, সবুজ চোখঅলা এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী মেয়েকে ঘটনাস্থল থেকে পালাতে দেখেছে সে? মেয়েটা নিউ জার্সিতে থাকে না, এমনকি নিউ জার্সির সঙ্গে কোনো সম্পর্কও নেই তার। তাহলে পুলিশ কীভাবে খুঁজে বের করবে ওকে?

কিংবা ধরা যাক, ডিডি নাহয় ধরাই পড়ল। পুলিশ এসে এখুনি ধরে ফেলল মেয়েটাকে। ওকে শনাক্তও করল ছেলেটা। কিন্তু তাতেই বা অসুবিধে কী?

ডিডি বলবে, ডেমিয়েন গর্স যখন খুন হচ্ছিল তখন পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ব্যস। লোকে খুনি ভাববে শুধু স্কি মাস্ক পরা একটা লোককেই। খুন করতে যে ওরা দুজন এসেছিল তা-ই বা জানবে কী করে তারা? ডিডিও খুনির দলের হলে ওর মুখেও তো মাস্ক থাকত, তাই না? ও অনায়াসে দাবি করতে পারবে, খুনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। বলবে, একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এসে পড়েছে ঘটনাস্থলে।

ট্যাটু পার্লারের ভেতর আরেক পা এগোল অ্যাশ।

থমথমে নীরবতা।

এখনো ভাবছে অ্যাশ–ঝুঁকি নিয়ে এই আতঙ্কিত ছেলেটাকে খুঁজে বের করে কি আদৌ কোনো লাভ আছে? সত্যিই কি ডির কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তার তরফ থেকে?

ছেলেটাকে ছেড়েই দেয়া যাক।

সাইরেনের আওয়াজ কানে ঢুকল অ্যাশের।

এক ঝটকায় বাস্তবতায় ফিরে এল সে। এখন ছোকরাকে মেরে বোধহয় কোনো লাভ হবে না।

আরো কাছিয়ে এসেছে সাইরেনের আওয়াজ।

আজ ছেলেটার কপাল ভালো।

ঘুরল অ্যাশ। দরজার দিকে লাফ দিল পালাবার জন্যে। এখন পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ।

ঠিক তখনই খুট করে একটা শব্দ ভেসে এল বেরোনোর দরজার ঠিক পাশের ক্লজিট থেকে।

প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল অ্যাশ, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে থেমে গেল।

ক্লজিটের দরজা খুলল সে। মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা, দুই হাতে ঢেকে রেখেছে মাথা। কাঁপছে থরথর করে।

'প্লিজ,' করুণ গলায় আকুতি জানাল সে। 'খোদার কসম, কাউকে কিচ্ছু...'

আর শোনার সময় নেই।

একটা বুলেট খরচ করল অ্যাশ, ছেলেটার মাথায়। ওর রিভলভারে আর মাত্র একটা বুলেট আছে।

(2,1) -44- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:27

১১

সবাই পালিয়েছে বেজমেন্ট ছেড়ে।

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সাইমন, লুথারকে বস্তার মতো কাঁধে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে রোকো। আরো কয়েক সেকেন্ড–তারচেয়ে বেশিও হতে পারে–আগের জায়গায় পড়ে রইল সাইমন, স্ত্রীকে আড়াল করে শুয়ে রইল বর্মের মতো। যখন বুঝতে পারল বিপদ কেটে গেছে, ফোন বের করে ৯১১-এ ডায়াল করল। কয়েক মুহূর্ত পরই বেজমেন্টের বদ্ধ, দুর্গন্ধময় বাতাস চিড়ে গেল সাইরেনের আওয়াজে।

এত তাড়াতাড়ি তো পুলিশ আসার কথা না–কেউ বোধহয় গুলির আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করে দিয়েছে ওদের। কিংবা সাইরেনের সাথে হয়তো পুলিশের কোনো সম্পর্কই নেই।

ইনগ্রিডের চোখ বন্ধ। ডান কাঁধ আর বুকের ওপরের দিকে কোথাও হয়েছে জখমটা। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। রক্তপ্রবাহ থামানোর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে সাইমন। নিজের পরনের শার্ট খুলে চেপে ধরেছে ক্ষতস্থানে। ইনগ্রিডের পালস আছে কি না দেখার প্রয়োজনও বোধ করেনি। ও মারা গেলে এমনিতেই টের পাবে।

৯১১-এর অপারেটর বলেছে–সাহায্য আসছে, রাস্তায় আছে। দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। কতক্ষণ পেরিয়েছে, জানে না সাইমন। অন্ধকার, নোংরা, বিষাক্ত এই বেজমেন্টে ওরা দুজন সম্পূর্ণ একা। ইনগ্রিডের সঙ্গে সাইমনের প্রথম দেখা হয়েছিল সিক্সটি-নাইন্থ স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয়–এখন ওরা যেখানে থাকে, সেখান থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে। ইনগ্রিড তখন সবে বিদেশ থেকে ফিরেছে। ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনকে জুটি বেঁধে দেয় ইভোনি। ওদেরকে রেস্তোরাঁয় দেখা করতেও পাঠায় সে-ই। প্রথমে পৌঁছেছিল সাইমন। জানালার পাশের একটা টেবিলে বসে নার্ভাসভাবে অপেক্ষা করছিল

(1,1) -45- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:27

ইনগ্রিডের জন্যে। সে যখন মাথা উঁচু করে রাজকীয় ভঙ্গিতে প্রবেশ করল রেস্তোরাঁয়, সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাত হয়ে গেল সাইমন। প্রথম ডেটেই ইনগ্রিডের সঙ্গে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিল। স্বপ্ন দেখে ফেলল, বুড়ো বয়সটাও এই নারীর সঙ্গেই কাটাবে সে। আচ্ছা, ইনগ্রিডকে প্রথম দেখার পর কেমন অনুভূতি হয়েছিল সাইমনের? ওর প্রথম চিন্তাই ছিল, মেয়েটা অসম্ভব সুন্দর। মনে হচ্ছিল, মেয়েটা যেন সবদিক থেকেই ওর নাগালের বাইরে–ওর চেয়ে অনেক বেশি সহজ-স্বাভাবিক, আত্মবিশ্বাসী। পরে জেনেছিল, ওসবই আসলে ভান ছিল। ইনগ্রিডও ওর মতোই প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় ভুগছিল–নিজেকে ওর যোগ্য ভাবতে পারছিল না। দুনিয়ার সব মানুষই জীবনের কোনো-না-কোনো সময় এই অনিরাপত্তায় ভোগে।

যাহোক, ওদের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ওয়েস্ট সিক্সটি-নাইন্থ স্ট্রিট আর কলম্বাস অ্যাভিনিউয়ের একটা রেস্তোরাঁর জানালার পাশের এক আলো ঝলমলে টেবিলে। সেই সম্পর্ক বোধহয় আজ ব্রঙ্কসের এই পূতিগন্ধময়, অন্ধকার বেজমেন্টে শেষ হবে।

'ইনগ্রিড?' করুণ আকুতির ঝরল সাইমনের কণ্ঠে। 'জেগে থাকো। আমার হাত ধরে রাখো, ঠিক আছে?'

পুলিশ এল, সঙ্গে ইএমটি[২]। এসেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নিল তারা। সাইমনকে সরিয়ে নিল স্ত্রীর কাছ থেকে। কংক্রিটের মেঝেতে বসে রইল সে, দুই হাঁটু ভাঁজ করে ঠেকিয়ে রেখেছে বুকে। একজন পুলিশ জেরা করতে আরম্ভ করল ওকে–কিন্তু তার কোনো কথাই কানে ঢুকছে না সাইমনের। ওর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ইনগ্রিডের চিকিৎসায় ব্যস্ত মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানদের ওপর। যে মুখে সে অজস্রবার উষ্ণ চুমু খেয়েছে, একটা অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দেয়া হয়েছে সেই মুখে। এখন আর কিচ্ছু বলছে না সে–কেবল দেখছে চেয়ে চেয়ে। সে আর জানতে চায় না ইনগ্রিড বেঁচে আছে কি না–ওকে বাঁচানো সম্ভব কি না তা জানারও আর ইচ্ছে নেই ওর। কথা বলে চিকিৎসারত মানুষগুলোকে বিরক্ত করতে প্রচণ্ড ভয় হচ্ছে ওর। ভয় হচ্ছে তাদের মনোযোগ না নষ্ট হয়ে যায়। ইনগ্রিডের জীবন যেন সরু এক সুতোর ওপর ঝুলছে। সেই সুতো ধরে রেখেছে ওই মানুষগুলো। তাদেরকে সামান্য বিরক্ত করলেও হয়তো ছিঁড়ে যাবে সাইমনের প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর জীবনসুতো।

এর পরের স্মৃতিগুলো ঝাপসা হয়ে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু পরের প্রতিটা দৃশ্য যেন সিনেমার মতো অত্যন্ত ধীরগতিতে মঞ্চস্থ হলো, চিরকালের জন্যে মগজে গেঁথে গেল সাইমনের। ইনগ্রিডকে গার্নিতে করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা, তার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসা, ফাঁকা চোখে আইভি ব্যাগের দিকে

---

[২] ইমারজেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান

তাকিয়ে থাকা, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানদের কঠিন চেহারা, ইনগ্রিডের ত্বকের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা, সাইরেনের চিৎকার, ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া ট্রাফিক জ্যাম, অবশেষে হাসপাতাল পৌঁছে ইনগ্রিডকে ইমারজেন্সি রুমের দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাওয়া, একজন নার্সের ওকে বাইরে ঠেলে দেয়া, তারপর ওকে ওয়েটিং রুমের হলুদ রঙের প্লাস্টিকের চেয়ারে বসিয়ে দেয়া...প্রতিটা দৃশ্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মগজে গেঁথে থাকবে সাইমনের। এই দৃশ্যগুলো আজীবন তাড়া করে ফিরবে ওকে।

ওয়েটিং রুমে বসেই ফোন বের করল সে। দুঃসংবাদের প্রথম ধাক্কাটা দিল ইভোনিকে। ওর কথা শেষ হলে ইভোনি বলল, ‘এক্ষুনি তোমার বাড়িতে যাচ্ছি আমি। আনিয়াকে নিয়ে আসছি।’

‘ঠিক আছে,’ নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই অপরিচিত ঠেকল সাইমনের।

‘ওকে কী বলব?’

প্রশ্নটা শুনে যেন কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠল ওর গলায়। জোর করে কণ্ঠ স্বাভাবিক করল সে। ‘তেমন কিছু জানানোর দরকার নেই। তুমি শুধু ওর সঙ্গে থাকো।’

‘স্যামকে ফোন করেছ?’ জানতে চাইল আনিয়া।

‘না। ওর একটা পরীক্ষা আছে। ওকে জানানোর দরকার নেই।’

‘সাইমন?’

‘কী?’

‘তুমি ঠিকমতো ভাবতে পারছ না। বোঝার চেষ্টা করো, বাচ্চাদের মা গুলি খেয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে পাঠানো হয়েছে ওকে।’

চোখ বন্ধ করে ফেলল সাইমন।

‘আনিয়াকে আনতে যাচ্ছি আমি,’ ইভোনি বলল। ‘রবার্ট নিয়ে আসবে স্যামকে। হাসপাতালে থাকা উচিত ওদের।’

‘আমারও থাকা উচিত’ বলল না ইভোনি। বাচ্চাদের থাকাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই হয়তো বলেনি। কিংবা কে জানে, ইনগ্রিডের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই বলেই হয়তো বলেনি ও-কথা। ইভোনি আর আর ইনগ্রিডের সম্পর্কটা অনেকটাই ভদ্রতার আবরণে মোড়া। দুই বোনের মাঝে সাইমন সেতু হিসেবে কাজ করে।

‘রাখছি, সাইমন,’ বলল ইভোনি।

দুজন পুলিশকে ওয়েটিং রুমে ঢুকতে দেখল সাইমন। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকানোর পর ওর ওপর চোখ পড়ল তাদের।

‘আচ্ছা।’ ফোন কেটে দিল সে।

ঘটনাস্থলেই একবার অপরাধীর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে সাইমন। এখন আরো বিস্তারিত জানতে চায় পুলিশ। এবার সব খুলে বলল সে–তবে

অ্যারনের খুনের ব্যাপারটা চেপে গেল। বলার সময় একটু পরপরই মনোযোগ হারিয়ে ফেলছিল সে। সতৃষ্ণ চোখে বার-বার তাকাচ্ছে দরজার দিকে, একজন ডাক্তারের আগমনের আশায়। তার মুখ থেকে ভালো-খারাপ যা-হোক একটা খবর শোনার আশায় বুক ফেটে যাচ্ছে ওর।

সহসা হুড়মুড় করে ওয়েটিং রুমে ঢুকল ফ্যাগবেনলে। দুই পুলিশ এগিয়ে গেল তার দিকে। এক কোনায় গিয়ে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল তিনজনে। এই ফাঁকে রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে স্ত্রীর খবর জিজ্ঞেস করে এল সাইমন। রিসিপশনিস্ট মার্জিত গলায় বলল, নতুন কোনো খবর নেই, নতুন কিছু ঘটলেই ডাক্তার এসে খবর জানিয়ে যাবেন।

কথা শেষ করে ঘাড় ঘোরাতেই সাইমন দেখতে পেল, ফ্যাগবেনলে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। 'একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না আমার। ব্রঙ্কসে এসেছিলেন কেন আপনারা?'

'আমাদের মেয়েকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম।'

'ড্রাগের আড্ডায়?'

'আমাদের মেয়ে ড্রাগ অ্যাডিক্ট।'

'পেয়েছেন ওকে?'

'না। খবরটা শুনে না থাকলে জানিয়ে রাখি–আমার স্ত্রীকে গুলি করা হয়েছে।'

'সত্যিই খুব খারাপ লাগছে শুনে।'

চোখ বুজে ফেলল সাইমন।

'শুনেছি, খুন যেখানে হয়েছিল, সেখানেও গিয়েছিলেন আপনারা,' বলল ফ্যাগবেনলে।

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওখান থেকেই শুরু করেছিলাম আমরা।'

'কী শুরু করেছিলেন?'

'মেয়েকে খোঁজা।'

'ওই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাশের বাড়িতে গেলেন কী করে?'

'তা জেনে কী হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সাইমন।

'আমাকে বলতে চাইছেন না কেন, সাইমন?'

'কারণ, আপনাকে বলে কোনো লাভ নেই।'

'সত্যি বলছি, ব্যাপার ভালো ঠেকছে না আমার,' ফ্যাগবেনলে বলল।

'সত্যি বলছি, আপনার কাছে ব্যাপার কেমন ঠেকছে-না-ঠেকছে তাতে আমার কিচ্ছু আসে-যায় না,' জবাব দিল সাইমন।

ওয়েটিং রুমে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল সে।

‘একটা ব্যাপার কী জানেন? সবচেয়ে সরল ব্যাখ্যাটাই সাধারণত ঠিক হয়।’

‘এখানে সবচেয়ে সরল ব্যাখ্যাটা কোন্‌টা, ডিটেকটিভ?’

‘অ্যারন কর্ভালকে আপনি খুন করেছেন,’ জবাব দিল ফ্যাগবেনলে, নির্লিপ্ত গলায়। বিন্দুমাত্র আবেগ বা বিস্ময়ের ছোঁয়া নেই তাতে। ‘অথবা আপনার স্ত্রী করেছেন। সেজন্যে আপনাদের কাউকে দোষ দেব না। লোকটা একটা দানব ছিল। ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে মারছিল আপনাদের মেয়েকে। আপনাদের চোখের সামনে খুন করছিল ওকে।’

ভ্রু কোঁচকাল সাইমন। ‘এবার কি তাহলে আবেগে গলে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়ে দেব?’

‘নাহ, আমার কথা শুনুন। সেই শতাব্দীপ্রাচীন নৈতিক সঙ্কটের কথা বলছি আমি।’

‘আচ্ছা?’

‘প্রশ্ন হচ্ছে: আপনি কি কাউকে খুন করবেন? উত্তর: না, প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন: নিজের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে কাউকে খুন করবেন আপনি? উত্তর...?’

দুই হাত তুলে কাঁধ ঝাঁকাল ফ্যাগবেনলে।

চুপচাপ জায়গায় বসে রইল সাইমন। একটা চেয়ার টেনে ওর কাছাকাছি বসল ডিটেকটিভ। নিচু গলায় বলল, ‘আনিয়া যখন ঘুমাচ্ছিল, তখন হয়তো চুপিসারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন আপনি। অথবা হাসপাতালে ডিউটির ফাঁকে হয়তো ব্রঙ্কসে ছুটে গিয়েছিলেন ইনগ্রিড।’

‘আপনি নিজেও এই থিয়োরি বিশ্বাস করেন না।’

হয়তো-হ্যাঁ, হয়তো-না...এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফ্যাগবেনলে। ‘শুনেছি আপনার স্ত্রীকে যখন গুলি করা হয়, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আপনি। নিজেকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে বাঁচাতে চাইছিলেন তাকে।’

‘তা আপনার পয়েন্টটা কী?’

‘ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন আপনি,’ ফ্যাগবেনলে বলল। ‘তাদের জন্য আপনি খুনও করতে পারবেন—এ কথাটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?’

অসংখ্য লোকের আনাগোনা তাদের চারপাশে—কিন্তু সেদিকে নজর নেই সাইমন আর ফ্যাগবেনলের।

‘আমার স্ত্রীকে লুথার নামে এক লোক গুলি করেছে।’ আগেও দুবার দেয়া লোকটার বর্ণনা আবার দিল সাইমন। ‘তাকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার না করে আমাকে এসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করছেন কেন?’

‘সেই কাজ ইতিমধ্যে করে ফেলেছি।’

‘কী...লোকটাকে ধরে ফেলেছেন?’

'হ্যাঁ। খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি। রক্তের দাগ ধরে পিছু নিয়েছিলাম শুধু। দুই ব্লক দূরে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছি ওকে।'

'দৈত্যের মতো লোকটা–নাম রোকো–ওকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল বেজমেন্ট থেকে। লুথারকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল সে।'

'রোকো ক্যানার্ড। ওকে চিনি আমরা। গ্যাঙের লোক। রোকোর হয়ে কাজ করত লুথার রিটয। অ্যারনও। লুথারকে খুব সম্ভব লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল রোকো। কিন্তু রক্তের দাগ দেখার পর ওকে গলিতে ফেলে পালায়। আমাদের অন্তত তা-ই ধারণা। লোকটাকে শনাক্ত করার জন্যে আপনার আসা দরকার।'

'ঠিক আছে,' সাইমন বলল। 'কেমন আঘাত পেয়েছে সে?'

'বেঁচে যাবে।'

'মুখ খোলাতে পেরেছেন ওর?'

'হ্যাঁ,' হাসি হাসি মুখে বলল ফ্যাগবেনলে। 'বলেছে, আপনি আর ইনগ্রিড গুলি করেছেন ওকে।'

'মিথ্যে কথা।'

'তা আমরা জানি। কিন্তু ঘটনাটার আগা-মাথা বুঝতে পারছি না আমি। ও গুলি করল কেন?'

'জানি না। রোকোর সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা। এমন সময়...'

'আপনি আর আপনার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে, আপনারা দুজন ওই নেশার আড্ডায় ঢুকে পড়ে একটা গ্যাং লিডারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন?'

'হ্যাঁ। আপনার ভাষায়ই বলি ডিটেকটিভ: ভালোবাসার মানুষকে সাহায্য করার জন্যে হেন কাজ নেই যা করতে পারি না আমরা।'

উত্তরটা বোধহয় পছন্দ হলো ফ্যাগবেনলের। 'আচ্ছা। তারপর বলে যান।'

গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার বাদে আর সবই জানাল সাইমন।

'তারপর লুথার স্রেফ গুলি করতে লাগল আপনাদের দিকে?'

'হ্যাঁ।'

'একবারও সতর্ক করেনি?'

'না।'

'রোকো একজন ড্রাগের কারবারি। লুথার আর অ্যারন দুজনেই কাজ করত ওর হয়ে। ওদের পৃথিবীটা বড় বেশি সহিংস। তারপর একদিন খুন হলো অ্যারন। আপনাদের ওপর গুলি চালাল লুথার। কিন্তু লুথারকে গুলি করল কে?'

জবাব দিতে পারল না সাইমন গ্রিন।

(2,1) -47- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:27

'সাইমন?'

'কী?'

'গুলি খেল আপনার স্ত্রী। তাকে আড়াল করার জন্য ঝাঁপ দিলেন আপনি। আপনাদের দুজনকেই খতম করে দিতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু ওকে থামাল কে?'

'আমি কাউকে দেখিনি,' জবাব দিল সে।

ওর কথার সুরে কিছু একটা টের পেল যেন ফ্যাগবেনলে। 'আপনি কাউকে দেখেছেন কি না জানতে চাইনি আমি। জিজ্ঞেস করেছি, আপনাকে লুথারের হাত থেকে বাঁচাল কে?'

কেউ মুখ খোলার আগেই ঝড়ের বেগে রুমে ঢুকল আনিয়া। সাইমন উঠে দাঁড়াতেই ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। সে-ও চোখ বুজে শক্ত করে চেপে ধরল মেয়েকে—প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যাতে চোখে পানি না আসে। বাবার বুকে মুখ গুঁজল আনিয়া।

'মা...' ফোঁপাতে ফোঁপাতে কেবল এই একটা শব্দই বলতে পারল সে।

আরেকটু হলেই সাইমন বলতে যাচ্ছিল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মা ভালো আছে,' কিন্তু মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো মানে দেখতে পেল না। ওর চোখ খুলে গেল। ইভোনি এগিয়ে এসে আলতো চুমু খেল ওর গালে।

'রবার্ট গেছে স্যামকে আনতে,' বলল ইভোনি।

'ধন্যবাদ।'

তখনই হাসপাতালের এক কর্মী এসে ঢুকল ওয়েটিং রুমে। 'সাইমন গ্রিন?'

ধীরে ধীরে বাপের বুক থেকে মুখ তুলল আনিয়া।

'আমি,' জবাব দিল সাইমন।

'আমার সঙ্গে আসুন, প্লিজ। ডাক্তার কথা বলবেন।'

(1,1) -48- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:27

১২

মোটের ওপর প্রায় সবারই ধারণা, চিকিৎসক হবেন ঠান্ডা স্বভাবের আবেগহীন মানুষ—রোবটের মতো কাজ করে যাবেন।

তবে সাইমন জানে, ইনগ্রিডের বিশ্বাস ঠিক এর উল্টো।

সবাই-ই চিকিৎসক হিসেবে একজন সহানুভূতিশীল রক্ত-মাংসের মানুষ চায়। চায় চিকিৎসকও যেন তার আবেগ-উদ্বেগ আর ভয়টা অনুভব করতে পারেন। যেকোনো দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেয় ইনগ্রিড।

মাঝে মাঝে চিকিৎসকের সামনে বসে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে লোকে। আতঙ্কিত মনে অপেক্ষা করতে থাকে তার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তিনি কী বলেন শোনার জন্যে। তার সামান্য কথাই আমূল বদলে দিতে পারে রোগীর জীবন।

ডা. হিদার গ্রু মানুষটা অত্যন্ত আন্তরিক এবং সহানুভূতিশীল, ঠিক যেমনটা ইনগ্রিড পছন্দ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষা আর সাধারণ শব্দ মিলিয়ে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে কথা বলার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে এতকিছুর দিকে নজর নেই সাইমনের। ওর সমস্ত মনোযোগ মূল কথাটার ওপর।

ইনগ্রিড এখনো বেঁচে আছে।

কোনোরকমে।

কোমায় চলে গেছে ও।

আগামী চব্বিশ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মন দিয়ে ডাক্তারের কথা শুনতে চেষ্টা করছে সাইমন, কিন্তু পারছে না। ওর পাশে বসা ইভোনি দক্ষতার সাথে সামলাচ্ছে সব। ডাক্তারের কথা শুনে পাল্টা প্রশ্নও করছে বোনের চিকিৎসার ব্যাপারে।

ইনগ্রিডকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন ডাক্তাররা, কিন্তু এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডা.

গ্রু। হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে। সাইমনও উঠে পড়ল। হাত মেলাল ডাক্তারের সঙ্গে। ইভোনিও। এখনো ইনগ্রিডের সঙ্গে কারো দেখা করার অনুমতি মেলেনি। তাই ওয়েটিং রুমে ফিরে গেল ওরা।

ফ্যাগবেনলে এসে একপাশে টেনে নিয়ে গেল সাইমনকে।

'একটা সাহায্য চাই আপনার কাছ থেকে,' নিচু গলায় বলল সে।

এখনো ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি সাইমন—তার মধ্যেই কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে।'

'একটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

একটা কার্ডবোর্ডের শিট তুলে দিল সে সাইমনের হাতে। ছ'টা ছবি সাঁটা রয়েছে ওতে—ওপরের সারিতে তিনটা, নিচে তিনটা। শুধু মুখের ছবি—প্রতিটার নিচে একটা করে নম্বর দেয়া।

'ভালো করে দেখে বলুন এদের মধ্যে কেউ...'

'পাঁচ নম্বর,' ডিটেকটিভকে থামিয়ে দিয়ে বলল সাইমন।

'আমার কথা শেষ করতে দিন। ছবিগুলো ভালোমতো দেখুন, তারপর বলুন এদের কাউকে চিনতে পারেন কি না।'

'পাঁচ নম্বরকে চিনেছি।'

'কীভাবে?'

'ও-ই গুলি করেছে আমার স্ত্রীকে।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্যাগবেনলে। 'একটু কষ্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে শনাক্ত করতে হবে।'

'এটাতে যে শনাক্ত করেলাম তাতে হবে না?' কার্ডবোর্ডের শিট দেখাল সাইমন ইশারায়।

'আমার সঙ্গে এসে করতে পারলে ভালো হয়।'

'এই মুহূর্তে আমি স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাচ্ছি না।'

'তাকে ছেড়ে যেতে হবে না। সন্দেহভাজনও এখানেই আছে। ওর জখমের চিকিৎসা চলছে। আসুন।'

করিডর ধরে হাঁটা ধরল ফ্যাগবেনলে। ইভোনির ফিরে চাইল সাইমন। মাথা দুলিয়ে ভগ্নিপতিকে যেতে বলল সে। বেশিদূর যেতে হলো না, করিডরের শেষ মাথাই ওদের গন্তব্য।

'রোকোকেও ধরেছেন?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'হ্যাঁ।'

'কী বলেছে সে?'

'আপনি আর আপনার স্ত্রী বেজমেন্টে গিয়েছিলেন। সে যখন অন্যদিকে ঘুরেছিল, তখনই গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। সাথে সাথে দৌড়ে পালায় সে। কে গুলি করেছে, কে গুলি খেয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই ওর।'

(1,1) -49- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:28

'ডাহা মিছেকথা।'

'সত্যি? দাগি ড্রাগ ডিলার রোকো আমাদের সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছে? দারুণ অবাক হয়েছি আমি।'

'আমার মেয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন ওকে?'

'ওকে নাকি চেনে না সে। বলেছে, "সাদা মেয়েগুলোর সবকটার চেহারাই একরকম লাগে আমার কাছে। বিশেষ করে নেশাখোরগুলোর।"'

হাল ছাড়ল না সাইমন। 'ওকে আটকে রাখতে পারবেন?'

'কোন্ অভিযোগে? আপনি নিজেই বলেছেন, রোকো আপনাদের ওপর হামলা করেনি। ঠিক?'

'ঠিক।'

'পিস্তলের ট্রিগার টেনেছিল লুথার।'

একটা রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্যাগবেনলে। ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ বসে রয়েছে দরজার সামনে। 'কী খবর, টনি?'

সাইমনের দিকে ফিরে চাইল গার্ড, টনি। 'ইনি কে?'

'ভিক্টিমের স্বামী?'

'ওহ।' সাইমনের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল টনি। 'স্যরি।'

'ধন্যবাদ।'

'শনাক্ত করতে এসেছেন,' ব্যাখ্যার সুরে বলল ফ্যাগবেনলে। 'লোকটা কি এখনো বেহুঁশ?'

'না, জেগেছে।'

'কখন?'

'এই তো পাঁচ-দশ মিনিট আগে।'

সাইমনের দিকে ফিরল ফ্যাগবেনলে। 'এখন কাজটা করা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'প্রটোকল। বেশিরভাগ সাক্ষীই আসামির সামনাসামনি দাঁড়াতে ভয় পায়।'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল সাইমন। 'সমস্যা নেই, এখনই করে ফেলুন।'

'লোকটা সজাগ আছে। শনাক্ত করার সময় আপনাকে দেখতে পাবে। আপনার সমস্যা নেই তো?'

'আমার স্ত্রীকে গুলি করার সময়ও আমাকে দেখেছে ও। এরপর আর ওর সামনাসামনি দাঁড়াতে ভয় পাব বলে মনে করেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজা খুলে ধরল ফ্যাগবেনলে। টিভি চলছে ভেতরে। স্প্যানিশ কোনো প্রোগ্রাম চলছে তাতে। বিছানায় বসে আছে লুথার, কাঁধে ব্যান্ডেজ। সাইমনকে দেখেই দাঁত খিঁচাল সে। 'ও এখানে কী করছে?'

'ওহ, এই ভদ্রলোককে তাহলে চেনো তুমি?' জানতে চাইল ফ্যাগবেনলে।

ডানে-বাঁয়ে ঘুরল লুথারের দুই চোখ। 'উহ...'

সাইমনের দিকে ফিরল ফ্যাগবেনলে। 'মি. গ্রিন?'

'হ্যাঁ, এই লোকই গুলি করেছে আমার স্ত্রীকে।'

'মিথ্যা কথা!'

'আপনি নিশ্চিত?' জিজ্ঞেস করল ফ্যাগবেনলে।

'হ্যাঁ, নিশ্চিত,' জবাব দিল সাইমন।

'ওরা গুলি করেছে আমাকে!' গর্জে উঠল লুথার।

'তাই নাকি, লুথার?'

'হ্যাঁ। এই লোক একটা মিথ্যুক।'

'ঠিক কোথায় গুলি করেছে বলো তো?'

'কাঁধে।'

'উঁহু, লুথার, আমি ভৌগোলিক অবস্থান জানতে চেয়েছি।'

'অ্যাঁ?'

চোখ পাকাল ফ্যাগবেনলে। 'কোন্ জায়গায় করেছে কাজটা? জায়গা, স্থান।'

'ওহ, বেজমেন্টে। রোকোর ওখানে।'

'তা-ই যদি হয়, তাহলে ওখান থেকে দুই ব্লক দূরে পেলাম কেন তোমাকে?'

'ওহ, আমি পালিয়েছিলাম। ওর কাছ থেকে,' বোকা বোকা চেহারায় জবাব দিল লুথার।

'এমন এক গলিতে লুকালে যেখানে পুলিশ চলে এল তোমার খোঁজে?'

'আমি পুলিশ পছন্দ করি না, তাই।'

'দারুণ। ঘটনাস্থলে থাকার কথা স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ। সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে আমাদের।'

'আমি কাউকে গুলি করিনি। তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।'

'তোমার কাছে কোনো পিস্তল আছে, লুথার?'

'না।'

'কখনো গুলি চালিয়েছ?'

'পিস্তল দিয়ে?' ঢাকঢাক গুড়গুড় ভাব দেখা দিল লুথারের চেহারায়। 'একবার চালিয়েছিলাম বোধহয়–বহু বছর আগে।'

'লুথার, তুমি টিভি দেখ না?' জিজ্ঞেস করল ফ্যাগবেনলে।

'মানে?'

'পুলিশ শো দেখ না?'

বিভ্রান্তির ছাপ পড়ল লুথারের চেহারায়।

'সব শো-তেই একটা-না-একটা অপরাধী থাকে যে নিরীহ চেহারা করে বলে, "আমি কখনো গুলি করিনি।" তোমার মতো আরকি। তারপর পুলিশ

জানায়, তারা গানপাউডার পরীক্ষা করে দেখেছে। এবার কিছু মনে পড়ছে, লুথার? পুলিশ জানায়, আসামির হাতে আর কাপড়েও গানপাউডার পেয়েছে তারা।'

রং সরে গেল লুথারের চেহারা থেকে।

'আমরাও কিন্তু গানপাউডার পরীক্ষা করিয়েছি, লুথার। সাক্ষী আছে, গানপাউডারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলও আছে আমাদের হাতে। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, আসামি একজন ডাহা মিথ্যুক। তার খেলা শেষ। সে এখন দোষ স্বীকার করে অপরাধের ওজন কিছু কমানোর চেষ্টা করে দেখতে পারে।'

চোখ পিটপিট করল লুথার।

'কাজটা কেন করেছ জানাতে চাও আমাদের?' জিজ্ঞেস করল ফ্যাগবেনলে।

'আমি গুলি করিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিটেকটিভ। 'এবার কিন্তু আমাদের বিরক্ত করে ফেলছ তুমি।'

'ওকে জিজ্ঞেস করছ না কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল লুথার।

'মানে?'

চিবুক উঁচিয়ে সাইমনকে দেখাল আসামি। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

লম্বা দম নিল সাইমন। রুমে প্রবেশ করার পর থেকেই প্রাণপণে নিজেকে সামলে রাখছিল সে। কিন্তু এবান ভেঙে পড়ল ধৈর্যের বাঁধ। ওর ভালোবাসার মানুষ, ইনগ্রিড এই বিল্ডিঙেই মৃত্যুর সাথে লড়ছে, এই হারামিটার কারণে। নিজের অজান্তেই বিছানার দিকে এক পা এগিয়ে গেল সাইমন। দুই হাত তুলে ধরল নেশাখোর অমানুষটার গলা চেপে ধরার জন্যে।

হাত বাড়িয়ে ওকে আটকাল ফ্যাগবেনলে। সাইমনের চোখ চোখ রেখে দৃঢ়ভাবে মাথা ঝাঁকাল।

'কী জিজ্ঞেস করব, লুথার?' বলল সে।

'রোকোর আড্ডায় ওরা কী করছিল, অ্যাঁ? ধরে নেয়া যাক, গুলিটা আমিই করেছি। সত্যি সত্যি কিন্তু করিনি, তারপরও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে আমিই করেছি গুলিটা।'

ভুরু না কোঁচকানোর চেষ্টা করল ফ্যাগবেনলে। 'আচ্ছা। তারপর বলো।'

'রোকোর হয়তো নিরাপত্তা দরকার।'

'কেন?'

'জানি না। তর্কের খাতিরে বলছি। কী যেন বলে... হাইপো... হাইপোডার্মিক বোধহয়।'

'তাহলে রোকো তোমাকে বলেছিল ডা. গ্রিনকে গুলি করতে?'

'ডাক্তার?' সিধে হয়ে বসল যুবক। 'কী সব আবোলতাবোল বকছ? আমি কোনো ডাক্তার-ফাক্তারকে গুলি করিনি। যতই চেষ্টা করো, আমাকে ফাঁসাতে পারবে না।' সাইমনের দিকে আঙুল তুলল সে। 'আমি শুধু ওর বুড়ি বউকে গুলি করেছি।'

ব্যাটাকে ঘুষি মারতে মারতে ভর্তা করে ফেলবে, নাকি হো-হো করে হেসে উঠবে, বুঝে উঠতে পারছে না সাইমন। আবার সেই অস্বাভাবিক রাগ গ্রাস করে নিল ওকে। মনে হলো, এই পৃথিবীতে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা এই ক্ষতিকর নরকের কীটটাকে পায়ের তলায় পিষে মারতে ইচ্ছে করছে ওর। এর মতো একটা অমানুষ কমে গেলে দুনিয়ার লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। কিন্তু সহসা যখন বুঝতে পারল একে খুন করেও আদতে কোনো লাভ নেই, তখন প্রচণ্ড ক্লান্তি গ্রাস করে নিল ওকে। কোনো লাভ নেই একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে—ইনগ্রিড তো আর ফিরে আসবে না।

'আমি শুধু আমার বসকে বাঁচাচ্ছিলাম,' লুথার বলল। 'আত্মরক্ষা। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

কেঁপে উঠল সাইমনের ফোন। পর্দার দিকে তাকাল সে। ইভোনির মেসেজ:

ইনগ্রিডের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিলেছে।

***

কেবিনে ঢুকে বিছানায় শায়িত ইনগ্রিডকে দেখে, ওর সারা শরীরে লাগানো নানা ধরনের নল দেখে, হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ে গেল সাইমন। নিজেকে আটকানোরও চেষ্টা করল না সে। হয়তো ডানপাশের হুইলচেয়ারটা ধরে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারত—কিন্তু সেই চেষ্টাও করতে গেল না। মেঝেতে বসে পড়ল সে—নিজেকে সময় দিল এই বৈরি পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্যে, একটু কেঁদে হালকা হওয়ার জন্যে।

যখন উঠে দাঁড়াল, ওর চোখে অশ্রুর চিহ্নও দেখা গেল না। ইনগ্রিডের পাশে বসে, ওর হাত ধরে, নিচু গলায় ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল সাইমন। ওকে সে কতটা ভালোবাসে কিংবা যেকোনো মূল্যে সেরে ওঠার কথা বলল না। জ্ঞান থাকলে এসব কথা শুনতে চাইত না ইনগ্রিড। অতিনাটকীয়তা পছন্দ করে না সাইমনের স্ত্রী। তবে এর চেয়েও বড় ব্যাপার হলো, ও যখন পাল্টা জবাব দিতে পারবে না কিংবা মন্তব্য করতে পারবে না, তখন স্বামীর মুখ থেকে এসব কথা শুনতে চাইবে না। যে প্রেম নিবেদনের কিংবা সান্ত্বনাবাণীর জবাব দিতে পারবে না, তার কোনো মূল্য নেই ওর কাছে।

তাই খুব সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলে চলল সাইমন—ওর কাজ, ইনগ্রিডের কাজ, রান্নাঘর নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা, রাজনীতি, ওদের

প্রিয় সব স্মৃতি। কিছু কিছু গল্প বার-বার শুনতে ভালোবাসে ইনগ্রিড। খুব মনোযোগী শ্রোতা ও—সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে মানুষের কথা শোনে। শোনার সময় স্নিগ্ধ একটা হাসি লেগে থাকে ওর ঠোঁটের কোণে।

কিন্তু আজ ওর ঠোঁটে হাসি নেই।

একসময়—কতক্ষণ, বলতে পারবে না সাইমন—ইভোনি এসে হাত রাখল ওর কাঁধে। 'ওখানে কী হয়েছিল সব বলো আমাকে,' বলল সে। 'সব।'

তা-ই করল সাইমন।

বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনল ইভোনি। ইনগ্রিড আর সে একেবারেই আলাদা দুটো পথ বেছে নিয়েছিল। সেজন্যেই হয়তো ওদের মধ্যে বলার মতো ঘনিষ্ঠতা জন্মেনি। একটু অন্যভাবে জীবন শুরু করেছিল ইনগ্রিড। মডেলিং, ঘোরাঘুরি, ড্রাগ নিয়ে একটু-আধটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেজন্যেই হয়তো পেইজের জন্যে সাইমনের চেয়ে খানিকটা কম সহানুভূতি কাজ করে ওর মধ্যে। অন্যদিকে ইভোনি বরাবরই কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষের ভূমিকা পালন করেছে। সে ছিল কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করা মেয়ে—বাবা-মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। সবসময় সোজা-সাপটা পথে চলেছে।

নানারকম জীবনের স্বাদ নিয়ে অবশেষে ইনগ্রিড আবিষ্কার করেছিল, নিজের বাড়িই মানুষের আসল পৃথিবী। নিজের পৃথিবীর খোঁজে মানুষ যতই ঘোরাঘুরি করুক না কেন, সেই অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরেই এসে ঠেকে। তাই বিস্তর ঘোরাঘুরির পর বাড়ি ফিরে আসে ও। তারপর ব্রিন মার কলেজ থেকে পোস্ট-ব্যাচেলর ডিগ্রি নেয়। এরপর মেডিক্যাল স্কুলে ঢোকে, পাস করে, ইন্টার্নশিপও শেষ করে।

'তোমার এখানে বসে থাকা চলবে না,' সাইমনের কথা শেষ হওয়ার পর বলল ইভোনি।

'কী বলছ?'

'আমি আছি ইনগ্রিডের সঙ্গে। কিন্তু তোমার এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করা চলবে না, সাইমন। পেইজকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।'

'এই মুহূর্তে ইনগ্রিডকে ছেড়ে যেতে পারব না আমি।'

'যেতে হবে। আর কোনো উপায় নেই।'

'আমরা কথা দিয়েছিলাম...' শেষ না করেই থেমে গেল সাইমন। এসব কথা ইভোনি জানে, তাই ওকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। সে আর ইনগ্রিড দুই দেহে এক আত্মা—ওরা দুজনে মিলে একজন। ওদের একজন অসুস্থ হলে অন্যজন সবসময় তার পাশে থাকে। এটাই ওদের নিয়ম।

ব্যাপারটা জানে ইভোনি—বোঝেও। কিন্তু সব জেনে-বুঝেও মাথা নাড়ল সে। 'কোমা থেকে জেগে উঠবে ইনগ্রিড। কিংবা হয়তো জাগবে না। আর যদি জেগে ওঠে, তাহলে সবার আগে পেইজকে দেখতে চাইবে।'

কিছু বলল না সাইমন।

(2,1) -51- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:28

'তুমি এখানে বসে থাকলে মেয়েটাকে খুঁজে পাবে না।'

'ইভোনি...'

'জ্ঞান থাকলে ইনগ্রিডও এ কথাই বলত। তুমিও জানো।'

ইনগ্রিডের হাতটা একদম প্রাণহীন লাগছে–রক্ত চলাচল টের পাওয়া যাচ্ছে না। স্থির চোখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল সাইমন। যেকোনো ধরনের ছোটখাটো ইশারা বা জবাব আশা করছে ওর কাছ থেকে। কিন্তু সাইমনের চোখের সামনে ক্রমেই যেন আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে সে–মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটাকে আর ইনগ্রিড মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে স্রেফ একটা শূন্য দেহ, ওর আত্মা যেন ইতিমধ্যে পালিয়ে গেছে এই বিল্ডিং ছেড়ে। পেইজের কণ্ঠস্বর ইনগ্রিডের জ্ঞান ফেরাতে পারবে–এ কথা বিশ্বাস করার মতো বোকার হদ্দ নয় সাইমন। তবে ওর বিছানার পাশে হাত ধরে বসে থাকলেও যে ওর জ্ঞান ফিরবে না–এ ব্যাপারেও সে নিশ্চিত।

স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিল সাইমন। 'যাওয়ার আগে কয়েকটা কাজ সামলে...'

'বাচ্চাদের আমি সামলাব। আমি ব্যবসা দেখব। ইনগ্রিডের দেখাশোনা আমি করব। তুমি যাও।'

১৩

রাত পেরিয়ে গেছে–খানিক বাদেই ফুটবে ভোরের আলো। সাইমনকে ব্রঙ্কসের কংক্রিটে তৈরি বাড়িগুলোর সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল গাড়িটা। ফাঁকা রাস্তা–এখনো কারো ঘুম ভাঙেনি। কয়েক ঘণ্টা আগে ইনগ্রিডকে নিয়ে সে যে বাড়িতে ঢুকেছিল, দুজন লোক ঘুমাচ্ছে ওটার সামনের সাইডওয়াকে। পুলিশের টেপ দিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কে যেন মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে ওটা। সকালের ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ছে ছেঁড়া টেপটা।

জরাজীর্ণ চারতলা যে বিল্ডিংটাকে ওর মেয়ে বাড়ি বলত, ওটার সামনে পৌঁছে গেল সাইমন। এবার বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ভেতরে ঢুকল সে। দোতলায় উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তিনতলায় ওঠার আগে কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করে যাবে বলে ঠিক করল। সবে ছয়টা বাজি বাজি করছে।

দরজায় টোকা মেরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। কর্নেলিয়াস বোধহয় এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। তবে তাতে সাইমনের কিছু আসে-যায় না। বেশিক্ষণ লাগল না, বড়জোর দশ সেকেন্ড পরই খুলে গেল দরজা। চেহারা দেখে মনে হলো, রাতে ভালো ঘুম হয়নি কর্নেলিয়াসের। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

'ও কেমন আছে?' অবশেষে নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল কর্নেলিয়াস।

'অবস্থা খারাপ।'

'ভেতরে এসো।'

ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল সাইমন। পেইজের অ্যাপার্টমেন্টটা দেখে নোংরা খোঁয়াড়ের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয় না। অথচ কর্নেলিয়াসের অ্যাপার্টমেন্টের চেহারা একেবারে উল্টো। জরাজীর্ণ, মৃতপ্রায় বিল্ডিঙটার সাথেও একদমই বেমানান ওর ঘর। টিভিতে যেসব সাজানো-গোছানো ঘর

(2,1) -52- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:29

দেখায়, ঠিক ওরকম ছিমছাম সুন্দর বাসা কর্নেলিয়াসের। দেয়ালে, জানালার পাশে একটা ওক কাঠের বুকশেল্ফ দেখা যাচ্ছে। ডান দিকে একসেট ভিক্টোরিয়ান সোফা। বালিশগুলো কারুকাজ করা। কারুকাজ করা একটা কাঠের টেবিলের ওপর একটা দাবার সেট রাখা। মানসচোখে ওখানে বসে পেইজকে কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দাবা খেলতে দেখল সাইমন। সূক্ষ্ম একটা চাল দেয়ার সময় মনের অজান্তে নিজের চুল নিয়ে খেলছে ও।

একটা ককার স্প্যানিয়েল দেখতে পেল এক কোণে। এত জোরে ল্যাজ নাড়ছে যে, ভারসাম্য রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে জানোয়ারটা। কুকুরটাকে কোলে তুলে নিল কর্নেলিয়াস। 'ওর নাম ক্লো।'

শেল্ফের বইগুলোর সামনে অনেকগুলো ছবি রাখা। পারিবারিক ছবি। ভালোমতো দেখার জন্যে আরেকটু এগিয়ে গেল সাইমন। প্রথম ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। রংধনুর সামনে তোলা একটা আদর্শ পারিবারিক ছবি–যুবক কর্নেলিয়াস; এক মহিলা, খুব সম্ভব ওর স্ত্রী; আর তিনজন হাস্যোজ্জ্বল ছেলে, দুজন কর্নেলিয়াসের চেয়ে লম্বা।

কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে ওর সঙ্গে যোগ দিল কর্নেলিয়াস।

'আট-দশ বছর আগের ছবি। আমি আর তানিয়া। ছেলে তিনটেকে এই অ্যাপার্টমেন্টে বড় করেছি আমরা। ওরা এখন বড় হয়ে গেছে। তানিয়া...দু-বছর আগে মারা গেছে। ব্রেস্ট ক্যান্সারে।'

'দুঃখিত,' আন্তরিক সুরে বলল সাইমন।

'একটু বসবে? ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'বসলে বোধহয় আর উঠতে পারব না।'

'উঠতে না পারলেও ক্ষতি নেই। একটু বিশ্রাম দরকার তোমার।'

'পরে।'

খুব সাবধানে, আলতো করে ছবিটা নামিয়ে রাখল কর্নেলিয়াস, যেন একটু জোরে নাড়া লাগলেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। ইউনিফর্ম পরা এক মেরিন অফিসারের ছবি দেখাল সে।

'এলডন। আমাদের বড় ছেলে।'

'তোমার মতো দেখতে।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী করতে, কর্নেলিয়াস?'

'মেরিন কর্পোরাল ছিলাম। প্রথম পার্সিয়ান গালফ যুদ্ধে। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম।' সাইমনের দিকে ফিরল কর্নেলিয়াস। 'অবাক হওনি মনে হচ্ছে।'

'নাহ।'

চিবুক ঘষল কর্নেলিয়াস। 'আমাকে দেখেছিলে?'

'এক ঝলক।'

'কিন্তু চেনার জন্যে যথেষ্ট?'

'না দেখলেও আন্দাজ করতে পারতাম,' বলল সাইমন। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।'

'তার দরকার নেই। লুথারকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছিলাম আমি। তাই ওর পিছু নিয়েছিলাম। ও ইনগ্রিডকে গুলি করার আগেই গুলি করা উচিত ছিল আমার।'

'আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি।'

পরিবারের ছবিগুলোর দিকে ফিরে চাইল কর্নেলিয়াস। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এখানে আবার ফিরে এসেছ কেন?'

'কেন এসেছি, তা তুমি জানো।'

'পেইজকে খুঁজতে।'

'হ্যাঁ।'

'ও-ও ওখানে গিয়েছিল। ওই বেজমেন্টে। তোমাদের মতোই।' ঘরের কোনায় চলে গেল কর্নেলিয়াস। 'এরপর আর ওর চেহারা দেখিনি আমি।'

'এরপরই খুন হয় অ্যারন।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কি মনে হয়, পেইজকে খুন করে ফেলেছে ওরা?'

'জানি না।' হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে কর্নেলিয়াস। একটা ক্যাবিনেট খুলল। ভেতরে সেফ দেখা গেল একটা। 'তবে যেকোনো দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত তোমার।'

'প্রস্তুত আছি,' জবাব দিল সাইমন।

সেফের দরজায় বুড়ো আঙুল চাপল কর্নেলিয়াস। বিপ-বিপ শব্দ হলো, পরক্ষণেই খুলে গেল দরজা। 'আরেকটা ব্যাপার। এবার ব্যাকআপ না নিয়ে ওখানে যাওয়া উচিত হবে না।'

সেফের ভেতর থেকে দুটো হ্যান্ডগান বের করে আনল সে। উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনেট বন্ধ করে দিল। একটা অস্ত্র সাইমনকে দিল, আরেকটা রাখল নিজের কাছে।

'তোমার এসবের মধ্যে জড়ানোর দরকার নেই,' বলল সাইমন।

'তুমি স্রেফ ধন্যবাদ দিতে আসোনি, তাই না?'

'না।'

'তাহলে চলো রোকোকে খুঁজে বের করি।'

***

জজ লেস্টার প্যাটারসন হাউজেস শহরের সবচেয়ে প্রাচীন এবং বৃহত্তম নিম্ন আয়ের হাউজিং কমপ্লেক্সগুলোর একটা। পনেরোটা বিষণ্ন চেহারার উঁচু উঁচু

বিল্ডিং আছে কমপ্লেক্সটাতে। সতেরো একরেরও বেশি জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। আঠারোশোর বেশি পরিবার থাকে এখানে।

কর্নেলিয়াস পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ৬ নম্বর বিল্ডিঙের এলিভেটরগুলো অকেজো। তাই ওপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ি বাইছে ওরা। সবে ভোরের আলো ফুটলেও জায়গাটা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। সিঁড়িতে ছোট ছোট হাস্যরত ছেলেমেয়েদের ভিড়। স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওরা। বড়রা কাজে যাবার জন্যে বাসস্টপ আর সাবওয়ে স্টপের দিকে রওনা দিয়েছে। বেশিরভাগ বাসিন্দাই বাইরে বেরোচ্ছে–সেজন্যে স্রোতের মতো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে তারা। সেই স্রোত ঠেলে উল্টোদিকে যেতে হচ্ছে কর্নেলিয়াস আর সাইমনকে। ওদের গন্তব্য নয়তলা।

রোকোর মা আর ভাইবোনেরা থাকে ৮সি নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে। দুটো বাচ্চা লাফিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্টটার খোলা দরজা দিয়ে। দরজায় টোকা দিল সাইমন। একটা নারীকণ্ঠ ভেতরে যেতে বলল ওকে।

ভেতরে ঢুকল সাইমন। কর্নেলিয়াস দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে। আগন্তুককে দেখে সোফা থেকে উঠে বসল রোকো। দিনের আলোয় লোকটার দৈত্যের মতো দেহ দেখে আরেকবার অবাক হলো সাইমন। একজন মহিলা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

‘এই লোক কে?’ জানতে চাইল সে।

খর দৃষ্টিতে সাইমনের দিকে চেয়ে রইল রোকো। ‘কেউ না, মা। চিন্তা কোরো না।’

‘আমাকে চিন্তা করতে মানা কোরো না। এটা আমার বাড়ি।’

‘জানি, মা। ও এখনই চলে যাবে।’ সাইমনের সামনে এসে দাঁড়াল রোকো। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, ‘তাই না?’

ঘাড় বাঁকিয়ে লোকটার পেছনে তাকাল সাইমন। তার মাকে লক্ষ করে বলল, ‘আমি আমার মেয়েকে খুঁজছি। আমার ধারণা, আপনার ছেলে জানে ও কোথায় আছে।’

‘রোকো?’

‘ওর কথায় কান দিয়ো না, মা।’

কিন্তু ছেলের কথা গ্রাহ্য করল না মহিলা। ছেলের দিকে এগিয়ে আসতেই দৈত্যের মতো লোকটা যেন কুঁকড়ে গেল। ‘এই লোকের মেয়ে কোথায় আছে, জানো তুমি?’

‘না, মা।’ দশ বছর বয়সি বাচ্চার মতো শোনাচ্ছে রোকোর গলা। ‘সত্যি বলছি।’

এবার সাইমনের দিকে ফিরল মহিলা। ‘ও জানে, এরকম ধারণা কেন হলো তোমার, মিস্টার?’

'ওর সঙ্গে আমাকে এক সেকেন্ড কথা বলতে দাও, মা।' সাইমনকে ঠেলে দরজার দিকে নিয়ে চলল রোকো।

বিশাল শরীরের ধাক্কায় ওকে করিডরে নিয়ে এল নেশার কারবারি। তারপর দরজা বন্ধ করে বলল, 'আমার মায়ের কাছে এসে ভালো করোনি।' পরমুহূর্তেই কর্নেলিয়াসের ওপর চোখ পড়ল তার। 'তুমি এখানে কী করছ, অ্যাঁ?'

'কিছু না, ওকে সাহায্য করছি।'

শাসানির ভঙ্গিতে ওর দিকে আঙুল তুলল রোকো। 'এবার বুঝতে পারছি। তুমিই আমার ওখানে পাঠিয়েছিলে ওকে। এখান থেকে বিদায় হও তোমরা–এক্ষুনি।'

জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না সাইমন। 'রোকো?'

মাথা নিচু করে ওর দিকে চাইল দৈত্য। 'কী?'

'আমার স্ত্রী কোমায়। মৃত্যুর সাথে লড়ছে। তোমার বেজমেন্টে তোমার লোক গুলি করেছে ওকে। আমার মেয়ে নিখোঁজ। ওকে সর্বশেষ দেখা গেছে তোমার বেজমেন্টে।' রোকো নামের দৈত্যটার অগ্নিদৃষ্টি দেখেও পিছপা হলো না সাইমন। 'তুমি যা যা জানো, সব আমাকে না বলা পর্যন্ত এক পা-ও নড়ছি না এখান থেকে।'

'তোমার ধারণা তোমাকে আমি ভয় পাই?'

'পাওয়া উচিত,' পাশ থেকে বলল কর্নেলিয়াস।

'কেন?'

'ভালো করে ওকে দেখ, রোকো। ও এখন বেপরোয়া মানুষ। আর বেপরোয়া মানুষের সাথে টক্কর লাগতে যাওয়ার বিপদ বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার আছে।'

এই প্রথম গুরুত্বের সাথে প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল রোকো। একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে সাইমন। বলল, 'পুলিশকে জানাব, তুমিই লুথারকে হুকুম করেছিলে আমাদের ওপর গুলি চালানোর জন্যে।'

'কী? তুমি জানো, কথাটা মিথ্যা।'

'লুথারকে ডেকেছিলে তুমি।'

'ওকে থামানোর জন্যে। ও গুলি করুক, তা চাইনি আমি!'

'ওসব আমি জানি না। আমার বিশ্বাস, ওকে হুকুম করেছিলে তুমি। আমার বিশ্বাস, আমাদের ওপর গুলি চালাতে বলেছিলে ওকে।'

'আচ্ছা, ব্যাপার তাহলে এ-ই?' হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল রোকো। সাইমন আর কর্নেলিয়াসের দিকে তাকাল পালা করে।

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেলিয়াস।

'আমি শুধু আমার মেয়েকে ফেরত চাই,' সাইমন বলল।

(2,1) -54- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:29

একটু-ভাবতে-দাও ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রোকো। 'ঠিক আছে। বেশ। কিন্তু এরপর আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সাইমন।

'হ্যাঁ, আমার কাছে এসেছিল ও। পেইজের কথা বলছি। ও এসেছিল বেজমেন্টে। তখনই দেখতে পেয়েছিলাম, কেউ ওকে মেরেছে।'

'কে মেরেছে, বলেছিল?'

'ওকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি। কে মেরেছিল আমি জানতাম।'

'অ্যারন।'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না রোকো।

'তাহলে লুথার আমাদেরকে গুলি করল কেন?'

'কারণ ও একটা উন্মাদ।'

মাথা নাড়ল সাইমন। 'উঁহু। বিশ্বাস করতে পারলাম না। আরো কোনো ব্যাপার আছে।'

'কাজটা আমি করতে বলিনি ওকে।'

'কে বলেছে?'

'দেখ, আমি যে ব্যবসা চালাই, ওটা মোটেই সহজ না। সবসময়ই কেউ-না-কেউ আমাদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, অ্যারন একটা জাত হারামি ছিল। কিন্তু তারপরও আমাদের লোক ছিল ও। জানতে পেরেছিলাম, আমাদের এক প্রতিপক্ষ লেগেছিল ওর পেছনে। ফিডেলসরা বোধহয়।'

'ফিডেলস?'

কর্নেলিয়াস বলল, 'কিউবান গ্যাং।'

এই দুঃসময়েও নামটা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল সাইমন। করিডরে প্রতিধ্বনি তুলল সেই হাসির আওয়াজ। লোকজন যেতে যেতে আড়চোখে দেখতে লাগল ওকে।

'ঠাট্টা করছ।'

'উঁহু।'

'সত্যিই ফিডেলস নামের কিউবান গ্যাং আছে?'

ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল কর্নেলিয়াসের ঠোঁটের কোণে। 'ওদের নেতার নাম ক্যাস্ট্রো।'

'বানিয়ে বলছ।'

'যিশুর কিরে।'

রোকোর দিকে ফিরল সাইমন। 'মার খাওয়ার পর পেইজ তোমার কাছে এসেছিল কেন?'

'নেশার জিনিসের জন্যে,' বলল সাইমন। 'দিয়েছিলে?'

'ওর কাছে টাকা ছিল না।'

'তার মানে, দাওনি?'

'আমি কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে বসিনি,' জবাব দিল রোকো।

'আচ্ছা। তারপর কী হলো?'

'ও চলে গেল। এরপর শুধু একটা জিনিসই জানি আমি–অ্যারনের মৃত্যুর খবর।'

'তোমার কি মনে হয় পেইজের পক্ষে ওকে খুন করা সম্ভব?'

'ফিডেলসরা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল সে। 'তবে হ্যাঁ, পেইজের পক্ষেও খুন করা সম্ভব। কিংবা কে জানে, হয়তো তুমিই করেছ। লুথারও হয়তো তা-ই ভাবছিল। পেইজ যখন এসেছিল, ও-ও ছিল বেজমেন্ট। একটু ভেবে দেখ। ধরো, আমি একজন বাবা। অ্যারন যেভাবে তোমার মেয়েকে মেরেছে, আমার মেয়েকে কেউ ওভাবে মারলে আমি প্রতিশোধ নিতাম। তুমিও হয়তো ওই খেলাই খেলেছ।'

'কোন্ খেলা?'

'হয়তো তুমিই খুন করেছ অ্যারনকে। তারপর এখন মেয়েকে খুঁজছ বাঁচানোর জন্য।'

'উঁহু, ওটা আমার খেলা না,' বলল সাইমন।

তবে এভাবে কাজ করতে পারলেই খুশি হতো সে। রোকো ঠিকই বলেছে। কেউ ওর মেয়েকে আঘাত করলে ওর দায়িত্ব সেটা থামানো। সে তা করেনি। পেইজকে চলে যেতে দিয়েছে।

এখন মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত সে।

ওকে রক্ষা করতে হবে। বাঁচাতে হবে।

'ও হয়তো আশপাশেই কোথাও আছে,' রোকো বলল। 'ওকে তুমি খুঁজতে পারো। সেজন্যে তোমাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু মনে রেখো, ও একটা নেশাখোর। ওকে খুঁজে পেলেও গল্পের শেষটা তোমার মনমতো হবে না।'

***

কর্নেলিয়াসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল ওরা। দরজা বন্ধ করার পর কোটের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিল সাইমন। 'নাও।'

'তোমার কাছেই রাখো ওটা।'

'শিয়োর?'

'শিয়োর,' জবাব দিল কর্নেলিয়াস।

'তোমার কি মনে হয়, রোকো ওকে খুঁজে পাবে?'

'পুরস্কারের লোভে?'

আসার সময় রোকোকে সোজা-সাপটা একটা প্রস্তাব দিয়ে এসেছে সাইমন: পেইজকে খুঁজে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার বুঝে নাও।

‘হ্যাঁ,’ আগের কথার খেই ধরল কর্নেলিয়াস। ‘পেইজ আশেপাশে থেকে থাকলে ওকে খুঁজে বের করবে রোকো।’

ওর কথা শেষ হতে-না-হতেই টোকা পড়ল দরজায়।

‘পিস্তলটা পকেটে ঢোকাও,’ ফিসফিসিয়ে বলল সে। তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক ছাড়ল: ‘কে?’

পূর্ব ইউরোপিয়ান টানে–পোলিশ কিংবা রাশান হতে পারে–একটা বয়স্ক নারীকণ্ঠ জবাব দিল, ‘আমি লিজি, মি. কর্নেলিয়াস।’

দরজা খুলল কর্নেলিয়াস। ছোটখাটো এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। পরনে অদ্ভুত ডিজাইনের সাদা গাউন–লম্বা, ঢেউতোলা–অনেকটা ঘুমাতে যাবার সময় যেসব গাউন পরা হয়, ওরকম। বৃদ্ধার উস্কখুস্ক ধূসর খোলা চুল নেমে গেছে প্রায় কোমর অব্দি। বাতাস না থাকলেও ঝিরিঝিরি বাতাসে উড়ছে যেন চুলগুলো।

‘কোনো কাজ করে দিতে হবে, মিস সোবেক?’ জিজ্ঞেস করল কর্নেলিয়াস।

বড় বড় দুই চোখ মেলে চারপাশে নজর বোলাল বৃদ্ধা। সাইমনের ওপর চোখ পড়তে বলল, ‘তুমি কে?’

‘আমার নাম সাইমন গ্রিন, ম্যাম।’

‘পেইজের বাবা,’ পাশ থেকে বলল কর্নেলিয়াস।

বৃদ্ধা এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাইমনের দিকে তাকাল, সে দৃষ্টির তীব্রতায় এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সাইমন। ‘ওকে তুমি এখনো বাঁচাতে পারো।’

বৃদ্ধার কথায় রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল ওর। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি জানেন পেইজ কোথায় আছে?’

মাথা নাড়ল মিস সোবেক। লম্বা ধূসর চুলগুলো লাফাতে লাফাতে মুখের ওপর এসে পড়ল। ‘তবে ও যে কী তা জানি আমি।’

গলা খাঁকারি দিল কর্নেলিয়াস। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে বলল, ‘কিছু লাগবে আপনার, মিস সোবেক?’

‘ওপরতলায় কেউ এসেছে।’

‘ওপরতলায়?’

‘তিনতলায়। এক মহিলা। পেইজের অ্যাপার্টমেন্টে উঁকিঝুঁকি মারছিল। ভাবলাম, তোমাকে জানানো উচিত।’

‘মহিলাকে চিনতে পেরেছেন?’

‘না। আগে কখনো দেখিনি।’

‘ধন্যবাদ, মিস সোবেক। এখুনি গিয়ে দেখছি।’

করিডরে বেরিয়ে এল কর্নেলিয়াস আর সাইমন। তাড়াহুড়ো করে চলে গেল মিস সোবেক।

(1,1) -56- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:30

'তোমাকে খবর দিতে এল কেন মহিলা?' করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল সাইমন।

'আমি শুধু ভাড়াটে না।'

'বাড়িটার সুপার?'

'মালিক।'

সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায় উঠে এল দুজনে। অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে লাগানো টেপ ছেঁড়া। দরজার নবে হাত দিল কর্নেলিয়াস। সাইমন টের পেল, আপনাআপনি পকেটে চলে গেছে ওর হাত। বন্দুকের স্পর্শ নিচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকলে বোধহয় মনের বল বেড়ে যায়।

ঝট করে দরজা খুলে ফেলল কর্নেলিয়াস। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে ভেতরে। সাইমনদের আকস্মিক আগমনে চমকে গেলেও, সে ছাপ দেখা যাচ্ছে না চেহারায়। মহিলা বেঁটেখাটো, একটু পৃথুলা স্বাস্থ্যের অধিকারী–ল্যাটিনা বোধহয়। পরনে নীল ব্লেজার আর জিন্স।

সে-ই কথা বলল প্রথমে। 'আপনি সাইমন গ্রিন?'

'আপনি কে?'

'আমার নাম ইলেনা রেমিরেজ। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার মেয়ের সাথে কথা বলা দরকার আমার।'

***

সুদৃশ্য একটা বিজনেস কার্ড দেখাল ওদের ইলেনা রেমিরেজ। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের লাইসেন্স বা ওরকম কিছু। আরেকটা আইডি কার্ড দেখাল–এফবিআইয়ের অবসরপ্রাপ্ত এজেন্টের। ওরা সবাই আবার কর্নেলিয়াসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে। দুই পুরুষ চামড়ায় মোড়ানো আর্মচেয়ারে বসেছে, ইলেনা রেমিরেজ বসেছে সবুজ সোফায়।

'আপনার মেয়ে কোথায়, মি. গ্রিন?' জানতে চাইল ইলেনা।

'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আমি। কার্ডে লেখা, আপনি শিকাগোর মানুষ।'

'ঠিকই লেখা।'

'তাহলে আমার মেয়ের সাথে আপনার কী কথা থাকতে পারে?'

'একটা কেস নিয়ে কাজ করছি–ওটার ব্যাপারে কথা বলা দরকার,' জবাব দিল রেমিরেজ।

'কী কেস?'

'সেটা বলতে পারব না।'

'মিস রেমিরেজ?'

(2,1) -56- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:30

'ইলেনা বলে ডাকবেন।'

'ইলেনা, এসব খেলা দেখতে দেখতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। আপনি কী কেস নিয়ে কাজ করছেন তাতে আমার কিচ্ছু আসে-যায় না। তাই যা বলার সরাসরিই বলব। আশা করি আপনিও সব খোলাখুলিই বলবেন। আমার মেয়ে কোথায় আছে আমি জানি না। সেজন্যেই এখানে এসেছি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি ওকে। এই এলাকার এক বর্গমাইলের মধ্যে যেকোনো জায়গায় ও পাঁড় মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে পারে–স্রেফ এই সূত্রটাই আছে আমার কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

'পরিষ্কার,' জবাব দিল ইলেনা।

'এর মাঝেই আপনি–শিকাগোর এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ–এসে বলছেন, আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমিও খুব খুশি হব ওর সাথে আপনাকে আলাপ করিয়ে দিতে পারলে। বিশ্বাস করুন, ভীষণ খুশি হব। সুতরাং, আমরা হয়তো পরস্পরকে সাহায্য করে লাভবান হতে পারি। কি বলেন?'

সাইমনের ফোন বেজে উঠল। এতক্ষণ সেকেন্ডে সেকেন্ডে ফোনের পর্দার দিকে তাকাচ্ছিল সে–কোনো খবরের আশায়। থেকে থেকে আশা করছিল, এই বুঝি বেজে উঠল ফোনটা। অবশেষে সত্যিই সত্যিই বাজল ওটা।

ইভোনির মেসেজ:

অবস্থা স্থিতিশীল হচ্ছে, ডাক্তার ভালো বলেছেন। প্রাইভেট রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এখনো কোমায়। স্যাম আর আনিয়া আমার সঙ্গে।

'ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হয়ে নেয়া যাক,' ইলেনা রেমিরেজ বলল। 'আপনার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক?'

ফোনের পর্দা থেকে চোখ না সরিয়ে জবাব দিল সাইমন। 'হ্যাঁ।'

'কবে থেকে?'

'ওর বয়ফ্রেন্ড যেদিন খুন হলো, সেদিন থেকে,' লুকোছাপায় না গিয়ে সোজা-সাপটা উত্তর দিল সাইমন।

দুই হাত ভাঁজ করে, সময় নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবল ইলেনা রেমিরেজ।

সাইমন ডাকল, 'ইলেনা?'

'আমিও এক নিখোঁজ লোককে খুঁজছি।'

'কাকে?'

'চব্বিশ বছর বয়সি এক ছেলেকে। শিকাগো থেকে উধাও হয়েছে।'

ওরা ফের ঘরে ঢোকার পর প্রথমবারের মতো মুখ খুলল কর্নেলিয়াস। 'কবে থেকে নিখোঁজ?'

'গত বৃহস্পতিবার থেকে।'

'ছেলেটা কে?' জানতে চাইল সাইমন।

'নাম বলতে পারব না।'

'বলে ফেলুন, ইলেনা। আপনার এই নিখোঁজ লোকটা যদি আমার মেয়ের পরিচিত হয়, আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

মুহূর্তকাল ভাবল ইলেনা রেমিরেজ। তারপর বলল, 'ওর নাম হেনরি থর্প।'

ফোন তুলে টাইপ করতে শুরু করল সাইমন।

'কী করছেন?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'নামটা অপরিচিত। আমার ছেলে আর ছোট মেয়ের পরিচিত কি না দেখছি। পেইজের বন্ধু-বান্ধবদের আমার চেয়ে বেশি চিনত ওরা।'

'পেইজ আর হেনরি বন্ধু ছিল বলে মনে হয় না আমার।'

'তাহলে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইলেনা। 'সেটা জানার জন্যেই এখানে এসেছি। উধাও হওয়ার অল্প কদিন আগে খুব সম্ভব আপনার মেয়ে কিংবা ওর বয়ফ্রেন্ড, অ্যারন কর্ভালের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হেনরি থর্পের।'

'কীরকম যোগাযোগ?'

ছোট একটা নোটপ্যাড বের করল ইলেনা। জিভে আঙুল বুলিয়ে ওটার পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'প্রথমে একটা ফোন কল করা হয়েছিল। আপনার মেয়ে করেছিল হেনরিকে। দুই সপ্তা আগে। তারপর কিছু টেক্সট মেসেজ চালাচালি হয়—এরপর ইমেইল।'

'মেসেজ আর ইমেইলগুলোতে কী লেখা ছিল?'

'জানি না। টেক্সটগুলো সম্ভবত ওদের ফোনে। আমরা পড়তে পারিনি। ইমেইলগুলো ডিলিট করে ফেলা হয়েছে। আমরা শুধু জানতে পেরেছি যে কিছু মেসেজ আর ইমেইল পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারিনি।'

'এই যোগাযোগগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে কেন আপনার?'

'গুরুত্বপূর্ণ কি না বলতে পারব না, মি. গ্রিন। তবে আমার কাজের পদ্ধতিই এরকম। কেউ যখন নিখোঁজ হয়ে যায়, আমি তখন অসঙ্গতি খুঁজি। এমন কিছু খুঁজি যা নিখোঁজ মানুষটার রোজকার রুটিনের সাথে মেলে না।'

'এই ইমেইল আর মেসেজগুলো...'

'অসঙ্গতি। শিকাগোর এক চব্বিশ বছর বয়সি ছেলে—হেনরি থর্প—কেন আপনার মেয়ে বা অ্যারন কর্ভালের সাথে হুট করে যোগাযোগ শুরু করবে ভাবতে পারেন?'

(2,1) -57- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:30

কারণটা আন্দাজ করার জন্যে খুব বেশি মগজ খাটাতে হলো না সাইমনকে। 'হেনরি থর্পের কি নেশা করার ইতিহাস আছে?'

'টুকটাক।'

'তাহলে ওটাই হয়তো কারণ।'

'হয়তো,' ইলেনা বলল। 'কিন্তু ড্রাগ তো শিকাগোতেই কিনতে পাওয়া যায়।'

'অ্যারন আর আমার মেয়ে হয়তো বেশি পেশাদার।'

'হতে পারে। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আপনার মনে হয়?'

'না,' জবাব দিল সাইমন। 'অথচ আমার মেয়ে আর আপনার ক্লায়েন্ট দুজনেই নিখোঁজ।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?' বলল সাইমন।

'নিজেকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছি, যোগাযোগটা মোবাইলের মেসেজ থেকে কম্পিউটারের ইমেইলে চলে গেল কেন?'

'তারপর?'

'তারপর ওরা কেমন নেশাখোর ছিল? আপনার মেয়ে আর ওর প্রেমিক।'

মিথ্যে বলার কারণ দেখতে পেল না সাইমন। 'পাঁড় নেশাখোর।'

এবার নাক গলাল কর্নেলিয়াস। 'পেইজ বোধহয় ওর ফোন বেচে দিয়েছিল। ড্রাগ কেনার জন্য।' সাইমনের দিকে ঘুরল সে। 'এরকম ঘটনা এখানে হরহামেশা ঘটে।'

'ফোনটা এখন বন্ধ,' ওকে সমর্থন করল ইলেনা। 'আমারও ধারণা, ওরকম কিছুই হয়েছে।'

সাইমন অত নিশ্চিত হতে পারল না। 'তাহলে পেইজ ফোন বাদ দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কম্পিউটারটা এখন কোথায়?'

'ওটাও বোধহয় বেচে দিয়েছে,' জবাব দিল কর্নেলিয়াস।

'আমারও তা-ই ধারণা,' ইলেনা বলল। 'উধাও হবার সময় ওটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। অথবা খুনি চুরি করতে পারে ওটা। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটার পেল কীভাবে পেইজ? হয়তো কিনেছে।'

'সেটা অস্বাভাবিক ব্যাপার,' সাইমন বলল। 'মানে, ও যদি ড্রাগ কেনার জন্য ফোনই বেচে দেয়, তাহলে পয়সা খরচ করে কম্পিউটার কিনতে যাবে কেন?'

'তার মানে, কম্পিউটারটা সম্ভবত চুরি করেছে ও।'

কথাগুলো খুব কষ্টে হজম করছে সাইমন। ওর মেয়ে নেশাখোর, চোর, নেশার তাড়নায় নিজের জিনিস বিক্রি করে দিচ্ছে...

আর কী?

'কম্পিউটারের ব্যাপারস্যাপার আপনি ভালো বোঝেন, মি. গ্রিন?'

'সাইমন ডাকবেন। নাহ, বুঝি না।'

'দক্ষ হলে কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস খুঁজে বের করতে পারবেন,' ইলেনা বলল। 'মাঝে মাঝে কম্পিউটারটা কোন্ শহরে আছে সেটা বের করা যায়। কখনো কখনো মালিকের নামধাম বা কোন্ সড়কে আছে তা-ও বের করা যায়। আমার এক লোক আছে–নাম লু–এসব কাজে খুব দক্ষ।'

'লু কি কম্পিউটারটার মালিকের নামধাম বের করতে পেরেছে?'

'না,' জবাব দিল ইলেনা। 'তবে কম্পিউটারটা আছে ম্যাসাচুসেটসের অ্যামহার্স্টে। আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বললে, অ্যামহার্স্ট কলেজ ক্যাম্পাসে। আপনার ছেলে পড়ে না ওখানে?'

(2,1) -58- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:30

১৪

সাইমন আর ইলেনা যখন হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে ঢুকল, আনিয়া তখন একটা হলুদ চেয়ারে বসে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর মাথা রবার্ট খালুর কাঁধে হেলান দেয়া। ইভোনির স্বামী, রবার্ট বিশালদেহী মানুষ। মাথার প্রায় পুরোটা জুড়েই টাক, সাবেক ফুটবলার। উকিল হিসেবে সে তুখোড়–জুরিরা তার হাসি, গোছানো কথা, ক্রস-এগজামিনেশনের স্টাইল পছন্দ করে। ইভোনির স্বামীর বাইরে আরেকটা পরিচয় আছে তার–সাইমনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আলতো করে আনিয়ার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রবার্ট। উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে স্বাগত জানাল সাইমনকে। চোখ বুজে আন্তরিকতাটুকু গ্রহণ করল সাইমন।

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'না।'

'আমারও তা মনে হচ্ছে না।'

আলিঙ্গনমুক্ত হলো ওরা। ঘুমন্ত আনিয়ার দিকে চোখ চলে গেল দুজনের।

'আঠারো বছরের নিচের কাউকে ইনগ্রিডের রুমে ঢুকতে দেবে না,' ব্যাখ্যা করল রবার্ট।

'স্যাম...?'

'ও আর ইভোনি আছে ভেতরে। রুম নাম্বার সেভেন-ওয়ান-সেভেন।'

প্রশ্নের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে ইলেনা রেমিরেজের দিকে তাকাল রবার্ট। তার কৌতূহল মেটানোর প্রয়োজন বোধ করল না সাইমন–ইলেনা নিজেই নিজের পরিচয় দিতে পারবে। ৭১৭ নম্বর রুমের দিকে রওনা দিল সে। কর্নেলিয়াস বাড়িতে থেকে গেছে। এমনিতেই যথেষ্ট করেছে সে–হাসপাতালে এসে করার মতো কিছু আছে বলে মনে করেনি। তবে বিদায় নেয়ার সময় ফোন নম্বর দিয়ে বলেছে, 'দরকার হলেই ফোন কোরো...'

ইনগ্রিডের রুমের দরজা খুলল সাইমন। অমনি নানা রকম মেশিনের বিপ-বিপ আওয়াজ এসে ধাক্কা মারল কানে।

ওর ছেলে, আঠারো বছর বয়সি স্যাম, বসে আছে মায়ের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে। দরজার খোলার আওয়াজে বাপের দিকে ফিরে চাইল সে, কান্নাকাটির ফলে ফুলে গেছে দুই চোখ। স্যাম আবেগি ছেলে, ইনগ্রিড আদর করে ওকে 'ছিঁচকাঁদুনে' ডাকত। তিন বছর আগে, দাদির মৃত্যুর পর, টানা কয়েক ঘণ্টা কেঁদেছিল ও। সাইমন ভেবে পায় না, একটা ছেলে কীভাবে এটুও ক্লান্ত না হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদতে পারে!

কান্নাকাটির সময় শত চেষ্টা করেও স্যামকে শান্ত করা যায় না। আবেগের মাত্রা যেমনই হোক, ওর কাঁধে-মাথায় হাত রেখে অথবা জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে গেলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। এ সময় ছেলেটাকে একা ছেড়ে দিতে হয়–সে নিজেও তা-ই বলে। ওর কান্না থামাতে গেলে কিংবা শান্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। এমনকি ছেলেবেলায়ও কান্নাকাটির সময় সে করুণ চোখে বলত, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও, কেমন?'

ইভোনি দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। সাইমনকে দেখে শুকনো হাসি দিল সে।

এগিয়ে গিয়ে ছেলের কাঁধে হাত রাখল সাইমন। তারপর নিচু হয়ে চুমু খেল স্ত্রীর গালে। ইনগ্রিডের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ মনে হলো ওর কাছে–পাণ্ডুর চেহারা, মৃত্যু যেন কড়া নাড়ছে দরজায়।

সাইমনের মনে হলো, হিমশীতল একটা হাত যেন ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ধরে মুচড়ে দিয়েছে।

ইভোনির দিকে ফিরল সে। ইশারায় দরজা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে একটু একা থাকতে চায়। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ইভোনি। কোনো কথা না বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। একটা চেয়ার টেনে ছেলের পাশে বসল সাইমন। স্যামের পরনে স্রিরাকা হট চিলি সস-এর লোগোঅলা টি-শার্ট। লোগোঅলা টি-শার্ট পরতে পছন্দ করে সে। জামাটা ইনগ্রিড ওকে হপ্তা দুয়েক আগে কিনে দিয়েছিল।

'ঠিক আছ তুমি?'

সাইমন জানে, প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেছে–তবু করল। কিন্তু এছাড়া আর কী-ই বা জিজ্ঞেস করবে? ছেলের গালে এখনো অশ্রুর রেখা। বাপের প্রশ্ন শোনার পর আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর চেহারা, যেন নতুন কান্নার দমক ঠেকানোর চেষ্টা করছে প্রাণপণে। অ্যামহার্স্টে খুব ভালো আছে স্যাম। কলেজে থাকতে মাঝে মাঝেই বাড়ির জন্যে মনখারাপ করত পেইজের। তখন যদি সাইমন এই সমস্যার দিকে নজর দিত, খুব ভালো হতো। স্যাম অবশ্য ক্যাম্পাস জীবনের সাথে খুব তাড়াতাড়িই মানিয়ে নিয়েছে। নতুন যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাদেরকেই ভালো লেগে যায় ছেলেটার। রুমমেট, কার্লোসকেও

(2,1) -59- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:30

খুব পছন্দ করে সে। কলেজে ভর্তি হয়েই সে নানা ধরনের ক্লাব, খেলাধুলা আর অ্যাকাডেমিক গ্রুপের সঙ্গে ভিড়ে গেছে।

মায়ের দিকে চোখ রেখে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

'তোমার খালা-খালু কী বলেছে?'

'শুধু বলেছে, কেউ গুলি করেছে মাকে। পরে তোমার কাছ থেকে শুনতে বলেছে সব।'

ঠিক কাজটাই করেছে ইভোনি আর রবার্ট, কৃতজ্ঞ চিত্তে ভাবল সাইমন। 'অ্যারন কে তা তো তুমি জানো, না?'

'পেইজ যে লোকটাকে...'

'হ্যাঁ। ওকে খুন করা হয়েছে।'

চোখ পিটপিট করল স্যাম।

'আর পেইজ উধাও হয়ে গেছে।'

'কিছুই বুঝলাম না।'

'ব্রঙ্কসে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকত ওরা। তোমার মা আর আমি ওখানে গিয়েছিলাম ওকে খুঁজে বের করা যায় কি না দেখতে। তখনই গুলি খায় তোমার মা।'

একটানে সব খুলে বলল সে ছেলেকে, কিচ্ছু বাদ দিল না। শুনতে শুনতে মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল স্যামের চেহারা।

একবার জিজ্ঞেস করে বসল, 'তোমার কি মনে হয়, পেইজ করেছে কাজটা? ও-ই খুন করেছে অ্যারনকে?'

'এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?' শীতল কণ্ঠে বলল সাইমন।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম।

'তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, স্যাম।'

আরেকবার মায়ের মুখের ওপর থেকে ঘুরে এল ছেলেটার চোখ।

'ইদানীং পেইজের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

জবাব এল না।

'স্যাম, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যাঁ,' নরম গলায় জবাব দিল সে। 'দেখা হয়েছে।'

'কবে?'

মায়ের ওপর থেকে চোখ সরাল না ছেলেটা।

'স্যাম?'

'হপ্তা দুয়েক আগে।'

কথাটার আগা-মাথা কিছু বুঝতে পারল না সাইমন। দুই হপ্তা আগে সাইমন কলেজে ছিল। কলেজে বছরে একবার ব্রেক দেয়া হয়। কিন্তু ক্যাম্পাস সে এত পছন্দ করে যে, ব্রেকেও বাড়ি আসতে চায়নি। যদি না কথাটা মিথ্যে হয়ে থাকে। যদি না সে সত্যিই স্কুল পছন্দ করে থাকে।

'কোথায়?' জানতে চাইল সাইমন।

'অ্যামহার্স্টে এসেছিল ও।'

জবাবটা শুনে আবার স্তম্ভিত হয়ে গেল সাইমন। 'পেইজ তোমার ক্যাম্পাসে গিয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম। 'পিটার প্যান বাস লাইনস। পোর্ট অথরিটি থেকে চব্বিশ ডলার।'

'ও কি একা এসেছিল?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল স্যাম।

'ও যে আসছে, সে কথা আগে থেকে জানতে?'

'না। আগে জানায়নি। হুট করে চলে এসেছে।'

দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করল সাইমন। কলেজ ক্যাম্পাসে ফ্রিসবি খেলছে একদল স্বাস্থ্যবান ছাত্রছাত্রী, বই পড়ছে কেউ কেউ...এসবের মাঝে বছরখানেক আগে কলেজ ছেড়ে দেয়া একটা মেয়ে ফিরে এসেছে। কেমন দেখাচ্ছিল দৃশ্যটা?

'কেমন দেখাচ্ছিল ওকে?' জানতে চাইল সাইমন।

'ভিডিয়োতে যেমন দেখাচ্ছিল।'

উত্তরটা ওর আশার ক্ষীণ প্রদীপ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল।

'ওখানে যাওয়ার কারণ বলেছিল?'

'বলেছিল অ্যারনের কাছ থেকে পালানো দরকার ওর।'

'কেন পালানো দরকার, বলেছিল?'

মাথা নাড়ল স্যাম।

'আচ্ছা। এরপর কী হলো?'

'জিজ্ঞেস করল আমার সাথে কয়েকদিন থাকতে পারবে কি না।'

'আমাদেরকে জানাওনি তুমি?'

ইনগ্রিডের ওপর চোখ রেখে জবাব দিল স্যাম, 'ও মানা করেছিল।'

বাপ-মাকে অবিশ্বাস করা নিয়ে ছেলেকে অনেকগুলো কথা শোনাতে ইচ্ছে করছে সাইমনের, কিন্তু এখন সেসবের সময় নেই। 'ওকে যে রেখেছিলে, তাতে তোমার রুমমেট কিছু মনে করেনি?'

'কার্লোস? ও ভেবেছিল কাজটা খুব স্মার্ট হচ্ছে। ভেবেছিল গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করতে পারছে।'

'কতদিন ছিল ও?'

'খুব বেশিদিন না,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল স্যাম।

'কতদিন, স্যাম?'

আবার পানি ঝরতে শুরু করেছে ছেলেটার গাল বেয়ে।

'স্যাম?'

'কার্লোসের মাদুর বিছিয়ে মেঝেতে শুয়েছিল পেইজ। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। জেগে উঠে দেখি গায়েব হয়ে গেছে ও। আমাদের জিনিসপত্রও।'

'কী কী নিয়েছে?'

'আমাদের ওয়ালেট। ল্যাপটপ। কার্লোসের একটা হীরার দুল।'

'এসব আমাকে না জানিয়ে থাকতে পারলে কীভাবে?' চেষ্টা করেও কথায় বিরক্তির সুর চাপা দিতে পারল না সাইমন। 'স্যাম?'

জবাব পেল না।

'কার্লোস ওর বাবা-মাকে জানিয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'না। আমার কাছে কিছু টাকা ছিল। ওকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার চেষ্টা করছি।'

'কত টাকা? ওকে এক্ষুনি পুরো ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব। আর তুমি চলেছ কীভাবে?'

'তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম,' স্যাম বলল। 'এমিলিকে বলেছি, ক্রেডিট কার্ড হারিয়ে ফেলেছি। নতুন কার্ড পাঠিয়েছে ও।'

ঘটনাটা এবার মনে পড়ল সাইমনের। ব্যাপারটাকে তখন গুরুত্ব দেয়নি। লোকে প্রায়ই ভিসা কার্ড হারিয়ে ফেলে–স্বাভাবিক ঘটনা।

'আপাতত লাইব্রেরির কম্পিউটার ব্যবহার করছি। অসুবিধা হচ্ছে না।'

জানে প্রশ্নটা করে কোনো লাভ নেই, তবু না করেও থাকতে পারল না সাইমন। 'আমাকে জানালে না কেন?'

বিষাদের ছাপ পড়ল ওর ছেলের চেহারায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমার দোষে হয়েছে এসব।'

'কী? না।'

'তোমাকে জানালে...'

'কিচ্ছু হতো না, স্যাম। আমাকে জানালেও কোনো লাভ হতো না।'

'মা কি বাঁচবে না?'

'বাঁচবে।'

'তুমি কীভাবে জানো?'

ভালো প্রশ্ন। প্রতিবাদ করল না সাইমন। লাভ নেই। দরজার দিকে দিকে তাকাল সে। দরজার ছোট জানালা দিয়ে ওদেরকে দেখছে ইভোনি। কামরা থেকে বেরিয়ে এল সাইমন, আবার ভেতরে ঢুকল ইভোনি।

ইলেন রেমিরেজকে করিডরের শেষ মাথায় পেল সে, ফোন টিপছিল।

'বলুন,' সাইমনকে দেখে ফোন পকেটে রাখল সে।

ছেলের কাছ থেকে যা যা জেনেছে, বলল সে।

'পেইজের ল্যাপটপ পাওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তাহলে,' সব শোনার পর বলল ইলেনা।

‘এখন কী করবেন?’ জিজ্ঞেস করল সাইমন।

‘যোগসূত্রগুলো খুঁজে বের করা দরকার।’ আবার ফোন হাতে নিল ইলেনা। ‘অ্যারনের পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইমেইল করছি আপনাকে। আজ সকালে ওর স্মরণে শোকসভা-টভা কিছু একটা করছে ওরা। আপনার বোধহয় ওখানে যাওয়া উচিত। হয়তো পেইজ আসবে অনুষ্ঠানে। আশেপাশে কাউকে পাঠান গোপনে নজর রাখার জন্যে। তা না হলে অ্যারনের পরিবারের সঙ্গে কথা বলুন। হেনরি থর্পের সাথে অ্যারনের পরিচয় ছিল কি না জানার চেষ্টা করুন।’

‘ঠিক আছে,’ সায় দিল সাইমন। ‘আপনি কী করবেন?’

‘হেনরি থর্পের সাথে যোগাযোগ করেছিল এমন আরেকজনের সঙ্গে দেখা করব।’

‘কে?’

‘নাম জানি না,’ জবাব দিল ইলেনা। ‘শুধু লোকেশন জানি।’

‘কোথায়?’

‘নিউ জার্সির একটা ট্যাটু পার্লার।’

১৫

কর্ভাল ইন ও ফ্যামিলি ট্রি ফার্মটা রোড আইল্যান্ড সীমান্তের কাছে, পশ্চিম কানেক্টিকাটে অবস্থিত। সাইমন ওখানে পৌঁছুল সকাল সাড়ে আটটায়। ইলেনা রেমিরেজের জোগানো তথ্য অনুসারে, অ্যারনের স্মরণে শোকসভাটা অনুষ্ঠিত হবে সকাল নটায়।

কর্ভাল ইনটা ফেডারেল স্টাইলের সুদৃশ্য ফার্মহাউস। পোর্চের সামনে সার দিয়ে কতগুলো সবুজ রঙের রকিং চেয়ার পাতা। একটা সাইনবোর্ডে লেখা–**১৮৯৩ সাল থেকে পারিবারিক সম্পত্তি**।

খাঁটি নিউ ইংল্যান্ডসুলভ পোস্টকার্ড। ছাগল-ভেড়া, মেষ, মুরগি দেখা যাচ্ছে পেছনের বার্নে।

গাড়ি পার্ক করে ইনের সদর দরজার দিকে এগোল সাইমন। দরজায় টাঙানো সাইনবোর্ডে লেখা–**শুধু ইন-এর অতিথিদের জন্য**।

সাইনবোর্ডের লেখাটা দেখেও দেখল না সাইমন, সোজা ঢুকে পড়ল ভেতরে। যতটা আশা করেছিল ভেতরটা তারচেয়ে বেশি সাজানো-গোছানো। মেহগনি কাঠের তৈরি সেটি-র দুপাশে চেরিকাঠের চেয়ার বসানো। প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ি। কর্ভাল পরিবারের শক্ত-সমর্থ, কঠোর চেহারার পুরুষদের তেলরঙে আঁকা পুরনো ছবি ঝুলছে দেয়ালে।

‘বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’

অতিথির দিকে চেয়ে উষ্ণ হাসি দিল ডেস্কের পেছনে বসা মহিলা। মহিলার পরনে চেককাটা ব্লাউজ। এ-ই অ্যারনের মা কি না, ভাবল সাইমন। পরক্ষণেই তার মাথার পেছনে টাঙানো একটা হাস্যোজ্জ্বল যুগলের পুরনো ছবির দিকে নজর চলে গেল ওর। মানুষ দুজনের বয়েস ষাটের ঘরে। ছবির নিচে লেখা:

(1,1) -62- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:31

কর্ভালরা
উইলি ও এনিড

সাইমন বলল, 'শোকসভার জন্য এসেছি।'

সন্দিহান চোখে ওর দিকে তাকাল মহিলা। 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'সাইমন গ্রিন।'

'আপনাকে আমি চিনি না, মি. গ্রিন।'

মাথা দোলাল সে। 'অ্যারনকে আমি চিনতাম।'

'আপনি অ্যারনকে চিনতেন!' মহিলার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'এখানে এসেছেন ওর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সাইমন। একটা পুস্তিকা বের করে সাবধানে খুলল মহিলা। নাকের ডগায় রিডিং গ্লাসটা ঠিকমতো বসিয়ে নিল। 'বার্নের পেছনে চলে যান। ওখান থেকে ডানে ঘুরবেন। তারপর এখানে যাবেন।'

পুস্তিকায় আঁকা ম্যাপের ওপর আঙুল রাখল মহিলা।

'বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ চলে গেছে। ওটা ধরে এগোবেন। একটা গাছে নীল রঙে আঁকা তির দেখতে পাবেন, ডান দিকে নির্দেশ করছে। ওটা হাইকারদের জন্যে। ওদিকে যাবন না, বাঁয়ে মোড় নেবেন।'

'জটিল,' মন্তব্য করল সাইমন।

পুস্তিকাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভুরু কোঁচকাল মহিলা। 'এই লবি শুধু ইনের অতিথিদের ব্যবহারের জন্য।'

ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সাইমন। একটা ট্রাক্টর মন্থর গতিতে চলছে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জায়গাটা দেখাচ্ছে পর্যটকদের। সবাই হাসছে–যদিও চেহারায় অস্বস্তির ছাপ। একটা পরিবার–মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে–সাইমনের উদ্দেশে হাত নাড়ল। সে-ও পাল্টা হাত নাড়ল। তারপর পকেট থেকে ফোনটা বের করে ওটার পর্দার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। না, কোনো মেসেজ-টেসেজ আসেনি।

বার্নের পেছনের রাস্তা ধরে এগোল সে। মুরগির ছানাগুলো ঘুরছে এদিক-ওদিক। একটা দৌড়ে এসে সাইমনের পায়ের ওপর উঠে পড়ল। ছানাটাকে আদর করার লোভ হলো ওর। কৃষকের পোশাক পরা এক লোক ডিম আর ইনকিউবেটর দেখাচ্ছে দর্শনার্থীদের।

পায়েচলা পথটা দেখতে পেল সাইমন। ওটা ধরে চলে গেল সবুজ তীর আঁকা গাছটা পর্যন্ত। ওখান থেকে বাঁয়ে মোড় নিল। বন এখানে ঘন হয়ে এসেছে। পিছু ফিরে চাইল সাইমন, কিন্তু বার্নটা দেখতে পেল না।

ক্রমেই ঢালু হয়ে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে চলল সে। দূর থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ আসছে–চলমান পানির আওয়াজ যেন। ছোট নহর বোধহয়।

খানিক এগোতেই পথটা ডানে মোড় নিল। আরো খানিকটা এগোতে গাছপালা পাতলা হয়ে এল এক জায়গায়। এরপর একটা নিখুঁত বর্গাকার ফাঁকা জায়গা। নিচু কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এক ফুট উঁচু। একটু পর-পরই ছোট ছোট সমাধিফলক পোঁতা।

পারিবারিক কবরস্থান।

দাঁড়িয়ে পড়ল সাইমন।

ফাঁকা জায়গাটার পেছনে একটা নহর ছুটে চলেছে কলকল শব্দে, তার পাশে একটা সেগুন কাঠের বেঞ্চি। নীরবে বসে হারানো প্রিয়জনকে স্মরণ করার জন্যে আদর্শ জায়গা।

একটা লোক মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে নতুন একখানা সমাধিফলকের সামনে। লোকটাকে চিনতে পারল সাইমন–উইলি কর্ভাল–অ্যারনের বাবা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। অবশেষে মাথা সোজা করে দাঁড়াল উইলি কর্ভাল।

'আপনি কে?' অ্যারনকে দেখে জিজ্ঞেস করল।

'আমার নাম সাইমন গ্রিন।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল উইলি কর্ভাল।

'পেইজের বাবা।'

'ও করেছে কাজটা?'

কিছু বলল না সাইমন।

'ও খুন করেছে আমার ছেলেকে?'

'না।'

'তুমি এত নিশ্চিত হলে কীভাবে?'

'নিশ্চিত জানি না।' মাত্রই ছেলেকে হারিয়েছে লোকটা। এখন মিথ্যে বলার সময় না। 'তবে আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমার মেয়ে খুনি না। কিন্তু তাতে আপনি খুব স্বস্তি পাবেন বলে মনে হয় না।'

কিছু বলল না উইলি কর্ভাল, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাইমনের দিকে।

'কিন্তু কাজটা পেইজ করেছে বলে মনে হয় না আমার। মৃত্যুটা...খুব নৃশংস। বিস্তারিত জানেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'পেইজ ওভাবে খুন করতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না আমার।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চিত নও, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

মুখ ফিরিয়ে নিল উইলি কর্ভাল। 'চলে যাও।'

'পেইজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে আমার কিচ্ছু যায়-আসে না।'

দূর থেকে বাচ্চাদের হাসির আওয়াজ এসে ঢুকছে সাইমনের কানে। বার্নের পেছনে খেলছে বোধহয়। এখানে বড় হয়েছিল অ্যারন কর্ভাল, ছবির মতো সুন্দর এই জায়গায়। অথচ কী বীভৎস ওর পরিণতি! পেইজও তো প্রায় একইরকম সুন্দর শৈশব পেয়েছে। অথচ ওরও কী বেহাল দশা!

ওদের জীবন কি নিখুঁত ছিল?

না।

প্রায়-নিখুঁত ছিল?

হ্যাঁ।

তবু নোংরা রাস্তা বেছে নিল ওর মেয়ে। হাজারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে সাইমন, কেন এরকম হলো? মেয়ের বন্ধু-বান্ধব, পড়াশোনার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিল তো সে? ওর শখ-আহ্লাদ ঠিকমতো পূরণ করেছে? বাবা-মা হিসেবে ওরা কি খুব বেশি কড়া হয়ে পড়েছিল? অথবা খুব বেশি আদর দিয়ে মাথায় তুলে ফেলেছিল মেয়েকে? সাইমন মাত্র একবারই, এক রাতে খাওয়ার সময়, রেগে আগুন হয়ে একটা একটা গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিল মেঝেতে। মাত্র একবার। বহু বছর আগে। ওর মনে আছে, ভয়ে কেমন থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল পেইজ।

ওই ঘটনার ফলেই কি অমন বদলে গেল মেয়েটা?

'এ কে?' সহসা একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল পেছন থেকে।

বন্ করে সেদিকে ঘুরে গেল সাইমন। মহিলাকেও চিনতে পারল সে—ছবি দেখে এসেছে ইনে—অ্যারনের মা, এনিড। দশ-বারোজন মানুষ আসছে মহিলার পিছু পিছু। হাতের বাইবেল আর পরনের পোশাক দেখে পাদ্রিকে চেনা গেল।

'পথ ভুল করে চলে আসা এক ভদ্রলোক,' জবাব দিল উইলি কর্ভাল।

ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলবে কি না ভাবল সাইমন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই বিড়বিড় করে মাফ চেয়ে ফার্মের দিকে ফিরে চলল সে। মানুষগুলোর মধ্যে অ্যারনের সমবয়সি কেউ নেই। ওর মনে আছে, পেইজ বলেছিল, অ্যারন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার মানে, ওর কোনো ভাইবোন নেই। আর এই দলের সবাই-ই বয়স্ক লোক। এদের মধ্যে অ্যারনের কোনো বন্ধু আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য নেশাখোর লোকটার আদৌ যদি কোনো বন্ধু থেকে থাকে আরকি।

এখন তাহলে কী করবে সে?

বার্নের পেছনে ফিরে দেখল, দশ-এগারো বছর বয়সি একদল বাচ্চাকাচ্চা হইহল্লা করছে। পকেট থেকে ফোন বের করল সাইমন। মেসেজ এসেছে বেশ কয়েকটা। সেসব না পড়ে প্রথমে ইভোনির নম্বরে ডায়াল করল।

'অবস্থা আগের মতোই,' জানাল ইভোনি।

'ওর সঙ্গে থাকা দরকার আমার,' সাইমন বলল।

'না, দরকার নেই। একটু উল্টো করে ভাবো। ধরো, তুমি গুলি খেয়ে কোমায় চলে গেলে। তখন কি তুমি চাইতে ইনগ্রিড তোমার হাত ধরে পাশে বসে থাকুক? নাকি...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝেছি।'

'অ্যারনের পরিবারকে পেয়েছ?'

এখানকার খবর জানাল সাইমন।

'তাহলে এখন তোমার প্ল্যান কী?' সব শুনে জিজ্ঞেস করল ইভোনি।

'শোকসভা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর আবার কথা বলার চেষ্টা করব ওদের সাথে।'

'বাপটাকে তো সহজ লোক মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করল ইভোনি। 'মা বেশি বুঝদার হতে পারে। তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে পারো।'

'সেক্সিস্ট মন্তব্য করলে,' বলল সাইমন।

'হ্যাঁ।' অকপটে স্বীকার করল ইভোনি।

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'তোমার কাজ চালিয়ে নিচ্ছি।'

ফোন কেটে দিয়ে নিজের গাড়িতে ফিরে গেল সাইমন। গাড়িতে বসে মেসেজগুলো শুনতে শুরু করল। গোলাগুলির খবরটা কীভাবে যেন খবরের কাগজের চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই বেশিরভাগ মেসেজই মক্কেলদের। কয়েকজন মক্কেলকে ফোন করে কিছু পরামর্শ দিল সে।

আধঘণ্টা বাদে, পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে শোকমিছিলটাকে ফিরে আসতে দেখল সাইমন। উইলি কর্ভাল আর পাদ্রি রয়েছে মিছিলটার অগ্রভাগে। সামনে ঝুঁকে হাঁটছে উইলি–তার কাঁধে হাত রেখে নিচু গলায় সান্ত্বনা দিচ্ছে বোধহয় পাদ্রি। দলের বাকিরা আসছে তাদের পিছু পিছু।

দলটার পেছনে–বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে–আসছে এনিড কর্ভাল, অ্যারনের মা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল সাইমন। আনমনা মনে হচ্ছে এনিডকে। কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখছে একটু পরপর, মন্থর হয়ে যাচ্ছে হাঁটার গতি–ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে শোকমিছিল থেকে। একা হয়ে পড়ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল সাইমন। এনিড তো মৃতের মা। স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে কয়েকজন মানুষ থাকার কথা–যারা তাকে হাত ধরে সান্ত্বনার বাণী শোনাবে। কিন্তু কেউ করছে না কাজটা।

মহিলার পরনের পোশাকও অন্যরকম। উইলি কর্ভালসহ দলের বাকিদের পরনে নীল ব্লেজার, খাকি শ্যু। অথচ এনিডের পরনে জিন্স, ভেলক্রো হোয়াইট স্নিকার আর হলুদ সোয়েটার।

পোর্চের দিকে এগোল উইলি আর পাদ্রি। সাইমনকে পথ চিনিয়ে দিয়েছিল যে রিসেপশনিস্ট সে দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল উইলিকে। শোক জানাতে আসা বাকিরাও ভেতরে ঢুকল তার পেছন পেছন।

এনিড বাদে।

বাইরেই থেকে গেল সে। বাঁয়ে তাকাল মহিলা, তারপর ডানে–শেষে ইনের পেছনের দিকে রওনা দিল।

কী করবে ঠাহর করে উঠতে পারছে না সাইমন। গাড়ি থেকে বেরিয়ে মহিলার মুখোমুখি হবে? নাকি এখানে বসেই দেখবে সে কোথায় যায়?

এনিড কর্ভাল মোড় ঘুরে ইনের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যেতেই চট করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সাইমন, ভালোমতো দেখার জন্যে। একটা পিকআপ ট্রাকে উঠতে দেখল মহিলাকে। ইঞ্জিন চালু করে পিকআপ ঘোরাল সে। হন্তদন্ত হয়ে নিজের গাড়িতে ফিরে ইগনিশন বোতাম চাপল সাইমন।

ত্রিশ সেকেন্ড পর। টম হুইলার রোড ধরে এনিড কর্ভালের পিকআপের পিছু পিছু চলেছে সে।

রাস্তার দুপাশে নিচু পাথরের দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। এই এলাকা সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না সাইমন।

পনেরো মিনিট বাদে একটা নোংরা পার্কিং লটে গিয়ে ঢুকল পিকআপ ট্রাকটা। আরো অনেকগুলো পিকআপ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। জায়গাটার নাম সংবলিত কোনো সাইনবোর্ড-টাইনবোর্ড চোখে পড়ছে না। পিকআপ থেকে নেমে একটা বার্নের দিকে এগোল এনিড।

নিজের অডি নিয়ে পার্কিং লটে ঢুকে পড়ল সাইমনও। এক কোনায় নিয়ে রাখল গাড়িটা। বাঁয়ে তাকাতে বেশ খানিকটা দূরে চোখ পড়ল ডজন দুয়েক মোটরসাইকেল সাজিয়ে রাখা হয়েছে দুই সারিতে–রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। বেশিরভাগই হার্লে-ডেভিডসন। মোটরসাইকেল সম্পর্কে সাইমনের তেমন জ্ঞান না থাকলেও হার্লের লোগো চিনতে পারল ঠিকই।

নোংরা লট ধরে সেলুন স্টাইলের দরজাগুলোর দিকে এগোচ্ছে এনিড। দরজার কাছে পৌঁছার আগেই মাথায় ব্যান্ডানা বাঁধা, ট্রাউজার পরা দুজন গাঁট্টাগোট্টা লোক উদয় হলো পার্কিং লটে। পেশিবহুল দুই হাতে অগুনতি ট্যাটু আঁকা। দুজনেরই মুখভর্তি দাড়ি। দেখেই বোঝা যায়, বাইকার।

উষ্ণ করমর্দন আর আলিঙ্গনের মাধ্যমে এনিডকে স্বাগত জানাল দুজনে। একজনের গালে চুমু খেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মহিলা। তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি না ভাবল কিছুক্ষণ সাইমন–কিন্তু তাতে বোধহয় সময় নষ্ট হয়ে যাবে। গাড়ি থেকে নেমে বার্নের দরজার দিকে এগোল সে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সময় ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল চড়া আওয়াজে গানের আওয়াজ শুনতে পাবে, ওকে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে সবাই। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। কোনো গানের আওয়াজও নেই ভেতরে। শুধু মান্ধাতার আমলের একটা টেলিভিশনে বেজবল খেলা দেখাচ্ছে। বারটা অদ্ভুত। অস্বাভাবিক চওড়া, নাচা যাবে। ডান দিকে একটা

জুকবক্স দেখতে পেল, তবে ওটার প্লাগ খোলা। পায়ের নিচের মেঝেও পার্কিং লটের মতোই নোংরা।

বারে বসে রয়েছে এনিড কর্ভাল। সবে বাজে সকাল এগারোটা–সেই হিসেবে ব্যবসা রীতিমতো চাঙ্গাই বলা চলে। ভেতরে গোটা তিরিশেক টুল পাতা। জনা দশেক খদ্দের বসে রয়েছে ওগুলোতে। সবাই-ই নিজ নিজ পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে মনোযোগ দিয়ে, মাথা নিচু। ডান দিকের একটা টেবিলে একদল বাইকার পুল খেলছে।

পাবস্ট ব্লু রিবন-এর ক্যান পড়ে রয়েছে সর্বত্র।

সাইমনের পরনে শার্ট, টাই, আর কালো লোফার। অথচ বারে উপস্থিত অর্ধেক লোকের পরনেই সুতির জিম করার পোশাক। সবার বয়েসই চল্লিশের ওপর। এ জামায় কাউকেই ভালো দেখাচ্ছে না–কিন্তু সেসবের থোড়াই কেয়ার করে এরা। মনে মনে মানুষগুলোর বেপরোয়া মানসিকতার প্রশংসা না করে পারল না সাইমন।

এনিডের থেকে দুই টুল দূরে বসে পড়ল সে। ড্রিঙ্ক থেকে চোখ তুলে চাইল না মহিলা। সাইমনের অপরপাশে পর্কপাই হ্যাট পরা এক লোক বসে রয়েছে। মাথা ওপর-নিচ দোলাচ্ছে লোকটা, গান শুনছে যেন–যদিও কোনো গান বাজছে না কোথাও। এমনকি লোকটার কানেও কোনো ইয়ারফোন নেই। পেছনের দেয়ালে রংধনু আঁকা–রং চটে গেছে। নিয়নবাতির সাইনবোর্ডে লেখা–*মিলার হাই লাইফ অ্যান্ড শিল্টয*। একটা বেখাপ্পা ঝাড়বাতি ঝুলছে সিলিং থেকে।

'কী খাবে?' বারমেইড জানতে চাইল। মহিলার মাথায় খড় রঙের চুল। চেহারা আর বেশবাস দেখে আশির দশকের হকি খেলোয়াড় মনে হয়। বয়স পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, আবার পঁয়ষট্টিও হতে পারে।

'কোন্ কোন্ ব্র্যান্ডের বিয়ার আছে তোমাদের এখানে?' জানতে চাইল সাইমন।

'পাবস্ট। আর পাবস্ট।'

'তাহলে তোমার পছন্দমতোই দাও।'

এনিডের চোখ এখনো নিজের পানীয়র দিকেই। সেদিকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'তুমি পেইজের বাবা।'

'উইলি বলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা, এখনো তাকাচ্ছে না সাইমনের দিকে। 'ও কিছু বলেনি। তুমি এসেছ কেন?'

'শ্রদ্ধা জানাতে।'

'মিথ্যে কথা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার ক্ষতির জন্য আমি দুঃখিত।'

জবাবে কিছু বলল না এনিড। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তাহলে বলে ফেলো, এখানে এসেছ কেন?'

'আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

মদের ক্যান খুলে সাইমনের সামনে এনে রাখল বারমেইড।

অবশেষে ওর দিকে ফিরল এনিড। 'কবে থেকে?'

'অ্যারন যেদিন খুন হলো, সেদিন থেকে।'

'ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না।'

'একমত।'

'তোমার মেয়ে বোধহয় ওকে খুন করে পালিয়েছে,' আবেগশূন্য গলায় বলল মহিলা।

'যদি বলি, আমার তা মনে হয় না, তাহলে কি কোনো ফারাক পড়বে তোমার কাছে?'

হয়তো-হ্যাঁ, হয়তো-না ভঙ্গিতে মাথা দোলাল এনিড। 'তুমি জুয়া খেল?'

'না।'

'হুম। তুমি তো বড়সড় স্টকব্রোকার বা ওরকম কিছু, তাই না?'

'আর্থিক পরামর্শ দেই।'

'হুম। যাকগে, তুমি সবচেয়ে শক্তিশালী দুটো সম্ভাবনা জানো, তাই না?'

'কোন্ কোন্ সম্ভাবনা?'

'এক, অ্যারনকে খুন করে পালিয়েছে তোমার মেয়ে।'

'আর দুই?'

'অ্যারনকে যে খুন করেছে, সে ওকেও ধরে নিয়ে গেছে।' ড্রিঙ্কে চুমুক দিল এনিড কর্ভাল। 'দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই বেশি জোরালো।'

'এ কথা মনে হলো কেন তোমার?' জানতে চাইল সাইমন।

'নেশাখোররা কোনো সূত্র না ফেলে কিংবা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালানোতে দক্ষ না।'

'তাহলে তোমার ধারণা, আমার মেয়ে ওকে খুন করেনি?'

'আমি তা বলিনি।'

'আচ্ছা, ধরলাম তোমার কথাই ঠিক,' সাইমন বলল। 'কিন্তু পেইজকে ধরে নিয়ে যাবে কেন খুনি?'

'জানি না। বলতে খারাপ লাগলেও, খুব সম্ভব ও আর বেঁচে নেই।' আরেক চুমুক তরল গিলল মহিলা। 'তুমি এখানে কেন এসেছ তা কিন্তু এখনো জানতে পারিনি।'

'আশা করছি তুমি হয়তো কিছু জানো।'

'গত কয়েক মাসে অ্যারনের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।'

'এই লোকটাকে চেনো?'

(2,1) -65- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:32

এনিডের হাতে নিজের ফোন দিল সাইমন। মক্কেলের নিখোঁজ ছেলে, হেনরি থর্পের ছবি ওকে মেসেজ করে পাঠিয়েছে ইলেনা রেমিরেজ।

‘এ কে?’

‘ওর নাম হেনরি থর্প। শিকাগোর লোক।’

মাথা নাড়ল এনিড। ‘চিনি না। কেন?’

‘এসবের সাথে ছেলেটা জড়িত থাকতে পারে।’

‘কীভাবে?’

‘জানি না। জানার জন্যেই এসেছি। সে-ও নিখোঁজ।’

‘পেইজের মতো।’

‘সম্ভবত।’

‘দুঃখিত, তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।’

মাথা কামানো এক বাইকার একটা টুল টেনে বসে পড়ল ওদের মাঝখানে। লোকটার কালো লোহার ক্রুশের ট্যাটুর দিকে চোখ চলে গেল সাইমনের–একটা স্বস্তিকামতো ট্যাটুও দেখা যাচ্ছে শার্টের হাতার নিচ দিয়ে। সাইমনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওর দিকে খরদৃষ্টিতে চাইল বাইকার। সাইমনও পাল্টা খরদৃষ্টি হানল।

‘কী দেখছ?’ শক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল বাইকা।

একচুল নড়ল না সাইমন।

‘জিজ্ঞেস করলাম না...’

এনিড বলল, ‘আমার সঙ্গে এসেছে ও।’

‘আরে, এনিড, আমি আসলে...’

‘তুমি একটা ব্যক্তিগত আলাপের মাঝখানে বাগড়া দিচ্ছ।’

‘ব...বুঝতে পারিনি।’ ভয়ের ছোঁয়া বাইকারের কণ্ঠে। ‘আমি স্রেফ একটু বিয়ার গিলতে এসেছি, এনিড।’

‘ভালো। পুল টেবিলের কাছে গিয়ে বসো, গ্ল্যাডিস নিয়ে আসছে।’

সুবোধ বালকের মতো চলে গেল লোকটা।

‘এনিড,’ ডাকল সাইমন।

‘হুঁ?’

‘এটা কেমন জায়গা?’

‘প্রাইভেট ক্লাব।’

‘তোমার?’

‘এখানে তুমি নিজের মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ নিতে এসেছ নাকি আমার ব্যাপারে?’

‘অ্যারনের ব্যাপারে বলবে আমাকে?’

‘কী বলব?’

‘জানি না। যেকোনো কিছু। সবকিছু।’

'তাতে কোনো লাভ আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'কিছু সুতো আছে আমার হাতে,' বলল সাইমন। 'কিন্তু মনে হচ্ছে সুতগুলোতে কিছু একটা নেই। সেজন্য সবাইকে প্রশ্ন করছি।'

ভ্রু কোঁচকাল মহিলা। 'আরো ভালোমতো কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কাল আমার স্ত্রীকে গুলি করা হয়েছে,' বলল সাইমন।

জিজ্ঞাসুনেত্রে ওর দিকে চেয়ে রইল এনিড।

'বেঁচে আছে, কিন্তু...পেইজকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমরা। ওরা যেখানে থাকত, সেখানে গিয়েছিলাম। অ্যারন যেখানে খুন হয়েছে।'

এরপর পুরো ঘটনা মহিলাকে খুলে বলল সে। কথা বলতে বলতে কামরার চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে। ওদের মাঝখানে বসা সেই বাইকারটাই শুধু সাদাদের আধিপত্যে বিশ্বাসী নয় এখানে–আরো অনেকের বাহুতে দেখা যাচ্ছে স্বস্তিকার ট্যাটু আঁকা।

'অ্যারন যেখানে বড় হয়েছে, সেই জায়গা দেখেছ তুমি,' ওর কথা শেষ হলে বলল এনিড।

'ওই ফার্মে।'

'জায়গাটা আসলে ফার্ম না, ট্যুরিস্ট স্পট। তবে খুব সুন্দর জায়গা, না?'

'হ্যাঁ।'

'ছোটবেলায় অ্যারন মূল ইনে থাকত। তখন কেবল ছয়টা রুম ভাড়া দেয়া হতো। বাকিগুলোতে থাকত পরিবারের লোকেরা। তারপর পরিবার বড় হতে লাগল। দশটা রুম ভাড়া দেয়া শুরু করল ওরা। পাঁচ-ছয় বছর আগে বাড়িটাকে বাড়াই আমরা। এখন চব্বিশটার বেশি রুম ভাড়া দেয়া হয়। খুব ভালো একটা রেস্তোরাঁও চালাই আমরা। গিফট শপেও ভালো ব্যবসা হয়। স্যুভেনির, মোমবাতি এসব টুকিটাকি জিনিস বেচি। প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি, না?'

'মোটেই না।'

'তুমি তো অ্যারনের সম্পর্কে জানতে চাও।'

জবাব দিল না সাইমন।

'যাকগে, ছোটবেলায়ও অ্যারনের চরিত্রে একটু খামতি ছিল।'

ট্যাটু আঁকা এক লোক এসে দাঁড়াল পেছনের দরজায়। তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল এনিড। চলে গেল লোকটা।

'এসব তথ্য তোমার কীভাবে কাজে আসবে বুঝতে পারছি না,' বলল মহিলা।

'ওরা।'

'কী?'

'তুমি বললে, "দশটা রুম ভাড়া দিতে শুরু করল ওরা।"'

'তো?'

'"আমরা"র বদলে "ওরা" ব্যবহার করেছ তুমি। ভুলে বলেছ?'

'না। আমি তখনও "আমরা" হইনি,' জবাব দিল এনিড। 'উইলির সঙ্গে তখনও বিয়ে হয়নি আমার।'

'তখন কখন?'

'উইলি যখন মূল ইনে থাকত।'

'কিন্তু তুমি তো বললে অ্যারন থাকত ওখানে।'

'হ্যাঁ। উইলির সঙ্গে। আমি ওর সৎ মা। ওর বয়স নয় হওয়ার পর দৃশ্যপটে আসি আমি। সত্যি কথাই বলি–আমি ঠিক মা-সুলভ মহিলা না। কি, অবাক হলে? অ্যারন আর আমার মধ্যে কখনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না।'

'আর ওর আসল মা। সে কোথায়?'

পেছনের দরজার দিকে তাকাল এনিড। ট্যাটুঅলা লোকটা ফের উদয় হয়েছে ওখানে। গেলাস খালি হয়ে গেছে এনিডের। বারমেইড গ্ল্যাডিস বিনা-বাক্যব্যয়ে ওটা ভরে দিল।

'মিসেস কর্ভাল?' ডাকল সাইমন।

'এনিড ডেকো।'

'এনিড, অ্যারনের আসল মায়ের কী হয়েছে?'

'তার সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'হয়তো আছে।'

'কীভাবে?' বারে কনুই রেখে সাইমনের চোখে চোখ রাখল মহিলা। 'অ্যারনকে প্রথমদিন থেকেই বলেছিলাম: এসব ছাইপাঁশ খেয়ো না। চেখে দেখার জন্যও না। এসব খাওয়ার পরিণতি কী হয়, তা ও নিজের চোখে দেখেছে। তারপরও এই ছাইপাঁশই খেয়েছে ছেলেটা–খুনও হয়েছে নেশার আখড়াতেই। তাহলে বলো, মি. গ্রিন, অ্যারনের এই পরিণতির সাথে ওর আসল মায়ের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আর তোমার মেয়ের উধাও হয়ে যাবার সাথেই বা ওর মায়ের কী সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'জানি না,' সোজা-সাপটা জবাব দিল সাইমন।

'দোষ দিতে হলে তো আমাকেই দেয়া উচিত, তাই না?'

সাইমন কিছু বলল না।

'ওর বাপ আর আমি বিয়ে করলাম। কৈশোরে পা দিয়েই এখানে ঘোরাঘুরির চেষ্টা করতে লাগল ও। নির্জন জায়গায় বড় হওয়ার সমস্যাই এটা। লোকে এসব জায়গাকে স্বর্গ মনে করে। স্বর্গ না ছাই। সৌন্দর্য মানুষকে বিরক্ত করে ফেলে, তাদেরকে ফাঁদে ফেলে। অ্যারনের মতো মানুষের জন্য সৌন্দর্য আরো বিপজ্জনক।'

'অ্যারনের আপন মা কি আজকের অনুষ্ঠানে এসেছিল?' জানতে চাইল সাইমন।

মাথা নিচু করে রাখল এনিডি।

(1,1) -67- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:32

'অন্তত...'

'না, ওখানে যায়নি সে,' বলল এনিড।

'সে কি এখনো বেঁচে আছে? ছেলের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক আছে তার?'

'আমি জানি না, মি. গ্রিন।'

'উঁহু, তুমি জানো। মানে, যথেষ্ট জানো তুমি। এখানে তুমি কী করছ বা ইনে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা একটাই–নিখোঁজ মেয়েকে খুঁজে বের করা।'

'তার সাথে এসবের কী সম্পর্কে বুঝতে পারছি না...'

'হয়তো নেই,' এনিডকে থামিয়ে দিল সাইমন। 'এখন পর্যন্ত তা-ই মনে হচ্ছে। পুলিশের ধারণা, পেইজ সম্ভবত নিজেকে বাঁচানোর জন্য খুন করেছে অ্যারনকে। কিংবা ওটা হয়তো আমার ধারণা। অথবা আমার স্ত্রীর। কিংবা কে জানে, হয়তো ড্রাগের ডিলে গোলমাল হওয়ার কারণে খুন হয়েছে ও। এসবই থিয়োরি। আর এসব থিয়োরি বাদ দিয়ে আসল সত্যিটা জানার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি আমি।'

হাতের গ্লাসটা ঘোরাতে শুরু করল এনিড, দুই চোখ স্থির তরলের দিকে।

'অ্যারনের মা কি বেঁচে আছে?'

'সত্যি বলব?' মুখ তুলে অনেকক্ষণ সাইমনের দিকে চেয়ে রইল এনিড। 'আমি জানি না।'

'সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে, জানো না তুমি?'

'না।' গ্ল্যাডিসের দিকে ফিরল এনিড। 'আমার বন্ধুকে আরেকটা বিয়ার দাও। কোনার বুথে নিয়ে এসো। ওর সাথে কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলব আমি।'

(2,1) -67- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:32

১৬

ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো ট্যাটুস হোয়াইল ইউ ওয়েট-এর প্রবেশপথ। দোকানটার সামনে দুটো পুলিশ-কার দেখতে পেল ইলেনা রেমিরেজ। আরো দুটো গাড়ি রয়েছে–তবে সেগুলো পুলিশের কি না বোঝা যাচ্ছে না। ভাড়া করে আনা ফোর্ড ফিউশনটা হাইওয়ে আর ব্যারিকেডের মাঝখানে নিয়ে এল ইলেনা।

একজন পুলিশ ভ্রু কুঁচকে এগিয়ে এল তার দিকে। 'এখানে থামতে পারবেন না। চলে যান।'

'কী হচ্ছে এখানে?'

'প্লিজ, গাড়ি সরান।'

নিজের পরিচয়পত্র দেখাতে পারে ইলেনা, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হবে বলে মনে হচ্ছে না। এখানে আসলে কী হয়েছে, পুলিশের এখানে আসার কারণ কী, কিছুই জানে না সে। কিছু না জেনেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে ফেলাটা তার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয় না।

একটু খোঁজখবর নেয়া দরকার।

পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে আবার হাইওয়েতে উঠে এল ইলেনা। রাস্তা থেকে একশো গজমতো দূরে, সনিক ড্রাইভ-ইন-এ পার্ক করল গাড়ি। তারপর ফোন বের করে কয়েকটা কল করল। প্রায় আধঘণ্টা লাগল গতকালের জোড়া খুন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে।

দুই ভিক্টিমের একজন ড্যামিয়েন গর্স, উনত্রিশ বছর বয়েস, পার্লারের মালিকানায় ভাগ আছে–আরেকজন রায়ান বেইলি, হাই স্কুল সিনিয়র, দোকানে পার্টটাইম চাকরি করত। প্রাথমিক রিপোর্টে ধারণা করা হচ্ছে, ডাকাতি করতে গিয়ে খুন করা হয়েছে দুজনকে।

ভুল ধারণা, ভাবল ইলেনা।

আরো কয়েকটা ফোনকল করে অপেক্ষা করতে লাগল সে। অবশেষে জবাব পেল। তারপর ফের হাইওয়েতে উঠে ব্যারিকেডগুলোর দিকে চালাল গাড়ি। সেই আগের অফিসারই একটা ব্যারিকেড সরিয়ে দিল, যাতে ইলেনা প্রবেশ করতে পারে। ইশারায় বাঁ দিকে পার্ক করতে বলল সে। মাথা দুলিয়ে তা-ই করল ইলেনা।

রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে চেহারায়। এই কাজটা খুব কষ্টকর। পুলিশের অহমবোধকে সামলানো সোজা কথা না।

মধ্যত্রিশের এক লোক–চল্লিশও হতে পারে–বেরিয়ে এল ট্যাটু পার্লারের সামনের দরজা ঠেলে। হাত থেকে ক্রাইম সিনে পরার দস্তানা খুলে এগিয়ে এল সে ইলেনার দিকে। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে হাঁটলেও তাতে ঔদ্ধত্যের ছাপ নেই। অসম্ভব সুদর্শন লোকটা। এখনো প্রেমে পড়ার মন-মানসিকতা থাকলে ইতিমধ্যে এর প্রেমে হাবুডুবু খেত ইলেনা। কিন্তু জোয়েলের মৃত্যুর পর ওর ভেতর সেই অনুভূতি মরে গেছে।

ওর দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে আড়ষ্ট হাসি দিল লোকটা। 'আপনি নিশ্চয়ই স্পেশাল এজেন্ট রেমিরেজ?'

'রিটায়ার্ড।'

লোকটার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ইলেনা। বিশাল হাত। জোয়েলের মতো। আবেগের আরেকটা খোঁচা টের পেল সে।

'আমি ডিটেকটিভ ডুমা। সবাই আমাকে ন্যাপ বলেই ডাকে।'

'ন্যাপ,' পুনরাবৃত্তি করল ইলেনা।

'হ্যাঁ, *খানিকক্ষণের* ঘুম আরকি।'

'আমি ইলেনা। এখন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

'জানি, বস্ বলেছেন।'

'কাউন্টি প্রসিকিউটর লরেন মিউজ?'

'হ্যাঁ।'

'ও নিশ্চয়ই ভালো আছে।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ন্যাপ। 'ভালো আছেন।'

নিজের চেয়ে কমবয়সি নারীর অধীনে চাকরি করার জন্যে কোনো ধরনের হীনম্মন্যতা বা ঘৃণা প্রকাশ পেল না লোকটার কথার ধরনে। ওরকম কোনো আভাসও দিল না। ভালো লক্ষণ।

ইলেনার ফার্ম, ভিএমবি ইনভেস্টিগেশনস, দেশের সবচেয়ে স্বনামধন্য ফার্মগুলোর একটা। শিকাগো, নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস, হিউস্টনে অফিস আছে ওদের। অনেক জায়গায়ই খোঁজখবর নেয়ার দরকার পড়ে ভিএমবি-র তদন্তকারীদের। সেজন্যে তারা উদার হাতে নানা ধরনের রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন আর পুলিশের জনকল্যাণমূলক কাজে অনুদান দেয়। ইলেনার এক

সিনিয়র পার্টনার, ম্যানি অ্যান্ড্রুজ, বর্তমান গভর্নরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সমর্থক। ওই গভর্নরই লরেন মিউজকে কাউন্টি প্রসিকিউটর বানিয়েছিলেন। কাজেই অ্যান্ড্রুজ ফোন করেছিলেন গভর্নরকে, গভর্নর মিউজকে, শেষে মিউজ ফোন করেছে এই কেসের প্রধান তদন্তকারী ন্যাপ ডুমাকে।

তার ফলেই এই আন্তরিক অভ্যর্থনা প্রাপ্তি ইলেনার।

আইনের বাইরে কিছুই হয়নি। সাহায্যের বিনিময়ে সাহায্য–নির্দোষ ব্যাপার। গোটা দুনিয়াতেই চিরকাল এই নিয়ম চলে আসছে–'তুমি আমার পিঠ চুলকে দেবে তো আমিও তোমারটা দেব।' যেখানে এই নিয়ম ভেঙে পড়ে সেখানে সমাজব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে।

পুলিশ অবশ্য প্রায়ই নিয়মটাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে চায়। তবে ডিটেকটিভ ন্যাপ ডুমাকে ভালো লোকই মনে হচ্ছে। আপাতত আরকি।

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলল সে।

বিল্ডিঙের বাম দিকে হাঁটা ধরল সে। বহুকাল আগে একটা কেসের কাজে গিয়ে গুলি লেগেছিল ইলেনার পায়ে। সেই থেকে খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটে সে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডিটেকটিভের পিছু নিল সে।

'ঘণ্টাখানেক আগে কেসটার দায়িত্ব নিয়েছি আমি,' ন্যাপ জানাল। 'তাই আমিও সব খুঁটিনাটি জানি না। কাজ করতে করতে জেনে নিচ্ছি।'

'অকুস্থলে ঢুকতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ডুমার ঠোঁট থেকে।

পাল্টা হাসি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ইলেনা।

'এ ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কেন, বলতে অসুবিধা আছে?'

'একটা কেস আছে আমার হাতে,' জবাব দিল ইলেনা। 'ওটার সাথে আপনার এই কেসটার সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'আচ্ছা,' অস্ফুটে বলল ডুমা।

মুচকি হাসল ইলেনা। কাঠের প্যানেলঅলা একটা ফোর্ড ফ্লেক্স দেখতে পেল সামনে। ধবধবে সাদা পোশাক পরা দুজন বিশেষজ্ঞ কাজ করছে ঘটনাস্থলে।

'আপনার কেসটা ঠিক কোন্ ধরনের বলা যাবে?' জানতে চাইল ডিটেকটিভ।

লোকটাকে মুখের ওপর না করে দেবে কি না ভাবল ইলেনা। বলে দিতে পারে, তার বস্ স্রেফ ইলেনাকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে তাকে। তাছাড়া সে-ও নিজের কেস নিয়ে মুখ খুলতে পারবে না। কিন্তু তেমন কিছু বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। ন্যাপ লোকটাকে ভালোই মনে হচ্ছে। একটু বেশিই ভালো যেন। ইলেনা অবশ্য বরাবরই প্রথম দর্শনের ভালোলাগার অনুভূতির ব্যাপারে সন্দিহান। কারণ সবচেয়ে খচ্চর স্বভাবের লোকটাও প্রথম দেখায় মিষ্টি হাসি দিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। কিন্তু ব্যাপার হলো, যত

(1,1) -69- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:33

ভালো অভিনয়ই করুক না কেন, ইলেনাকে সহজে কেউ বোকা বানাতে পারে না। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই একটা মানুষ ভালো কি মন্দ, তা ধরে ফেলে সে। সময়ের সাথে সাথে আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে তার এই ক্ষমতা। বেশিরভাগ সময়ই প্রথম দেখায় যে লোকটাকে ওর খারাপ মনে হয়েছে শেষতক দেখা গেছে, লোকটা আসলেই খারাপ। আর খুব কম সময়ই প্রথম দেখায় কাউকে ভালোমানুষ মনে হয়েছে তার। সেসব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, তারা আসলেই বিশ্বস্ত লোক।

আর ন্যাপ ওকে জোয়েলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওর জোয়েল। উফ, ঈশ্বর!

আবারও পেটের ভেতর প্রজাপতির নাচন শুরু হলো ইলেনার।

'ন্যাপ?'

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা।

'আমাদের বোধহয় একটু অপেক্ষা করা ভালো,' বলল ইলেনা।

'তা-ই?'

'আপনার কাছ থেকে কিছু লুকাব না আমি,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ইলেনা। 'কিন্তু প্রথমেই এই কেস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, তা শুনতে চাই। কোনো রকমের পূর্ব-ধারণা ছাড়া আপনি যা ভাবেন, তা-ই বলুন।'

'পূর্ব-ধারণা ছাড়া,' বিড়বিড় করে পুনরাবৃত্তি করল ডুমা।

'হ্যাঁ।'

'মানে, তথ্য-প্রমাণ আর পরিস্থিতি সম্পর্কে কিচ্ছু না জেনেই মনে যে ধারণা আসছে, সেটার কথা জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করল ন্যাপ। কিন্তু শীঘ্রই কাটিয়ে উঠল সেই জড়তা। মাথা দুলিয়ে সায় জানাল। তারপর ফোর্ড ফ্লেক্সের কাছে পৌঁছে বলল: 'আমাদের ধারণা—প্রথম গুলিটা চালানো হয়েছিল এখানে, ডেমিয়েন গর্স গাড়িতে ওঠার সময়।'

'গর্সকে প্রথম গুলি করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমরা নিশ্চিত।' ওপর-নিচ মাথা দোলাল ন্যাপ। 'কেন, তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ?'

জবাব পেল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ঠিক আছে। পূর্ব-ধারণা।'

'গুলি করেছে কজন?' জানতে চাইল ইলেনা।

'জানি না। তবে প্রাথমিক ব্যালিস্টিক রিপোর্ট ইঙ্গিত করছে, একই পিস্তলের গুলিতে মরেছে দুই ভিক্টিম।'

'তাহলে খুনি খুব সম্ভব একজনই।'

'বলা কঠিন। তবে ওরকমই মনে হচ্ছে।'

অকুস্থলের দিকে চোখ ফেরাল ইলেনা। প্রথমে বিল্ডিঙের পেছনের অংশের ওপর চোখ বোলাল সে, তারপর আকাশপানে। 'পার্কিং লটে কোনো সিকিউরিটি ক্যামেরা নেই?'

'নাহ।'

'ভেতরে?'

'ওখানেও নেই। স্রেফ একটা *এডিটি* অ্যালার্ম আছে–প্যানিক বাটন আর মোশন ডিটেক্টরঅলা।'

'ব্যবসাটায় বোধহয় কাঁচা টাকা রোজগার হয়।'

'হ্যাঁ।'

'প্রতিদিনের টাকা কী করে ওরা?'

'পার্লারটার মালিক দুজন। একজন টাকাটা প্রতি রাতে বাড়ি নিয়ে ওদের সেফে তুলে রাখে।'

'ওদের সেফে?'

'মানে?'

'ওদের সেফ বললেন। দুই মালিক একই সেফ ব্যবহার করত?'

'হ্যাঁ। একসঙ্গে থাকত ওরা। আপনার পরের প্রশ্নের জবাবটাও দিয়ে দিচ্ছি–হ্যাঁ, গর্সের টাকাপয়সা সব ডাকাতি হয়েছে। নগদ টাকা, ওয়ালেট, আর কিছু গয়নাগাটি।'

'তাহলে আপনারা ভাবছেন ঘটনাটা ডাকাতি?'

বাঁকা হাসি দিল ন্যাপ। হাসিটাও জোয়েলের মতো। দুত্তোর! 'হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট: হ্যাঁ, ভাবছিলাম, আপনি আসার আগ পর্যন্ত।

'আরেক মালিক কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ইলেনা।

'এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দিয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে।'

'এয়ারপোর্ট থেকে?'

'তার নাম নিল্ র‍্যাফ। মিয়ামিতে গেছিল ছুটে কাটাতে।'

'সে কি সন্দেহভাজন?'

'পার্টনার খুন হওয়ার সময় ছুটি কাটাতে গেলে সন্দেহ করব না?'

'তা ঠিক,' সায় দিল ইলেনা। 'গর্সের সঙ্গে নগদ টাকা কত ছিল, ধারণা আছে?'

'না, এখনো জানা যায়নি। শুধু জানতে পেরেছি, কোনো কোনো দিন কয়েক হাজার ডলারও আয় হয়–আবার কোনো কোনো দিন বলতে গেলে কিছুই আসে না। নির্ভর করে কজন খদ্দের প্লাস্টিক ব্যবহার করেছে, তার ওপর।'

মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা চিহ্নিত করার জন্যে চক দিয়ে কোনো আঁকিবুঁকি নেই। তবে ন্যাপের কাছে অপরাধস্থলের ছবি আছে। কয়েক মুহূর্ত ওগুলো দেখল ইলেনা।

'আপনার কি ধারণা, খুনি প্রথমে ডাকাতি করে তারপর গুলি করেছে?' ছবি দেখা শেষ হলে বলল ও। 'নাকি আগে গুলি করে তারপর ডাকাতি করেছে?'

'আগে গুলি করেছে,' জবাব দিল ন্যাপ।

'নিশ্চিত মনে হচ্ছে আপনাকে।'

'ছবিতে গর্সের পকেট দেখুন।'

দেখল ইলেনা, তারপর মাথা দোলাল। 'ওল্টানো।'

'শার্টের ইনও খুলে ফেলেছে। কাপড়ের ভাঁজ দেখে বোঝা যায়, কেউ জোর করে খুলেছে ওটা।'

এবার ব্যাপারটা লক্ষ করল ইলেনা। 'শ্যুটার দাঁড়িয়েছিল কোথায়?'

জায়গাটা ওকে দেখাল ন্যাপ। 'অকুস্থলে আসা প্রথম পুলিশ জানিয়েছে, খুনি গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে সরাসরি গুলি করে অথবা গাড়ি পার্ক করে শিকারের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে।'

'থিয়োরিটা বিশ্বাস হয়নি আপনার?'

'ঘটনা হয়তো তা-ই ঘটেছে,' ন্যাপ বলল। 'কিন্তু আমার ধারণা, শ্যুটার বেরিয়েছে গাছপালার আড়াল থেকে। অ্যাঙ্গেলটা দেখুন।'

মাথা দোলাল ইলেনা।

'এমনও হতে পারে, খুনি বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসে গাড়ি পার্ক করে,' বলে চলল ন্যাপ। 'তারপর গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তবে আমার তা মনে হয় না।'

'কেন?'

'কারণ গুলি করার সময় এখানে মাত্র একজন মানুষ উপস্থিত ছিল–দ্বিতীয় ভিক্টিম, রায়ান বেইলি। তার গাড়ি নেই। মল থেকে বাস ধরে বাড়ি ফেরে সে।'

চারপাশে চোখ বোলাল ইলেনা। 'সাহায্যের জন্যে প্রথম যারা এখানে আসে, তারা কি গর্সের গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি দেখেছিল পার্কিং লটে?'

'নাহ,' জবাব দিল ন্যাপ। 'খালি ছিল পুরো লট।'

পিঠ টানটান করে সিধে হয়ে দাঁড়াল ইলেনা। 'তাহলে কেউ যদি–ধরি, খুনিই–লটে গাড়ি পার্ক করত, তাহলে বের হওয়ার সময় ওটা দেখতে পেত গর্স।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ন্যাপ। 'ডেমিয়েন গর্স দোকানমালিক। দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। এমন সময় অপরিচিত কোনো গাড়ি যদি তার লটে

এসে দাঁড়ায়, আমার ধারণা, বেরিয়ে এসে ওটার ব্যাপারে খোঁজ নিত সে। যাকগে, আশপাশের সবগুলো সিসিটিভি ফুটেজ দেখব আমরা।'

'শুনলাম, ভিক্টিমদের একজন নাকি নাইন-ওয়ান-ওয়ানে কল করেছিল।'

'রায়ান বেইলি। দ্বিতীয় ভিক্টিম।'

'কী বলেছিল সে ফোন করে?'

'কিচ্ছু না।'

'কিচ্ছু না?'

ইলেনাকে নিজের ধারণা শোনাল ন্যাপ। খুনি ডেমিয়েন গর্সকে ফোর্ড ফিউশনের পাশে গুলি করে। তারপর তার পকেট হাতড়ে টাকাপয়সা, মানিব্যাগ, হাত থেকে ঘড়ি নিয়ে নেয়। এরপর গর্সের গয়নাগাটি খুলে নেয়ার সময় খুলে যায় দোকানের দরজা, বাইরে বেরিয়ে আসে রায়ান বেইলি। ঘটনা দেখে দৌড়ে ভেতরে চলে যায় বেইলি, অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়, তারপর লুকিয়ে পড়ে ক্লজিটের ভেতরে।

ওর তত্ত্ব শুনে ভুরু কোঁচকাল ইলেনা।

'কী হলো?' জানতে চাইল ন্যাপ।

'ট্যাটু পার্লারের ভেতরে অ্যালার্ম ছিল?'

মাথা দোলাল ন্যাপ। 'পেছনের দরজার ঠিক পাশেই প্যানিক বাটন।'

'সাইলেন্ট অ্যালার্ম?' জানতে চাইল ইলেনা।

'না।'

'লাউড?'

'হ্যাঁ। প্রচণ্ড চড়া আওয়াজ।'

আবারও ভ্রু কোঁচকাল ইলেনা।

'কী?'

'দেখান তো,' বলল সে।

'কী দেখাব?'

'রায়ান যে ক্লজিটে লুকিয়েছিল।'

কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল ন্যাপ। তারপর একজোড়া ক্রাইম-সিন গ্লাভস গুঁজে দিল ওর হাতে। দস্তানা পরে নিয়ে ট্যাটু পার্লারের পেছনের দিকে রওনা দিল দুজনে।

'ময়লার ব্যাগ,' মাটিতে পড়ে থাকা একটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল ন্যাপ। 'ময়লার বিনে ওটা ফেলতে বেরিয়েছিল বেইলি।'

'তখনই ওর কারণে বাধা পায় ডাকাত?'

'আমাদের তা-ই ধারণা।'

আরেকজন পুলিশ ওদের হাতে একটা করে সদা ক্রাইম-সিন স্যুট ধরিয়ে দিল। ওটা পরে নিল ইলেনা। আপাদমস্তক সাদা স্যুটে ঢাকা ওদের দুজনকে

দেখাচ্ছে দুটো দৈত্যাকার শুক্রাণুর মতো। সাদা কাপড় পরা আরো কয়েকজন টেকনিশিয়ান আছে ভেতরে। ক্লজিটটা পেছনের দরজার লাগোয়া।

আরো একবার ভুরু কোঁচকাল ইলেনা।

'কী?'

'ব্যাপারটা বেখাপ্পা।'

'কেন?'

'আপনাদের ধারণা, ময়লা ফেলার জন্যে বাইরে এসেছিল রায়ান বেইলি?'

'হ্যাঁ।'

'গর্সের টাকাপয়সা লুট করতে দেখে ফেলে সে খুনিকে।'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে, খুনি জানত না যে ভেতরে ছেলেটা আছে।'

'হয়তো তা-ই। কিন্তু তাতে কী?'

'তার মানে রায়ান বেইলি বাইরে বেরোল, খুনিকে দেখল। তারপর দৌড়ে দোকানে ফিরে এসে অ্যালার্ম বাজিয়ে দিল। এরপর লুকিয়ে পড়ল ক্লজিটের ভেতরে।'

'হ্যাঁ।'

'এদিকে খুনির পালানোর তাড়া ছিল। ঠিক?'

'ঠিক।'

'অথচ বেইলির পিছু নিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল সে। ছেলেটার খোঁজে ঘুরতে লাগল দোকানের ভেতরে। পুরোটা সময় অ্যালার্ম বাজছিল গলা ফাটিয়ে।'

'হ্যাঁ। তো?'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল ইলেনা।

'কেন মানে কী? বুঝতে পারছেন না, খুনির চেহারা দেখে ফেলেছিল রায়ান বেইলি? পরে তাকে শনাক্ত করতে পারত সে।'

'সেজন্য তাকে চিরতরে চুপ করিয়ে দেবে বলে ঠিক করল খুনি?'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা তাহলে পেশাদার কোনো ডাকাতের না,' বলল ইলেনা।

'কী করে বুঝলেন?'

'এমন কোনো পেশাদার ডাকাতকে চেনেন যে এসব কাজ করার সময় স্কি মাস্ক পরে না বা ছদ্মবেশ নেয় না? অ্যালার্ম বেজে ওঠার সাথে সাথে চম্পট দেয় পেশাদার ডাকাত। ছেলেটা কী বলতে পারত আমাদের? স্কি মাস্ক পরা একটা লোক ওর বস্‌কে খুন করেছে, এই তো? এর বেশি কিছু না। রায়ান বেইলিকে খুন করার একমাত্র কারণ হচ্ছে খুনিকে সে শনাক্ত করতে পারত।'

মাথা দোলাল ন্যাপ। 'অথবা খুনি তার পরিচিত।'

'দুটোই হতে পারে,' ইলেনা বলল। 'আমার কেসের সাথে ব্যাপারটা মিলছে বলে মনে হয় না। আমি যার পিছে লেগেছি সে পেশাদার। মাস্ক ব্যবহার করবে সে।'

'আপনার কেসটা কী?'

তখনই কাউন্টারের ওপর কম্পিউটারটা দেখতে পেল ইলেনা। হেনরি থর্পের সঙ্গে কার কার যোগাযোগ ছিল, জানে না সে। শুধু জানে যোগাযোগগুলো যে আইপি অ্যাড্রেস আর ওয়াইফাই থেকে হয়েছে, সেটা এই বিল্ডিঙের।

ন্যাপের দিকে ফিরল সে। 'কম্পিউটারটা দেখতে পারি?'

১৭

‘প্রাইভেট ক্লাব’টার কোনার দিকের একটা বুথে আরাম করে বসে আছে এনিড কর্ভাল আর সাইমন গ্রিন।

সাইমন ইতিমধ্যে বেশিরভাগ ব্যাপারই আন্দাজ করে নিয়েছে। অ্যারনের মায়ের ব্যাপারে না–এই ক্লাবটার ব্যাপারে। বেআইনি কিছু একটা বিক্রি করা হয় এখানে। খুব সম্ভব ড্রাগ। এটা একটা প্রাইভেট ক্লাব। এখানকার নিয়মকানুন আলাদা। ইনটা মহিলার প্রকাশ্য চেহারা, এই ক্লাব ভেতরের। এখান থেকে মোটা টাকা রোজগার হয় তার। সেই টাকার পুরোটাই সম্ভবত ইন থেকে আয় হয়েছে বলে দেখানো হয়।

সাইমনের অনুমান অবশ্য ভুলও হতে পারে। তবে যতক্ষণ দরকার না পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই তত্ত্ব নিয়ে মুখ খুলবে না সে। তবে তত্ত্বটা ওর কাছে ঠিকই মনে হচ্ছে।

‘আমার আর উইলির দাম্পত্যজীবন অনেকটাই সেকেলে ধাঁচের,’ বলল এনিড, পরক্ষণেই মাথা নাড়ল। ‘এসব তোমাকে বলছি কেন, জানি না। বুড়িয়ে যাচ্ছি বোধহয়। অ্যারনও মারা গেল। তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছিলে, মি. গ্রিন।’

‘সাইমন ডেকো।’

‘মি. গ্রিন ডাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি।’

‘কোন্ ব্যাপারে ঠিক বলেছিলাম?’

হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল এনিড। ‘হয়তো এই সবকিছুই একটা আরেকটার সাথে জড়িত। অতীতের ব্যাপারগুলো। আর এখনকারগুলো। আমি কে এসব বলার?’

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সাইমন। বেশিক্ষণ ওকে অপেক্ষা করাল না ওকে মহিলা।

'আমি এখানকার মানুষ না। বড় হয়েছি মন্টানার বিলিংস-এ। তারপর কানেক্টিকাটের এই অঞ্চলে কীভাবে এলাম, সেই গল্প তোমার না শুনলেও চলবে। জীবন উড়িয়ে এনে ফেলেছে আরকি। যাহোক, উইলির সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন ওর উনিশ বছর বয়সি একটা ছেলে আছে–নাম অ্যারন। অনেক মহিলার কাছেই সিঙ্গেল-ফাদারের ব্যাপারটা খুব আকর্ষণীয় লাগে। ছেলেকে একা একা বড় করছে একটা মানুষ, ছবির মতো সুন্দর ইন আর ফার্ম...এসবই খুব মিষ্টি লাগে ওদের কাছে। উইলিকে ওর ছেলে আর বউ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব পাওয়া যেত না–ভদ্রভাবে প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে যেত সে। এ ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করত না। প্রসঙ্গটা উঠলেই ওর চোখে পানি চলে আসত। এমনকি আমার সাথেও।

'তবে ও বলার আগেই গল্পটা শুনেছি আমি। এখানকার সবাই-ই গল্পটার কিছু কিছু জানত। ইন নিয়ে যখন হতাশ হয়ে পড়ে, তখনই অ্যারনের মায়ের সাথে দেখা হয় উইলির। এখানে বেড়ে ওঠা আর সবার মতোই দূরে কোথাও চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল উইলির। সেজন্যে ইউরোপভ্রমণ শুরু করে ও। ইটালিতে দেখা হয় ব্রুনা নামের এক মেয়ের সঙ্গে। জাতে টাস্কানি। কয়েকদিন একসাথে একটা আঙুরখেতে কাজ করেছিল দুজনে। ওখানকার কাজের সাথে নাকি ইনের কাজের খানিকটা মিল ছিল। সেজন্যে ইনের কথা মনে পড়ে যায় উইলির। বাড়ির জন্যেও মন কেমন কেমন করতে থাকে নাকি।' ইশারায় মদের ক্যান দেখাল এনিড। 'তুমি কিন্তু বিয়ার খাচ্ছ না।'

'গাড়ি চালাতে হবে আমাকে।'

'দুটো বিয়ার খেলে কোনো সমস্যা হবে না।'

অন্যদের সমস্যা না হলেও, সাইমনের হয়। ইনগ্রিডকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিয়ার গিলে একদম স্বাভাবিক থাকতে দেখেছে সে। অথচ দুটো বিয়ার গিললেই মাথা এলোমেলো হয়ে যায় ওর।

'যাকগে, এরপর কী হলো?'

'কী আর হবে, প্রেমে পড়ল ওরা। উইলি আর ব্রুনা। রোমান্টিক ব্যাপার, না? একটা ছেলে হলো ওদের। অ্যারন। মিষ্টি গল্প। সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল ওরা...যতদিন পর্যন্ত না ব্রুনা মারা গেল।'

'মারা গেছে?'

স্থাণু হয়ে বসে রইল এনিড, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া নেই।

'কীভাবে?' জানতে চাইল সাইমন।

'গাড়ি দুর্ঘটনায়। অটোস্ট্রাডা এ১১ মডেলের গাড়ি ছিল। উইলি বলেছে, বাপের বাড়িতে যাচ্ছিল ব্রুনা। ওর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। ব্রুনা যাওয়ার আগে এ নিয়ে ঝগড়া হয় দুজনের। গাড়িতে ওর সঙ্গে উইলিরও থাকার কথা ছিল। সেজন্যে নিজেকে দোষ দেয় ও। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলেই মনমরা হয়ে পড়ে।'

মদের গ্লাসের ওপর দিয়ে সাইমনের দিকে চাইল মহিলা।

'তোমার কথায় সন্দেহের সুর শুনতে পাচ্ছি,' বলল সাইমন।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'উইলি খুব রসিয়ে রসিয়ে বলে গল্পটা। খুব নাটুকে মানুষ আমার স্বামী। ওর প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস হবে তোমার।'

'তোমার হয়নি?'

'হয়েছে। কিন্তু আরেকটা চিন্তাও খোঁচা মেরেছে আমাকে–বাপের বাড়িতে যাওয়ার সময় দুধের বাচ্চাকে সঙ্গে নেবে না কেন ব্রুনা? তুমি হলে তো নিতে, ঠিক না? সবে মা হয়েছে, "অটোস্ট্রাডা"য় করে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, এমন অবস্থায় তো যে-কেউ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে রওনা হবে।'

'উইলিকে প্রশ্ন করেছিলে এ ব্যাপারে?'

'নাহ, আমি কখনো কিছু বলিনি। মানে, বলবই বা কেন? কে-ই বা এমন একটা গল্পকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে?'

ভারী বাতাসে কেমন একটা গাম্ভীর্য ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে সাইমনের, কিন্তু সে চায় এনিড নিজে থেকেই বলুক সব কথা। তাই কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল।

'অ্যাকসিডেন্টের পর বাড়ি ফিরে আসে উইলি। মানে, ইনে আরকি। ও ভয় পাচ্ছিল, বাচ্চার অভিভাবকত্বের জন্যে ওর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে ব্রুনার পরিবার। ওরা কিন্তু আইনসম্মত উপায়ে বিয়ে করেনি। তাই ভয়ে ছেলেকে নিয়ে দেশে চলে আসে উইলি। ইনে এসে ওঠে...'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা শেষ করল এনিড।

কাহিনি খতম।

'অ্যারনের মা তাহলে মৃত,' অস্ফুটে বলল সাইমন।

'উইলি তা-ই বলে।'

'কিন্তু তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম সে বেঁচে আছে কি না, তুমি বলেছিলে জানো না।'

'তুমি খুব চালাক লোক, মি. গ্রিন।' নিজের গ্লাস উঁচিয়ে হাসল মহিলা। 'আচ্ছা, তোমাকে এসব শোনাচ্ছি কেন বলো তো?'

স্থির চোখে সাইমনের দিকে চেয়ে রইল সে, উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'কারণ আমার চেহারায় একটা সৎ-সৎ ভাব আছে?' জবাব দেয়ার চেষ্টা করল সে।

'তোমার চেহারা আমার প্রথম স্বামীর মতো।'

'ও কি সৎ ছিল?'

'ধুর! নাহ।' পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল এনিডের চেহারা। 'কিন্তু বিছানায় ও দারুণ ছিল।'

'তাহলে একটা মিল আছে আমাদের দুজনের মধ্যে।'

খুকখুক করে হাসল এনিড। 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, মি. গ্রিন। আর...ব্যাপারটা তোমার কোনো কাজে লাগবে কি না জানি না। ...অনেক অদ্ভুত রকমের খারাপ খারাপ জিনিস দেখেছি আমি। আর খারাপ কাজ বা জিনিস কখনো মুছে যায় না, কোনো-না-কোনো সময় আবার ভেসে ওঠেই। কুকর্মকে তুমি যতই মাটিচাপা দাও, একসময় আপনাআপনিই ভেসে উঠবে ওটা। সমুদ্রের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও ঢেউয়ের সাথে তীরে ফিরে আসবে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে সাইমন।

'তোমার পুরনো পাসপোর্ট জমিয়ে রাখো?' জিজ্ঞেস করল এনিড। 'মানে, মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরও রেখে দাও ওগুলো?'

'হ্যাঁ।'

সত্যি বলতে কী, সাইমন নিজেও ওর মক্কেলদের এ কাজ করার পরামর্শ দেয়। যদি কখনো কোনো জায়গার থাকার প্রমাণের দরকার হয়, তাহলে ওগুলো খুব কাজে দেয়। সব ধরনের কাগজপত্র জমিয়ে রাখে সে–কারণ কোন্‌টা যে কখন কাজে লেগে যায় কে জানে!

'উইলিও রাখে। খুব যত্ন করে রাখে মানুষের নাগালের বাইরে। বেজমেন্টের ভাঁড়ারে বাক্সের মধ্যে খুব সাবধানে ওগুলো লুকিয়ে রেখেছিল ও। কিন্তু আমি খুঁজে বের করে ফেলেছিলাম। কী পেয়েছিলাম জানো?'

'কী?'

মুখের একপাশে হাত রাখল এনিড, তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'উইলি কখনো ইটালি যায়নি।'

***

ট্যাটুস হোয়াইল ইউ ওয়েট-এর অফিসটা কাচে ঘেরা। তাই ভেতরে বসেই খদ্দেরদের আসা-যাওয়া, শিল্পীদের উল্কি আঁকা, অপেক্ষারত খদ্দেরদের দেখা যায়। আবার বাইরে থেকেও অফিসের ভেতরটা দেখা যায়। অফিসের কম্পিউটারের পর্দা একপাশের দেয়ালের দিকে ঘোরানো বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না ভেতরের মানুষটা কম্পিউটারে কী কাজ করছে।

ডেস্কটা এমনভাবে বানানো যে, দুজন মানুষ মুখোমুখি বসতে পারে ওতে। ডেস্কের ওপরে একগাদা কাগজপত্র পড়ে রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তিন জোড়া রিডিং গ্লাস এবং ডজনখানেক কলম আর মার্কারও রয়েছে। বামপাশে একটা ব্যাগে কিছু পেপারব্যাক বই আর কিছু বিলের কাগজ রাখা।

(1,1) -74- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:34

ডেস্কের ঠিক মাঝখানে, কাচের দিকে মুখ করে একটা ছবি রাখা–ছয়জন মানুষের, সবার মুখে চওড়া হাসি। ছবিটা খানিকটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। দুজন লোক সামনে, একজন আরেকজনের কাঁধে হাত রাখা–বাকি চারজন পেছনে দাঁড়িয়ে, বুকের কাছে হাত ভাঁজ করা। পার্লারের সামনে তোলা হয়েছিল ছবিটা–লাল ফিতা আর বেঢপ কাঁচি দেখে বোঝা যাচ্ছে, উদ্বোধনের দিনে। লোকগুলোর কাপড়চোপড়, চুল, আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে ডুবি ব্রাদার্সের অ্যালবামের কভারের কথা মনে পড়ে যায়।

ছবিটা তুলে ন্যাপকে দেখাল ইলেনা। মাথা দুলিয়ে সামনে দাঁড়ানো ডানের লোকটার দিকে ইশারা করল ন্যাপ।

'ও-ই ভিক্টিম। ডেমিয়েন গর্স।'

এরপর গর্সের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখাল সে আঙুল তুলে। দশাসই লোকটার পরনে মোটরসাইকেলে চড়ার পোশাক, নাকের নিচে পেল্লাই গোঁফ। 'ওটা ওর পার্টনার, নিল্ র‍্যাফ।'

কম্পিউটারের সামনে রাখা সুইভেল চেয়ারে বসে পড়ল ইলেনা। লালরঙা কম্পিউটারের মাউসটা দেখতে হৃদয় আকৃতির। কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে ওটার দিকে চেয়ে রইল ইলেনা। হৃৎপিণ্ড। ডেমিয়েন গর্সের কম্পিউটারের মাউস দেখতে হৃদয়াকৃতির। তদন্তকারী হিসেবে ওর কাজ মাথা নিচু করে যুক্তি খাটিয়ে চিন্তা করা। বেশিরভাগ সময় এতেই কাজ হয়। ইলেনার লক্ষ্য এখন একটাই হওয়া উচিত–হেনরি থর্পকে খুঁজে বের করা। কিন্তু জোয়েল সবসময়ই ওকে বলত ধ্বংসযজ্ঞ, হারানো প্রাণ আর জিনিসের কথা যেন ভুলে না যায়। ডেমিয়েন গর্স এই চেয়ারে বসে হৃৎপিণ্ডের মতো দেখতে এই মাউসটা দিয়ে কাজ করত। এই হৃদয়াকার মাউসটা কারো উপহার, এ কথা ইলেনা হলফ করে বলতে পারে। এ ধরনের জিনিস কেউ কখনো নিজের জন্যে কেনে না। যে মানুষটা এই মাউস উপহার দিয়েছিল সে চাইত ডেমিয়েন জানুক যে তাকে উপহারদাতা বা দাত্রী ভালোবাসে।

'এসব আবেগের নিচে কখনো চাপা পোড়ো না,' জোয়েল বলত ইলেনাকে। 'বরং এসব আবেগকে শক্তি বানিয়ে কাজ কোরো।'

মাউস স্পর্শ করতেই আলোকিত হয়ে উঠল কম্পিউটারের পর্দা। ডেমিয়েন গর্স আর নিল্ র‍্যাফের একটা ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে–তাদের মাঝখানে একজন বয়স্ক মহিলা। একটা সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনে, মুখে ঝলমলে হাসি।

পর্দার ঠিক মাঝখানে একটা বক্স ভেসে উঠেছে–পাসওয়ার্ড চাইছে তাতে। ন্যাপের দিকে মুখ তুলে তাকাল ইলেনা, যেন সব মুশকিলের আসান আছে লোকটার হাতে। কিন্তু ওকে হতাশ করে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা–জানে না। গোটা কম্পিউটারে নানা রকম 'পোস্ট-ইট' নোট আছে। ওগুলোর ওপর

চোখ বোলাল ইলেনা পাসওয়ার্ডের ব্যাপারে ধারণা পাওয়ার জন্যে। কিন্তু ফায়দা হলো না কোনো। ডেস্কের ড্রয়ার খুলল সে। কিচ্ছু পেল না।

'পাসওয়ার্ডটা ভাঙার মতো লোক নেই তোমাদের?' ন্যাপকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আছে, কিন্তু এখানে নেই ও।'

এমন সময় ঝটকা মেরে খুলে গেল সামনের দরজা। ঝড়ের বেগে একটা লোক ঢুকল ভেতরে। লোকটাকে চিনতে পারল ইলেনা–এক মুহূর্ত আগেই ছবিতে দেখেছে–নিল্ র‍্যাফ। পরনে ডেনিম, গোঁফ এখন আগের চেয়ে ছোট। তবে ছবির সাথে বাস্তবের চেহারার খুব একটা তফাত নেই। বিহ্বল চেহারায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা, যেন এই প্রথম দেখছে নিজের দোকান, টকটকে লাল চোখ দুটো ফোলা ফোলা। কান্নাকাটি করেছে।

তড়িঘড়ি করে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ন্যাপ। সাক্ষীগোপালের ভূমিকা নিল ইলেনা। লোকটার কাঁধে হাত রেখে গলা নামিয়ে কোমল স্বরে কথা বলতে লাগল ডিটেকটিভ। এই জায়গাতেও কোথায় যেন জোয়েলের সাথে মিল আছে লোকটার। জোয়েলকে বড্ড মনে পড়ে ইলেনার। ওর সাথে হওয়া কথাবার্তা, ঘোরাফেরা–সবকিছু। স্বীকার করতে না চাইলেও, জোয়েলের সঙ্গে বিছানায় প্রেম করাটা সবচেয়ে উপভোগ করত ও। তার সঙ্গে থাকলে সব বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ মনে হতো নিজেকে।

গর্স আর র‍্যাফের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এসব ভাবছে ইলেনা। খানিক আগে দোকানের দুই মালিক সম্পর্কে ন্যাপ কী বলেছে, তা-ও মনে পড়ল ওর। সারাদিনে আয় হওয়া টাকা বাড়িতে নিয়ে যেত ওরা। ওদের সেফে রাখত। সব হারানোর বেদনা দেখতে পাচ্ছে ইলেনা নিল্ র‍্যাফের চেহারায়। বন্ধু কিংবা ব্যবসার অংশীদার হারানোর চেয়েও জীবনসঙ্গী হারানোর অসহ্য যন্ত্রণা বেশি প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে লোকটার চেহারায়।

ইলেনার অনুমান ভুল হতে পারে, কিন্তু সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

খদ্দেররা যেখানে অপেক্ষা করে, ওখানকার একটা চামড়ার কাউচে র‍্যাফকে বসিয়ে দিল ন্যাপ। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিজেও বসে পড়ল শোকার্ত মানুষটার সামনে। তার হাতে একটা নোটপ্যাড, তবে ভাবভঙ্গি থেকে সমবেদনার ছাপ মুছে ফেলতে রাজি নয়। তাই কোনো নোট নিচ্ছে না সে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ইলেনা। এছাড়া আর কিছু করার নেইও।

আধঘণ্টা বাদে, কয়েকটা সান্ত্বনার বাণী দেয়ার পর, আবার হৃদয়াকৃতির মাউসটায় নাড়া দিল ইলেনা। আবার সেই ছবিটা ফুটে উঠল পর্দায়।

'ওহ, ঈশ্বর!' গুঙিয়ে উঠে ন্যাপের দিকে ফিরল র‍্যাফ। 'ক্যারিকে খবরটা জানানো হয়েছে?'

'ক্যারি?'

'ডেমিয়েনের মা। ওহ, ঈশ্বর! ও তো একেবারে ভেঙে পড়বে।'

'ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে?'

'ওকে একটা কল করতে দিন।'

জবাবে কিছু বলল না ন্যাপ।

র‍্যাফ বলল, 'ও এখন স্কটসডেলের একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। নিজের। ডেমিয়েন ছাড়া আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই ওর।'

'ডেমিয়েনের কোনো ভাইবোন নেই?' জানতে চাইল ন্যাপ।

'নাহ। ক্যারির সন্তান নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। ডেমিয়েনকে দত্তক নিয়েছিল ও।'

'ওর বাবা?'

'ওর বয়স যখন তিন, তখন ডিভোর্স হয়ে যায় ওর বাবা-মার।'

কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠা বক্সটার দিকে ইশারা করল ইলেনা। 'ডেমিয়েনের পাসওয়ার্ড জানেন?'

চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল র‍্যাফ। 'নিশ্চয়ই জানি।'

'পাসওয়ার্ডটা বলতে পারেন?'

আরো কয়েকবার চোখ পিটপিট করল লোকটা। অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে দুই চোখ। 'গুয়ানাকাস্ট।' বানান করে বলে দিল তারপর। 'কোস্টারিকার একটা প্রদেশ।'

'ওহ।' বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেল না ইলেনা।

'আ...আমরা ওখানে হানিমুনে গিয়েছিলাম। ওটা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।'

পাসওয়ার্ডটা লিখে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল ইলেনা।

'কী খুঁজছেন?' জানতে চাইল র‍্যাফ।

'কম্পিউটারটা ডেমিয়েনের ছিল?'

'হ্যাঁ, আমাদের।'

'আপনাদের নেটওয়ার্কে আর কোনো কম্পিউটার আছে?' জিজ্ঞেস করল ইলেনা।

'না।'

'ক্লায়েন্টরা আপনাদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে?'

'না। আমাদের নেটওয়ার্কে পাসওয়ার্ড দেয়া।'

'এই একটাই কম্পিউটার আপনাদের?'

'হ্যাঁ। আমরা দুজনেই এতে কাজ করতাম। অবশ্য আমি এসব জিনিস ভালো বুঝি না। মাঝে মাঝে আমি কম্পিউটারে বসে কাজ করতাম। ডেমিয়েন তখন ডেস্কের অপরপাশে বসত। কিন্তু বেশিরভাগ সময় ডেমিয়েনই কাজ করতে এতে।'

ইলেনাও প্রযুক্তির ব্যাপারস্যাপার খুব ভালো বোঝে না–সেজন্যেই লু-কে রেখেছে ওর ফার্ম–তবে কাজ চালাবার মতো মৌলিক জ্ঞান আছে। ব্রাউজার

খুলে হিস্ট্রি দেখতে লাগল সে। গত পাঁচ দিন মিয়ামিতে ছিল নিল্ র‍্যাফ। কাজেই ব্রাউজারের সাম্প্রতিক সব সার্ফিং ডেমিয়েনের করা হবে।

'আপনি কী খুঁজছেন এখনো বুঝতে পারছি না আমি,' অনুযোগের সুরে বলল র‍্যাফ।

অনেকগুলো ইমেজ সার্চ করা হয়েছে। কয়েকটা ক্লিক করে দেখল ইলেনা। স্বাভাবিকভাবেই, সবগুলোই ট্যাটুর ছবি–হরেক পদের। গোলাপের, নানা রকম কাঁটার ট্যাটু, মাথার খুলি আর নানা রকম হৃদয়ের ট্যাটু। স্টিফেন কিং-এর *ইট* বইয়ের পেনিওয়াইজ দ্য ক্লাউনের ট্যাটুও আছে একটা। আছে কয়েকটা রতিক্রিয়ার ছবিও (ট্যাটু হিসেবে এগুলো আবার আঁকায় কে?)।

'ছবি থেকে আইডিয়া নিই আমরা,' র‍্যাফ জানাল। 'ক্লায়েন্টদের এসব দেখিয়ে কাজ করি।'

ব্রাউজারের বাকি হিস্ট্রিগুলোতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। রটেন টমেটোতে ঢুকেছে ডেমিয়েন গর্স, সিনেমার টিকেট কিনেছে। মোজা আর কে-কাপ কফি পড কিনেছে অ্যামাজন থেকে। পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য বলে দেয়, এমন একটা ডিএনএ সাইটে ঢুকেছে। অমন একটা ডিএনএ টেস্ট করানোর ইচ্ছা ছিল ইলেনার। ওর মা ছিল মেক্সিকান। সে কিরে কেটে বলেছিল, ইলেনার বাবাও মেক্সিকান–কিন্তু ওর জন্মের আগেই মারা গেছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই হাস্যকর সব কথা বলত ওর মা। তাই সন্দেহ থেকেই গেছে ওর মনে।

'আমি হয়তো আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করত পারব,' আকুতির সুরে বলল র‍্যাফ।

পর্দা থেকে চোখ সরাল না ইলেনা। 'আপনি–কিংবা ডেমিয়েন–কি হেনরি থর্প নামের কাউকে চিনতেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল লোকটা। 'না, ওরকম কারো কথা মনে পড়ছে না।'

'চব্বিশ বছর বয়স ছেলেটার। শিকাগোর লোক।'

'শিকাগো?' আরো কিছুক্ষণ ভাবল র‍্যাফ। 'ওই নামের কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। ডেমিয়েনের মুখেও কখনো শুনিনি নামটা। এ কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো?'

প্রশ্নের জবাব দিল না ইলেনা, পাল্টা জানতে চাইল, 'আপনি আর ডেমিয়েন কি ইদানীং শিকাগো গিয়েছিলেন?'

'আমি একবার গিয়েছিলাম, হাই স্কুলে পড়ার সময়। ডেমিয়েন কখনো গিয়েছিল বলে মনে হয় না।'

'অ্যারন কর্ভাল নামটা শুনেছেন কখনো? কিছু মনে পড়ে?'

গোঁফে তা দিল র‍্যাফ। 'নাহ। সে-ও শিকাগোর লোক?'

'কানেক্টিকাট। কিন্তু এখন ব্রঙ্কসে থাকে।'

‘দুঃখিত, লোকটার নাম শুনিনি কখনো। কিন্তু এসব জানতে চাইছেন কেন, বলা যাবে?’

‘আপাতত আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, পরে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।’

‘বেশ। নাম দুটো কখনো শুনিনি আমি। আপনি চাইলে আমাদের কাস্টোমার ডেটাবেজে খুঁজে দেখতে পারি।’

‘দেখলে খুব ভালো হয়।’

ইলেনার কাঁধের ওপর দিয়ে কম্পিউটারে টাইপ করতে শুরু করল র‍্যাফ।

ন্যাপ বলল, ‘ক্লায়েন্টদের পুরো লিস্টটা প্রিন্ট করে দিতে পারবেন?’

‘আপনাদের কি মনে হয় আমাদের কোনো ক্লায়েন্ট...?’

‘স্রেফ সবগুলো সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছি, আর কিছু না,’ বলল ন্যাপ।

‘থর্প বানান কী?’ ইলেনাকে জিজ্ঞেস করল র‍্যাফ।

বলল সে। কিন্তু ওই নামের কাউকে পাওয়া গেল না। অ্যারন কর্ভালও পেল না।

‘এরা কে?’ কাজ শেষ করে জানতে চাইল র‍্যাফ। ‘ডেমিয়েনের সাথে এদের কী সম্পর্ক?’

‘আপনি বলেছেন, এই আইপি আর ওয়াইফাই শুধু আপনি আর মি. গর্সই ব্যবহার করতেন। ঠিক?’

‘হ্যাঁ। তো?’

‘টেকনিক্যাল ব্যাখ্যা চাইবেন না। দিতে পারব না,’ বলল ইলেনা। ‘তবে এই কম্পিউটারের আইপি ব্যবহার করে, এমন কেউ যোগাযোগ করেছিল হেনরি থর্পের সঙ্গে।’

‘মানে?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল র‍্যাফ। ন্যাপ চুপচাপ শুনছে।

‘মানে তো বললামই। এই কম্পিউটার ব্যবহার করে, এমন কেউ যোগাযোগ করেছিল হেনরি থর্পের সঙ্গে।’

‘তো? এই থর্প লোকটা কোনো কালি-বিক্রেতাও তো হতে পারে।’

‘উঁহু।’ কড়া চোখে র‍্যাফের দিকে তাকিয়ে রইল ইলেনা।

‘ডেমিয়েন আমার কাছ থেকে কিছু লুকাত না,’ বলল লোকটা।

লুকাত না। অতীতকাল।

‘আমাদের কম্পিউটার হয়তো হ্যাক হয়েছিল।’

‘ওরকম কিছু হয়নি, নিল্।’

‘কী বলতে চাইছেন আপনি?’

‘আমি কিছু বলতে চাইছি না। জানতে চাইছি।’

‘ডেমিয়েন আমার সাথে প্রতারণা করবে না।’

ডেমিয়েন গর্সের সঙ্গে কি হেনরি থর্পের কোনো ধরনের প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল? সমকামী ছিল হেনরি থর্প?

কিন্তু তা যদি হয়ও–অর্থাৎ ডেমিয়েন আর হেনরির মধ্যে যদি প্রেম থাকেও–এসবের মধ্যে অ্যারন কর্ভাল এল কোত্থেকে? পেইজ গ্রিন তার প্রেমিকা ছিল না তাহলে? এসব কি এক সুতোয় গাঁথা? এই কেসের কেন্দ্রে কি এমন কোনো প্রণয়ঘটিত জটিলতা আছে যা নিয়ে এখনো ভাবেনি ইলেনা?

ওর কাঁধে টোকা দিল ন্যাপ। 'আপানার সাথে একা একটু কথা বলা যাবে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইলেনা। এক হাত রাখল র‍্যাফের কাঁধে। 'মি. র‍্যাফ, আমি কিছু বলতে বা ইঙ্গিত করতে চাইছি না। সত্যি বলছি। খুনটা যে করেছে তাকে খুঁজে বের করার জন্য সাহায্য করার চেষ্টা করছি।'

মাথা দোলাল লোকটা।

পেছনের দরজার দিকে এগোল ন্যাপ। তার পিছু নিল ইলেনা। 'কী ব্যাপার?'

'অ্যারন কর্ভাল।'

'ওর কী হলো?'

'গুগল করার কাজটা কঠিন না,' ন্যাপ বলল। 'কয়েকদিন আগেই খুন হয়েছে লোকটা।'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'এখন বলুন তো, ঠিক কী হচ্ছে?'

১৮

কর্ভাল ইন ও ফ্যামিলি ট্রি ফার্মে ফিরে এল সাইমন।

কোনো লাভই হয়নি এখানে এসে–কিচ্ছু জানতে পারেনি। হাসপাতালে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে ওর–কিন্তু ওখানে গিয়েও কোনো ফায়দা নেই। অগত্যা ইনের পার্কিং লটে ঢুকে আগের জায়গাতেই গাড়ি পার্ক করল।

ইনের ভেতরটা নিস্তব্ধ। অ্যারনের মৃত্যুতে শোক জানাতে আসা মানুষগুলোকেও দেখা যাচ্ছে না–শোকসভা বোধহয় শেষ। একটা পরিচিত চেহারা দেখার আশায় চারদিকে চোখ বোলাল সাইমন, কিন্তু শেষকৃত্যে আসা একজনকেও চোখে পড়ল না। পরিচিত মুখ বলতে ডেস্কে বসা ডোরাকাটা ব্লাউজ পরা সেই মহিলাকেই চোখে পড়ল কেবল। নতুন একটা ম্যাপ বিছিয়ে বসেছে সে ডেস্কের ওপর। তরুণ এক যুগলকে রাস্তা চেনাচ্ছে।

চোখের কোণ দিয়ে সাইমনকে দেখতে পেল মহিলা। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ওকে দেখে মোটেই খুশি হয়নি সে। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে সাইমন। ডানপাশে একটা সিঁড়ি দেখতে পেল। ওটা টপকে ওপরে যাবে কি না ভাবল একবার–কিন্তু তাতে কী লাভ? ওর পেছনে একটা কাচের দরজা।

অ্যারনের শোকসভা বোধহয় দরজার ওপাশের রুমে হচ্ছে।

ওদিকে এগোতেই ডেস্কে বসা মহিলা পেছন থেকে বলে উঠল, ‘এক্সকিউজ মি, ওটা ব্যক্তিগত রুম।’

তার কথা কানেই তুলল না সাইমন। দরজার সামনে পৌঁছে নব ঘোরাল, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ঘরটায় আসলেই কোনো ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। কামরার ঠিক মাঝখানে, দাগপড়া সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা একটা টেবিলে আধখাওয়া স্যান্ডউইচ আর সবজির টুকরো পড়ে রয়েছে। ডানপাশে

ছোট ছোট ড্রয়ারঅলা একটা রাইটিং ডেস্ক দেখতে পেল সাইমন। আগন্তুককে দেখতে পেয়ে ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াল উইলি কর্ভাল।

'তুমি এখানে কী করছ?'

বাইরের ডেস্কে বসা মহিলা হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকেছে সাইমনের পিছু নিয়ে। 'আমি দুঃখিত, উইলি।'

'কোনো সমস্যা নেই, বার্নাডেট।'

'তুমি শিয়োর?'

'হ্যাঁ। দরজা বন্ধ করে দাও। অতিথিদের দিকে খেয়াল রেখো, প্লিজ।'

সাইমনের উদ্দেশে বিষদৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে লবিতে ফিরে গেল মহিলা। প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি জোরে দরজা লাগাল।

'কী চাও?' সাইমনের দিকে ফিরে হিসিয়ে উঠল উইলি কর্ভাল।

লোকটার পরনে এখন রুপার বোতাম লাগানো বাদামি রঙের হেরিংবোন টুইডের ভেস্ট। একটা বোতাম থেকে একখানা সোনার চেইন ঝুলছে। চেইনটা ভেস্টের পকেটে রাখা পকেট ওয়াচের সঙ্গে লাগানো। ভেস্টের নিচে ধবধবে সাদা শার্ট।

'আমার মেয়ে নিখোঁজ।'

'সে কথা আগেও বলেছ। ও কোথায় আছে জানি না আমি। দয়া করে এখান থেকে বিদায় হও।'

'আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

'ওসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।' বুক টানটান করে দাঁড়াল উইলি কর্ভাল। 'আজ আমি আমার ছেলের জন্য শোক পালন করছি।'

সাইমন জানে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই–তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেলল: 'সত্যি?'

বিস্ময়ের ছাপ পড়ল উইলির চেহারায়–সেটা আশা করেছিল সাইমন। তবে তার চেয়েও গভীর আবেগের প্রকাশ ঘটল লোকটার চোখেমুখে।

ভীতি।

'কী সত্যি?'

'সত্যিই কি তুমি অ্যারনের বাপ?'

'কী সব ফালতু কথা বলছ?'

'ওর সাথে তোমার চেহারার কোনো মিল নেই।'

মুখব্যাদান হয়ে গেল উইলির। 'তুমি সিরিয়াস?'

'অ্যারনের মায়ের ব্যাপারে বলো তো।'

দেখে মনে হলো, কিছু বলতে যাচ্ছে উইলি, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। এক মুহূর্ত পর অদ্ভুত একটা হাসি দেখা দিল তার চেহারায়। গা ছমছমে হাসিটা দেখে নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল সাইমন।

'আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলেছ তুমি।'

(1,1) -78- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:35

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা চিন্তা খেলে গেল সাইমনের মাথায়। এই ব্যাপারটার দিকেই বোধহয় ইঙ্গিত করছিল এনিড। কিংবা রক্ত-মাংসের উইলিকে সামনাসামনি দেখার পর হয়তো মনে পড়ে গেছে।

বিন্দুমাত্র শোকের ছায়া নেই উইলি কর্ভালের মধ্যে।

শোকপালন নিয়ে শত শত ক্লিশে কথাবার্তা বলা যায় এখন। বলা যায়, সব মানুষেরই শোকপালনের আলাদা আলাদা পদ্ধতি আছে, কাউকে কাউকে দেখে বোঝা যায় না ভেতরে কত বড় ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু ওসব কথাই অসাড়–অন্তত এই মুহূর্তে। এনিড বলেছিল, ওর স্বামী নাটুকে মানুষ। এখন কথাটার অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে সাইমন। লোকটা যা যা করেছে, তার সবই যেন একটা অভিনয়ের অংশ–এমনকি তার অনুভূতিও।

সেই ছোট্ট ছেলেটা। একটা লোকের সঙ্গে থাকত সে, যে নিজেকে তার পিতা দাবি করত।

কল্পনার ঘোড়ায় লাগাম পরানোর চেষ্টা করল সাইমন–কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই বাগ মানছে না, ছুটছে প্রাণপণে, অশুভ সব চিন্তার গলিতে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

এসব সত্যি হতে পারে না–নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল সাইমন।

তবু...

'কোর্ট অর্ডার আনব আমি।'

'কেন?' নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল উইলি, চেহারায় নিষ্পাপ ভাব।

'পিতৃত্বের জন্য।'

'সত্যি?' আবার সেই অদ্ভুত হাসি দেখা দিয়েছে উইলির মুখে। 'অ্যারনকে কবর দিয়ে ফেলেছি।'

'আরো অনেক উপায় আছে ওর ডিএনএ জোগাড় করার।'

'সন্দেহ আছে। আর, কোনোভাবে যদি ওর আর আমার ডিএনএ জোগাড় করেও ফেলো, টেস্ট করলে দেখবে আমিই ওর বাপ।'

'মিথ্যে কথা।'

'তাই নাকি?'

ব্যাপারটা উপভোগ করছে হারামজাদা–আপনমনে ভাবল সাইমন।

'ধরো, মনের খুশিতে ডিএনএ টেস্ট করেই ফেললে। ধরো, ওতে প্রমাণ হলো যে আমি অ্যারনের বাপ না। তাতে কী প্রমাণ হবে?'

কিছু বলল না সাইমন।

'ওর মা হয়তো আমার সাথে প্রতারণা করে অন্য কারো সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিল। এত বছর পর তাতে কী আসে-যায়? টেস্টে অবশ্য তা দেখাবে না–এসবই হাইপোথিটিকাল। আমি অ্যারনের বাপ। তুমি কী প্রমাণ করবে বলো তো?' সাইমনের দিকে দুই কদম এগিয়ে এল উইলি। 'ড্রাগ ডিলার ছিল

আমার ছেলে। ব্রঙ্কসে থাকত ও, তোমার নেশাখোর মেয়ের সঙ্গে। ওখানে খুন হয়েছে ও। এনিড তোমাকে যে গল্পই শোনাক না কেন, অ্যারনের ছেলেবেলার সাথে ওর খুন হওয়ার কোনো সম্পর্কে নেই।'

মানতেই হবে, লোকটার কথায় যুক্তি আছে। আপাতদৃষ্টিতে তার যুক্তির সাথে তর্ক করা চলে না। এই অশুভ ইনে একটা ছোট ছেলের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার সাথে বহু বছর পরে ব্রঙ্কসে তার খুন হয়ে যাওয়ার যোগসূত্র থাকার কোনো নিরেট প্রমাণ নেই।

তবু...

আলোচনার মোড় ঘোরাল সাইমন। 'অ্যারন নেশা করতে শুরু করে কবে থেকে?'

তেলতেলে হাসি ফিরে এসেছে উইলির চেহারায়। 'এ ব্যাপারে বোধহয় এনিডকে জিজ্ঞেস করা উচিত তোমার।'

'এখান থেকে চলে যায় কবে?'

'কে চলে যায়?'

'কাকে নিয়ে কথা বলছি আমরা? অ্যারন।'

আরেকবার হাসল উইলি। সত্যিই ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে।

'এনিড বলেনি?'

'কী বলবে?'

'অ্যারন এখান থেকে চলে যায়নি।'

'কীসের কথা বলছ?'

'এনিডের একটা জায়গা আছে। ক্লাব ধরনের।'

'তো?'

'একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে ওটার পেছনে,' উইলি বলল। 'ওখানে থাকত অ্যারন।'

'কতদিন?'

'জানি না। ওর সাথে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল আমার।'

'ল্যানফোর্ড কলেজের দিকে যায় কবে ও?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'কীসের কথা বলছ?'

'ওখানে চলে গিয়েছিল ও। পেইজের সঙ্গে যখন দেখা হয়, অ্যারন তখন একটা ক্লাবে কাজ করত বোধহয়।'

এবার সশব্দে হেসে ফেলল উইলি। 'এসব কে বলেছে তোমাকে?'

আবার গা ছমছম করে উঠল সাইমনের।

'তোমার ধারণা, ল্যানফোর্ডে দেখা হয়েছিল ওদের?' বলল উইলি।

'ওখানে হয়নি?'

'না।'

'তাহলে কোথায়?'

'এখানে।' সাইমনের বিস্মিত চেহারার দিকে তাকিয়ে নড করল উইলি। 'এখানে এসেছিল পেইজ।'

'ইনে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ।' হাসিটা উধাও হয়ে গেছে উইলির মুখ থেকে। গম্ভীর হয়ে এল তার গলা, 'পরেও দেখেছিলাম ওকে।'

'পরে কবে?'

'অ্যারনের সাথে এখানে আসার কয়েক মাস পর। তখন একেবারেই অন্য মানুষ ও। অ্যারন বদলে দিয়েছে ওকে...' থেমে গেল উইলি কর্ভাল, মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি যদি আমার ছেলের ক্ষতি করে থাকো, তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তোমার কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার।'

মাফ চাওয়া না ছাই! অনুতাপের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না লোকটার মধ্যে। পুরোটাই অভিনয়।

'পেইজ এখানে এসেছিল কেন?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'কেন এসেছিল বলে মনে হয় তোমার?'

'জানি না।'

'অ্যারনের সাথে দেখা করতে।'

***

ঘটনার আগা-মাথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া আপাত-সুখী পেইজ কেন অ্যারন কর্ভালের মতো একটা অপদার্থের খোঁজে এখানে আসবে? লোকটাকে ওর মেয়ে চেনেই বা কীভাবে? আগে দেখা হয়েছিল ওদের? উইলি কর্ভালের কথা অনুসারে, হয়নি। অ্যারনের সঙ্গে দেখা করতে ইনে এসেছিল পেইজ। ড্রাগ নিতে এসেছিল ওর কাছ থেকে? উঁহু, তা মনে হয় না। ল্যানফোর্ড কলেজ থেকে জায়গাটা অনেক দূরে, কয়েক ঘণ্টার পথ। ড্রাগ নেয়ার জন্যে এত দূরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

নাকি কোনোভাবে অনলাইনে পরিচয় হয়েছিল দুজনের?

হ্যাঁ, এই সম্ভাবনাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনলাইনে পরিচয় ওদের, তারপর পেইজ এখানে আসে অ্যারনের সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু কীভাবে? কেন? ওদের দুজনের পথ মিলে গেল কেমন করে? অনলাইন ডেটিং কিংবা টিন্ডার-ফিন্ডার পছন্দ করত না পেইজ। আর যদি করতও, তাহলে নিজের কলেজের কাছাকাছি কারো সঙ্গে ডেটে যেতে পারত না?

নাহ, কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না।

পেইজের ইনে আসার ব্যাপারে উইলি কি মিথ্যে বলেছে? সে কি পানি ঘোলা করে অ্যারনের পিতৃত্বের ব্যাপার এনিড যা বলেছে, তা থেকে সাইমনের নজর ফেরানোর চেষ্টা করেছে?

সাইমনের তা মনে হয় না।

উইলি কর্ভাল জাত-মিথ্যুক হতে পারে, কিন্তু পেইজের এখানে আসার ব্যাপারে যা বলেছে, তাতে সত্যের গন্ধ লেগে ছিল।

এনিডের ক্লাবে ফিরে গেল সাইমন, কিন্তু তার দেখা পেল না। ওখান থেকে ইভোনিকে ফোন করল সে।

প্রথম রিঙেই ফোন ধরল ইভোনি। 'ওর অবস্থা বদলালে তোমাকে ফোন করব।'

'কোনো পরিবর্তন নেই?'

'নাহ।'

'ডাক্তাররা কী বলছে?'

'নতুন কিছু না।'

চোখ বুজে ফেলল সাইমন।

'আজ সারাদিন ফোন করে কাটিয়েছি আমি,' ওপাশ থেকে বলল ইভোনি।

'কাকে?'

'ভালো যোগাযোগ আছে, এমন বন্ধুদের। সেরা ডাক্তারদের আনার চেষ্টা করেছি।'

'পেরেছ?' জানতে চাইল সাইমন।

'হ্যাঁ। যাকগে, ইনের খবর বলো।'

সব জানাল সে। ওর কথা শেষ হলে ইভোনি বলল, 'এরপর কোথায় যাবে?'

'জানি না।'

'জানো।'

ভগ্নিপতিকে খুব ভালো করেই চেনে ইভোনি।

'কলেজের কোনো একটা ব্যাপার পেইজকে বদলে দিয়েছে,' সাইমন বলল।

'একমত। সাইমন?'

'হুঁ?'

'তিন ঘণ্টা পর ফোন করবে আমাকে। ল্যানফোর্ডে পৌঁছেই খবর দেবে।'

১৯

'সেই উইকএন্ডে আমার গাড়ি ধার নিয়েছিল পেইজ,' সাইমনকে বলল আইলিন ভন।

কমন রুমে বসে আছে ওরা। ডর্মের প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে সবুজে ছাওয়া ছবির মতো সুন্দর ল্যানফোর্ড কলেজ ক্যাম্পাস দেখা যাচ্ছে। পেইজের প্রথম বর্ষের রুমমেট ছিল আইলিন ভন। কলেজে পেইজের প্রথম দিনে–উৎসাহে আর আশায় টগবগ করতে করতে যেদিন ক্যাম্পাসে পা রেখেছিল সাইমন, ইনগ্রিড, স্যাম আর আনিয়া–ওকে সবার প্রথম স্বাগত জানিয়েছিল আইলিন। চটপটে, বন্ধুবৎসল মেয়ে সে। আদর্শ–তখন অন্তত তা-ই মনে হয়েছিল–রুমমেট। কখনো যদি কোনো জরুরি দরকার পড়ে, সেজন্যে ওর ফোন নম্বর নিয়ে রেখেছিল সাইমন। সেই সূত্র ধরেই আজ ফোন করে দেখা করেছে মেয়েটার সঙ্গে।

নানা রকম আশার ফানুস উড়িয়ে কলেজ ছেড়েছিল সেদিন সাইমন আর ইনগ্রিড। ক্যাম্পাসের উজ্জ্বল রোদে চোখ পিটপিট করতে করতে, হাতে হাত রেখে গাড়িতে উঠেছিল দুজনে। বাবা-মার এহেন প্রকাশ্য প্রেম প্রদর্শনে রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়েছিল স্যাম আর আনিয়া। গাড়িতে বসে নিজের কলেজ জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছিল সাইমন। ওদের সময়ে একটা স্যুইটে চারজন ছাত্র থাকত ডর্মে। খালি পিৎজার বাক্স আর বিয়ারের ক্যানে ভর্তি ছিল সাইমনের ডর্ম রুম। আইলিনের স্যুইট ছিল সাজানো-গোছানো। রুমটায় কলেজের গন্ধ যতখানি ছিল, তারচেয়ে বেশি ছিল কোনো মডেল শোরুমের গন্ধ।

'এর আগে কখনো কাজটা করেছিল ও?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'আমার গাড়ি ধার নিয়েছিল কি না? নাহ। আমাকে বলেছিল, ও গাড়ি চালাতে পছন্দ করে না।'

(2,1) -80- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:36

পেইজ তো ঠিকমতো গাড়ি চালাতেই জানত না। ফোর্ট লি-র একটা ড্রাইভিং স্কুলে কিছুদিন শেখার পর লাইসেন্স পেয়েছিল কোনোমতে। তবে ওরা ম্যানহাটনে থাকত বলে ও কখনো ড্রাইভ করত না।

'পেইজ কেমন মেয়ে ছিল জানেনই তো,' বলে চলল আইলিন।

ছিল শব্দটা বুকের ভেতর পর্যন্ত খামচে ধরল যেন সাইমনের। পেইজ এখন এই ক্যাম্পাস আর আইলিনের জন্যে অতীত। কিন্তু নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী সুন্দরী এই মেয়েটার দিকে তাকালেই সাইমনের মনে পড়ে যায়, ওর মেয়েরও থাকার কথা ছিল এখানে, ঘুমানোর কথা ছিল এই স্যুইটের একটা বেডরুমে। আইলিনকে এখন পরিপূর্ণ নারীই বলা যায়, কিন্তু সাইমনের কাছে ওকে এখনো অল্পবয়সি মেয়েই মনে হচ্ছে–ওর নিজের মেয়ের মতো।

আইলিন বলল, 'সুপারমার্কেট বা সিভিএস-এ যেতে হলেও আমাকে ড্রাইভ করতে বলত পেইজ।'

'তাহলে তো ও যখন গাড়ি ধার চেয়েছিল, তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছিলে?'

আইলিনের পরনে জিন্স আর ধূসর সোয়েটার। মাঝখান থেকে সিঁথি করা লম্বা লাল চুল লুটোপুটি খাচ্ছে কাঁধের ওপর। বড় বড় নীল দুই চোখে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

'হ্যাঁ,' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল সে।

'মনে হচ্ছে, তুমি ঠিক নিশ্চিত নও।'

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, মি. গ্রিন?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখন কেন?'

'মানে?'

'ঘটনাটা তো অনেক আগের। পেইজের সাথে যা হয়েছে...কিন্তু ব্যাপারটা আমার জন্যও সহজ ছিল না।'

'কোন্ ব্যাপার?'

'পেইজের সাথে যা হয়েছে। এখানে, ল্যানফোর্ডে। ছোট্ট একটা রুমে থাকতাম দুজনে। আত্মার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল আমাদের। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল ও। আমি বাবা-মার একমাত্র সন্তান। পেইজ ছিল আমার বোনের মতো। আর তারপর...'

প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিল আইলিন, সেই আঘাত কাটিয়েও উঠেছিল। কিন্তু সাইমন আজ আবার সেই পুরনো ক্ষতে খোঁচাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা ভাবতেই খারাপ লাগছে সাইমনের। কিন্তু আইলিনের বয়স কম–ত্রিশ মিনিট পর সে যখন বিদায় নেবে, ক্লাস করতে কিংবা রুমমেটের সঙ্গে ডিনার করতে বেরোবে মেয়েটা। তারপর হয়তো এল্ডার্স লাইব্রেরিতে পড়তে অথবা ডর্মের

(1,1) -81- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:36

কোনো পার্টিতে যোগ দিতে যাবে। তখন আবার তার ‘পুরনো ক্ষত’ সেরে যাবে। কিন্তু সাইমনের ক্ষতটা চিরস্থায়ী।

‘কী হয়েছিল?’ প্রশ্ন করল সে।

‘পেইজ বদলে গিয়েছিল,’ এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে জবাব দিল আইলিন।

‘কেন?’

‘আমি জানি না।’

এবার অন্য পথে এগোনোর চেষ্টা করল সাইমন। ‘কবে থেকে?’

‘প্রথম সেমিস্টারের শেষের দিকে।’

‘তোমার গাড়ি ধার নেয়ার পর থেকে?’

‘হ্যাঁ। উম্‌ম্‌...না। তার আগে থেকেই কিছু একটা হচ্ছিল।’

সামনে ঝুঁকল সাইমন। ‘কত আগে থেকে?’

‘ঠিক বলতে পারব না। অনেক আগের কথা...’

মাথা দুলিয়ে মনে করার চেষ্টা করতে বলল ওকে সাইমন।

‘মনে আছে, পেইজ যখন গাড়ি ধার চেয়েছিল, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লেগেছিল আমার। কাজটা শুধু ওর স্বভাবের সাথে বেখাপ্পা বলেই নয়। কদিন ধরেই কেমন আনমনা লাগছিল ওকে। ঠিকমতো কথাবার্তা বলছিল না।’

‘কেন, আন্দাজ করতে পারো?’

‘না। কষ্ট পেয়েছিলাম আমি। ঠিকমতো কথা বলছিল না বলে একটু বোধহয় রেগেও ছিলাম ওর ওপর।’ সাইমনের চোখের দিকে তাকাল আইলিন। ‘রাগ না করে ওর সাথে কথা বলা উচিত ছিল আমার। সারাক্ষণই নিজের কথা ভাবছিলাম। আমি ভালো বন্ধু হতে পারলে হয়তো...’

‘তোমার কোনো দোষ নেই, আইলিন।’

সান্ত্বনায় মেয়েটা আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো না।

‘এমন কি হতে পারে যে, নেশা করছিল পেইজ?’ জিজ্ঞেস করল সাইমন।

‘অ্যারনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে?’

‘একটা থিয়োরি হচ্ছে, আরো আগে থেকেই নেশা করছিল ও। তাই অ্যারনের সাথে হয়তো ড্রাগ কিনতে গিয়ে পরিচয় হয়ে থাকতে পারে।’

সম্ভাবনাটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল আইলিন। ‘আমার তা মনে হয় না। এ কথা ঠিক যে, কলেজ ক্যাম্পাসে আমাদের ওপর নজর রাখার মতো তেমন কেউ নেই–ড্রাগের প্রভাবও সর্বনাশা। কিন্তু এখানকার অবস্থা আসলে এত খারাপ না। গাঁজার চেয়ে কড়া ড্রাগ কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, তা-ও জানি না আমি।’

‘হয়তো তা-ই হয়েছে,’ সাইমন বলল।

‘কী?’

(2,1) -81- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:36

'পেইজ হয়তো এর চেয়ে কড়া কিছু কিনতে চেয়েছিল।'

'সেজন্যই গিয়েছিল অ্যারনের কাছে?'

'সেটাও একটা সম্ভাবনা।'

কথাটা বিশ্বাস করানো গেল না আইলিনকে। 'পেইজ গাঁজাও টানত না। ভাববেন না ওকে দেবদূত প্রমাণ করার চেষ্টা করছি আমি। মদ-টদ খেত ও, কিন্তু ওকে গাঁজা বা মদ গিলে কখনো মাতাল হতে দেখিনি আমি। ওকে ওরকম বেসামাল অবস্থায় প্রথম দেখেছি অ্যারনের সাথে দেখা হওয়ার পর।'

'তাহলে ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় ফিরে আসছি আমরা,' সাইমন বলল। 'পেইজ তোমার গাড়ি ধার নিয়েছিল কেন? কানেক্টিকাটের ওই নির্জন এলাকায় কেন গিয়েছিল ও?'

'জানি না। দুঃখিত।'

'ও বদলে গিয়েছিল বললে।'

'হ্যাঁ।'

'ওর অন্য বন্ধুদের কেউও কি বদলে গিয়েছিল?'

'আমার মনে হয়...' কয়েক মুহূর্ত এদিক-ওদিক ঘুরল আইলিনের চোখজোড়া। 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমাদের সবার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল পেইজ। আমাদের এক বন্ধু, জুডি জিস্কাইন্ড...ওকে চেনেন?'

'না।'

'জুডি এখন আমার স্যুইটেই থাকে। ও এখন বোডোইন-এ ল্যাক্রস খেলছে, নইলে ওকেই ব্যাখ্যা করতে বলতাম। যাকগে, জুডির ধারণা ছিল, একটা ফ্র্যাট পার্টিতে গিয়ে কিছু একটা হয়েছিল পেইজের।'

একটা শীতল প্রবাহ চলে গেল সাইমনের শিরদাঁড়া বেয়ে। '"কিছু একটা হয়েছিল" মানে কী?'

'ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি নিয়ে প্রচুর কথা বলি আমরা। প্রচুর। যাহোক, এর বেশি কিছু বলছি না আমি। ব্যাপারটা নিয়ে আসলেই অনেক কথা হওয়া দরকার। কিন্তু আমার মনে হয়, ব্যাপারটা জুডির মাথায় গেঁথে গেছে। তাই কেউ যখন নিজেকে একটু গুটিয়ে নেয়, তখনই তার সাথে ওরকম কিছু হয়েছে বলে ভাবতে থাকে ও। মনে আছে, এক রাতে পেইজকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল জুডি। একটা ছেলের সম্পর্কে জানতে চাইছিল ও পেইজের কাছে। ওর ধারণা ছিল, ছেলেটা পেইজকে বিরক্ত করছে।'

'কোন্ ছেলে?'

'জানি না। কথা বলার সময় ওরা নাম নেয়নি।'

'এসব কি অ্যারনের সঙ্গে ওর পরিচয় হওয়ার আগের ঘটনা?'

'হ্যাঁ।'

'পেইজের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?'

'বলেছিল, ঘটনাটার সাথে হয়রানির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ঘটনাটা আসলে কী, তা বলেছিল?'

ইতস্তত করতে লাগল আইলিন, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

'আইলিন? আর কিছু বলেছিল ও?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'পেইজ বোধহয় ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিল না। প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টা করছিল।'

'কী বলেছিল ও?'

'বলেছিল...' চোখ ঘুরিয়ে সাইমনের চোখের দিকে তাকাল আইলিন, 'বাড়িতে নানান সমস্যা চলছে।'

চোখ পিটপিট করতে লাগল সাইমন, পেছনে হেলে বসল। ধাক্কাটা হজম করতে সময় লাগছে। এমন কিছু আশা করেনি সে। 'কী ধরনের সমস্যা?'

'খোলাসা করে বলেনি।'

'ইশারা-ইঙ্গিতেও বলেনি কিছু?'

'ও নেশা করতে শুরু করার পর ভেবেছিলাম, আপনার আর ডা. গ্রিনের মধ্যে বোধহয় ঝামেলা চলছে।'

'উঁহু, কোনো ঝামেলা ছিল না আমাদের মধ্যে।'

'ওহ।'

রীতিমতো চক্কর মারছে সাইমনের মাথা।

বাড়িতে ঝামেলা?

কী ধরনের ঝামেলা? মনে করার চেষ্টা করল সে। ওদের দাম্পত্যজীবন নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না–ওর আর ইনগ্রিডের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক ছিল তখনও। আর্থিক কোনো সমস্যাও ছিল না–পেইজের বাপ-মা দুজনেরই তখন ক্যারিয়ারের তুঙ্গে, ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে উঠছে ওরা। ভাইবোন? সাইমন যদ্দূর মনে করতে পারে, ওদের মধ্যেও কোনো সমস্যা ছিল না। স্যামের বিজ্ঞান শিক্ষকের সাথে ছোট একটা নাটক অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু সেটা তো তার আগের বছরের ঘটনা। আর সে ঘটনায় 'বাড়িতে কোনো সমস্যা' তৈরি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

নাহ, কোনো সমস্যার কথাই মনে পড়ছে না সাইমনের।

কিন্তু সত্যিই যদি কোনো সমস্যা থাকত–কিংবা পেইজ যদি পরিবারে কোনো সমস্যার কথা কল্পনাও করে নিত–সেটার জের ধরে অ্যারনের সঙ্গে ওর পরিচয় হলো কীভাবে? এখান থেকে নিজে গাড়ি চালিয়ে কানেক্টিকাট গেল কেমন করে?

আইলিনকে করল সে প্রশ্নটা।

'দুঃখিত, মি. গ্রিন, আমি জানি না।'

বয়স্ক মানুষ যেভাবে ঘড়ি দেখে, ঠিক সেভাবে মোবাইল ফোন দেখছে আইলিন ভন। কাউচে নড়েচড়ে বসল সে। সহসা বদলে গেছে ওর শারীরিক ভাষা। সাইমন বুঝতে পারল, মেয়েটা আর বেশিক্ষণ সময় দিতে পারবে না।

'আমার একটা ক্লাস আছে,' উসখুস করতে করতে শেষমেশ বলেই ফেলল সে।

'আইলিন?'

'হুঁ?'

'অ্যারন খুন হয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটা দুই চোখ, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'পেইজ পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে গেছে?'

'ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা, অ্যারনকে যে খুন করেছে, পেইজের পেছনেও লেগেছে সে।'

'বুঝতে পারছি না। কেন?'

'জানি না। তবে আমার ধারণা, যে কারণ ওদেরকে এক করেছিল–যে কারণে অ্যারনের খোঁজে গিয়েছিল পেইজ–সেই কারণই দায়ী এই অবস্থার জন্য। সেজন্যই তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার। এই ক্যাম্পাসে ওর কী হয়েছিল জানতে হবে আমাকে। কেন তোমার গাড়ি নিয়ে অ্যারনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ও, জানতে হবে।'

'আমি জানি না।'

'বুঝতে পেরেছি। এ-ও বুঝতে পেরেছি যে, তুমি চাও আমি যেন এক্ষুনি বিদায় হই। কিন্তু তারপরও তোমার সাহায্য চাইছি আমি।'

'আমি কীভাবে সাহায্য করব আপনাকে?'

'একদম গোড়া থেকে আরম্ভ করো। যা যা হয়েছিল সব খুলে বলো আমাকে...ছোট-বড়, গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ কিচ্ছু বাদ দেবে না। কিছু একটা বদলে দিয়েছিল ওকে। কিছু একটা ওকে বাধ্য করেছিল তোমার গাড়ি ধার নিয়ে অ্যারনের খোঁজে যেতে।'

***

'কলেজের প্রথমদিকে, পরিচিতির সপ্তাহগুলোতে, আমাদের বলা হয়–তোমরা যা চাও, তা-ই হতে পারবে,' বলল আইলিন। 'বলা হয়, এই তো সুযোগ নতুন করে জীবন শুরু করার–এই তো সময় সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার। কথাগুলো পেইজ খুব বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছিল।'

'সেটা তো ভালো ব্যাপার, তাই ন?' সাইমন বলল।

(1,1) -83- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:36

'আমার মনে হয়েছিল, একটু বাড়াবাড়িই করছিল ও। নাটকে অভিয়ের চেষ্টা করল। একটা গানের দলে যোগ দিয়ে গান গাওয়ার চেষ্টাও করল কয়েকদিন। ক্যাম্পাসে একটা সায়েন্স ক্লাব আছে–ওরা রোবট বানায়–ওই ক্লাবেও যোগ দিল। ফ্রেশম্যান জুডিশিয়ারি সিটের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেও গেল। ফ্যামিলি ট্রি ক্লাব নিয়ে বুঁদ হয়ে গেল–ওটা আমাদের জেনেটিকস ক্লাসের ক্লাব। এই ক্লাবের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে, আমরা কোত্থেকে এসেছি এসব সম্পর্কে জানা যায়। নাটকও লিখতে চেয়েছিল ও। সাদা চোখে দেখলে, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল। নিজের ওপর রীতিমতো অত্যাচার চালাচ্ছিল পেইজ।'

'ওর কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল?'

'সিরিয়াস কেউ ছিল না।'

'তোমার ল্যাক্রস রুমমেট যে ছেলের কথা বলেছিল...'

'সে ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আপনি চাইলে জুডিকে টেক্সট করতে পারি।'

'প্লিজ।'

ফোন বের করে হাতে নিল আইলিন। কিছুক্ষণ পর্দার ওপর নেচে বেড়াল ওর আঙুল। কাজ শেষ হলে মাথা দোলাল।

'ওর পড়াশোনার কী অবস্থা ছিল?' জানতে চাইল সাইমন। 'কোন্ কোন্ ক্লাস করছিল?'

বাপ হিসেবে এসব তথ্য ওর জানা থাকার কথা, কিন্তু আজকের আগে এসব কিছুই জানা ছিল না সাইমনের। এমনকি হাই স্কুলের পড়ার সময়ও পেইজের পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর রাখত না সে। কোনো কোনো বাপ-মা স্কাইওয়ার্ড নামে একটা অনলাইন প্রোগ্রামের সাহায্যে প্রতিদিন ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, হোমওয়ার্কের খবর নেয়। কিন্তু প্রোগ্রামটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা-ই জানে না সাইমন। তখন এসব নিয়ে গর্ব হতো ওর। সগর্বে ভাবত, সন্তানকে বিশ্বাস করে বলেই বাপ হিসেবে অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো সে।

আর তাছাড়া, পেইজকে নিয়ে কখনো কোনো সমস্যাতেও পড়তে হয়নি। নিজের খেয়াল ও নিজেই রাখতে পারত। চটপটে মেয়ে ছিল ও। সেজন্যে তখন বোকার মতো কী গর্ব আর আত্মতুষ্টিতেই না ভুগেছে সাইমন! বুক ফুলিয়ে বলত, নিজের স্কাইওয়ার্ড পাসওয়ার্ডও সে জানে না।

একটা কাগজে পেইজের বিষয় আর প্রফেসরদের নাম লিখে দিল আইলিন। কাগজের টুকরোটা সাইমনের হাতে দিয়ে বলল, 'এবার আমাকে আসলেই যেতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে হাঁটলে কিছু মনে করবে?'

মেয়েটা গোমড়া মুখে বলল যে, কিছু মনে করবে না।

(2,1) -83- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:37

বিষয়গুলোর নাম পড়তে পড়তে দরজার দিকে এগোল সাইমন। 'কিছু মনে পড়ছে তোমার?'

'নাহ। বেশিরভাগ ক্লাসই অনেক বড়। ওর কথা প্রফেসরদের মনে আছে কি না সন্দেহ। কেবল প্রফেসর ভ্যান ডি বিকের মনে থাকতে পারে।'

'কী পড়াতেন উনি?'

'জেনেটিকস।'

'তাকে পাব কোথায়?'

হাঁটতে হাঁটতে মোবাইল বের করল আইলিন। 'এই যে, ওনার ছবি।'

ফোনটা সাইমনের হাতে দিল সে।

প্রফেসর লুইস ভ্যান ডি বিকের বয়স একেবারেই কম–এখনো বোধহয় ত্রিশ পেরোয়নি। মুখে সদয় হাসি, আপন আপন ভাব–অল্পবয়সি ছাত্রছাত্রীরা তার সান্নিধ্যে এলেই প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। মাথায় লম্বা কুচকুচে কালো চুল, ত্বকের রং মোমের মতো। মুখে মিষ্টি হাসি। পরনে আঁটসাঁট কালো টি-শার্ট।

ছবিটার নিচে লেখা–**বায়োলজিক্যাল সায়েন্স প্রফেসর**। নিচে তার ক্লার্ক হাউস অফিসের ঠিকানা, ইমেইল, ওয়েবসাইট, কোন্ কোন্ ক্লাস নেয় সেসবও দেয়া আছে।

'পেইজকে শুধু উনি মনে রাখবেন বললে।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?' জানতে চাইল সাইমন।

'প্রথম কারণ, জেনেটিকস অ্যান্ড জিনিয়ালোজি ছোট ক্লাস,' জবাব দিল আইলিন। 'সেজন্য এই বিষয়ের প্রফেসরের সাথে খুব ভালো পরিচয় হয়ে যায় আমাদের। কিন্তু পেইজের জন্য উনি এরচেয়েও বেশি কিছু ছিলেন।'

'কেমন?'

'যে ফ্যামিলি ট্রি ক্লাবের নেশায় ও বুঁদ হয়ে গিয়েছিল, সেটা চালাতেন প্রফেসর ভ্যান ডি বিক। অফিসের সময়ের পরও তার সাথে দেখা করত ও। প্রায় প্রতিদিনই যেত দেখা করতে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল সাইমন। আইলিনের চোখে পড়ে গেল সেটা–তড়িঘড়ি করে বলল, 'না, না, ওরকম কিছু বোঝাইনি।'

'আচ্ছা।'

'ভর্তি হওয়ার পর, মেজর হিসেবে কোন্ বিষয় নেবে বুঝে উঠতে পারছিল না পেইজ। সবারই এই অবস্থা হয়, জানেনই তো।'

মাথা দোলাল সাইমন। সে আর ইনগ্রিড খুব উৎসাহ দিত পেইজকে। বলত, নিজেকে গুটিয়ে রেখো না। নতুন নতুন জিনিস দেখ। নতুন কিছু করার চেষ্টা করো। এভাবেই একসময় নিজের ভালোবাসার কাজ পেয়ে যাবে।

'পেইজ ওর মা আর তার কাজ নিয়ে অনেক কথা বলত,' বলল আইলিন। পরক্ষণেই তড়িঘড়ি করে যোগ করল, 'আপনার কথাও যে বলত না, তা না। আপনার পেশাও ওর কাছে আকর্ষণীয় লাগত।'

'বুঝতে পেরেছি, আইলিন।'

'যা-ই হোক, আমার ধারণা, মাকে ও রীতিমতো পূজা করত–বীর ভাবত তাকে। প্রথম বর্ষের যেসব ছাত্রছাত্রী চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়তে চায়, তাদের কাউন্সেলরও ছিলেন প্রফেসর ভ্যান ডি বিক।'

ঢোক গিলল সাইমন। 'পেইজ ডাক্তার হতে চেয়েছিল?'

'হ্যাঁ, আমার তা-ই ধারণা।'

নতুন এই আবিষ্কারটা বড়সড় একটা ধাক্কা দিল সাইমনকে। ডাক্তার হতে চেয়েছিল পেইজ। ওর মায়ের মতো।

'যা-ই হোক,' বলে চলল আইলিন, 'অ্যারনের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার সাথে ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আমার–তবু না বলে পারছি না–ওর এখানকার জীবনের বড় একটা অংশ ছিলেন প্রফেসর ভ্যান ডি বিক।'

র‍্যাটনার ডর্মিটরি পেরিয়ে এল ওরা। প্রথম বর্ষে এখানে ছিল পেইজ আর আইলিন। এখানেই, কয়েক বছর আগে, মেয়েকে বিদায় জানিয়েছিল সাইমন।

এক ঝটকায় সেসব বেদনাদায়ক স্মৃতি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ওর মস্তিষ্কের অলিতে-গলিতে।

ইশারউড বিল্ডিঙের সামনে কয়েকজন বন্ধুকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল আইলিন। সাইমনের দিকে ফিরে বলল, ওর ক্লাস এখানেই–তারপর দ্রুত বিদায় নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। ওকে বিদায় জানিয়ে ক্লার্ক হাউসের দিকে রওনা দিল সাইমন। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে বিল্ডিঙটার ভেতরে ঢুকতেই ডেস্কের পেছনে বসা এক বৃদ্ধা খরদৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

ছোট্ট একটা নেমপ্লেটে মহিলার নাম লেখা–মিসেস ডিন্সমোর। নামের প্রথমাংশ নেই।

'বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' নিরাসক্ত গলায় বলল মিসেস ডিন্সমোর। বুঝিয়ে দিল, তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়াটা খুব সহজ হবে না।

'প্রফেসর ভ্যান ডি বিককে খুঁজছি আমি।'

'ওকে পাবেন না।'

'মাফ করবেন?'

'প্রফেসর ভ্যান ডি বিক ছুটিতে আছেন।'

'কবে থেকে?'

'এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার অনুমতি নেই।'

'উনি কি আশেপাশেই আছেন, নাকি বেড়াতে বেরিয়েছেন?'

মিসেস ডিন্সমোরের গলার চেইনে একটা চশমা ঝুলছিল, সেটা নাকের ডগায় বসিয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকাল আগন্তুকের দিকে। 'আমার কথা বোঝেননি? বললাম না অনুমতি নেই?'

লুইস ভ্যান ডি বিকের ইমেইল অ্যাড্রেস আছে সাইমনের কাছে। ইমেইল করাটাই বেশি কার্যকর হবে মনে হচ্ছে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'স্বাগতম,' মাথা নুইয়ে বলল মিসেস ডিন্সমোর।

নিজের গাড়িতে ফিরে গেল সাইমন। ইভোনিকে ফোন করে জানতে পারল, ইনগ্রিডের অবস্থা অপরিবর্তিত।

এরপর ফোন করল ইলেনা রেমিরেজকে।

'কিছু জানতে পারলেন?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'আপনি আগে বলুন।'

'অ্যারন পেইজের কাছে আসেনি, পেইজই প্রথম গিয়েছিল ওর কাছে। আমার ধারণা ছিল, ল্যানফোর্ড কলেজে পরিচয় হয়েছিল দুজনের। কিন্তু আসলে লোকটাকে খুঁজে বের করেছিল ও।'

'তার মানে, অ্যারনকে ও আগে থেকেই চিনত?'

'হ্যাঁ।'

'অনলাইনে পরিচয় হয়েছিল বোধহয়। ডেটিং অ্যাপ বা ওরকম কিছুর মাধ্যমে।'

'ডেটিং অ্যাপ ব্যবহার করবে কেন ও?'

'অন্যরা কেন করে?'

'ও তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সারাদিন তো পড়াশোনা আর নতুন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়েই ব্যস্ত থাকার কথা। পেইজের রুমমেটই বলেছে, সবসময় পড়াশোনা, সংস্কৃতি, নতুন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত ও। যাকগে, ট্যাটু পার্লারের লোকটার সাথে কথা বলেছেন?'

'লোকটার নাম ডেমিয়েন গর্স। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, সাইমন। আমাকে জানানোর মতো আর কোনো তথ্য আছে আপনার ঝুলিতে?'

'অ্যারনকে বড় করার ব্যাপারে অদ্ভুত একটা তথ্য। ওর পিতৃত্ব নিয়ে আরকি।'

'বলে ফেলুন।'

অ্যারন আর উইলির ইটালিয়ান স্ত্রী সম্পর্কে এনিড যে গল্প শুনিয়েছে তা ইলেনাকে জানাল সাইমন। ওর কথা শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নীরবতায়। তারপর শুনতে পেল, কিবোর্ড টিপছে ইলেনা।

'ইলেনা?'

'গুগলে অ্যারন আর ওর বাপের ছবি পাওয়া যায় কি না দেখছি।'

'কেন?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

'পেলাম না। শুধু ইনে বাপের কয়েকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। উইলি।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কথাটা অদ্ভুত শোনাবে,' ইলেনা বলল।

'কেন?'

'অ্যারন আর উইলিকে তো আপনি সামনাসামনি দেখেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কি মনে হয়, ওরা আসলেই বাপ-ছেলে? মানে, বায়োলজিক্যালি?'

'না।' কোনোকিছু না ভেবেই জবাব দিয়ে ফেলল সাইমন। 'মানে...ঠিক বোঝাতে পারব না। কোথাও একটা ঘাপলা আছে। কিন্তু কেন?'

'ব্যাপারটা খুব মামুলি হতে পারে।'

'তবু, বলুন।'

'হেনরি থর্প দত্তক ছেলে ছিল,' বলল ইলেনা। 'ডেমিয়েন গর্সও।'

বরফশীতল একটা হাত যেন মুচড়ে ধরল সাইমনের হৃৎপিণ্ড। 'কাছাকাছি চলে গেছেন।'

'জানি।'

'পেইজকে দত্তক নিইনি আমরা।'

'তা-ও জানি।'

'ইলেনা?'

'বলুন?'

'ডেমিয়েন গর্স কী বলেছে?'

'কিচ্ছু না, সাইমন। গর্স মৃত। ওকেও খুন করে ফেলেছে কেউ।'

২০

অ্যাশ সবসময় প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করে।

গাড়িতে ওদের দুজনের জন্যে নতুন কাপড় থাকে। গাড়ি চালাতে চালাতেই কাপড় বদলে নিল ওরা। পুরনো কাপড়গুলো নিউ ইয়র্ক স্টেট বর্ডারের কাছে একটা *হোওল ফুডস*-এর চ্যারিটি বিনে ফেলে দিল। রাইট এইডের একটা দোকান থেকে দশটা জিনিস কিনল ডিডি। তার মধ্যে অবশ্য দরকারি জিনিস মাত্র দুটো—চুলের রং আর কাঁচি। দোকানে ঢোকার সময় মাথায় বেজবল ক্যাপ পরে নিয়েছিল মেয়েটা।

অ্যাশ দোকানে ঢোকেনি ওর সঙ্গে।

সবখানে ক্যামেরা লাগানো। তাই ওদের দুজনের একসঙ্গে বাইরে ঘোরাফেরা করা নিরাপদ না। বাইরে গেলে একা যাবে ওরা। তাতে বিভ্রান্ত হবে পুলিশ। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।

ডিডি বলেছিল, রাইট এইডের বাথরুম থেকেই চুলে রং লাগিয়ে নেবে। তবে তাতে আপত্তি জানিয়েছে অ্যাশ—বলেছে, কাজটা ঠিক হবে না।

এখন ওদের চলার ওপর থাকতে হবে। জায়গা বদলাতে হবে ক্রমাগত। ওদের পেছনে লাগার মতো সূত্র বা সুযোগ তুলে দেয়া যাবে না পুলিশের হাতে।

আরো দশ মাইল ড্রাইভ করার পর একটা পুরনো স্কুলের দেখা পেল ওরা। এখানকার সিসিটিভির অবস্থা ভালো না। অতএব, সুযোগটাকে কাজে লাগাবে বলে স্থির করল ওরা। বেজবল ক্যাপ পরে বাথরুমে চলে গেল ডিডি। নতুন কেনা কাঁচি দিয়ে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলল কোমরসমান লম্বা সোনালি চুল। একেবারে ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে রং করে ফেলল তাতে। হালকা লালচে বাদামি রং করল, যাতে চট করে কারো চোখ আটকে না যায় ওর ওপর। কাজ সেরে ক্যাপ মাথায় দিয়ে, ছেঁটে ফেলা চুলগুলো ফ্লাশ করে দিল।

অ্যাশ ওকে শিখিয়েছে: সবসময় মাথা একদিকে কাত করে, সামান্য নুইয়ে হাঁটবে। সিসিটিভি ক্যামেরা ওপর থেকে ভিডিয়ো করে। সবসময়। কাজেই সবসময় ক্যাপ রাখবে মাথায়, আর চোখ থাকবে মাটিতে। মাঝে মাঝে–সেটা অবশ্য আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে–সানগ্লাস পরাটা ভালো বুদ্ধি। সবসময় পরলে অবশ্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলবে।

'এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে,' ডিডি বলল।

'হয়তো।'

তবে আর তর্ক করল না মেয়েটা। অবশ্য এসব সতর্কতা নিয়ে ওর কোনো অসুবিধে নেই–অসুবিধে থাকলে ঠিকই তর্ক করত।

আবার যখন রাস্তায় নেমে এল, ডিডি তখন মাথা থেকে ক্যাপ খুলে নিয়েছে, হাতের আঙুলকে চিরুনি বানিয়ে চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। 'কেমন লাগছে আমাকে?'

মুহূর্তের জন্যে রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল অ্যাশ, সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

হাঁটু দুটো বুক পর্যন্ত মুড়ে বসে আছে ডিডি। খানিকক্ষণ পরই ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরপর চোরাচোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে অ্যাশ। লালবাতিতে থামার পর পেছনের সিটে রাখা একটা শার্ট এনে গুঁজে দিল গাড়ির দরজা আর ডিডির মাথার মাঝখানে, যাতে আরাম করে ঘুমাতে পারে আর বেকায়দায় ঝাঁকি লেগে ব্যথা না পায়।

তিন ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল ওর। জেগে উঠেই বলল, 'হিসু করতে হবে।'

পরবর্তী রেস্ট স্টপে গাড়ি থামাল অ্যাশ। বেজবল ক্যাপ পরে গাড়ি থেকে নামল ওরা। কয়েকটা চিকেন ফিঙ্গার আর ফ্রাই কিনল পথে খাওয়ার জন্যে। গাড়ি আবার হাইওয়েতে ওঠার পর, ডিডি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি?'

'পুলিশ তোমার ব্যাপারে কী কী তথ্য জোগাড় করেছে, এখনো জানি না আমরা।'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না, অ্যাশ।'

'তুমি জানো আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

জবাবে কিছু বলল না ডিডি।

'আমি কেবল জানি জায়গাটা ভারমন্ট সীমান্তের কাছে,' অ্যাশ বলল। 'কিন্তু সীমান্তের ঠিক কোথায়, তা বলতে পারব না। তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'ওরা তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। বাইরের লোকের অনুমতি নেই ওখানে যাওয়ার।'

'আচ্ছা।'

'বিশেষ করে পুরুষদের।'

চোখ পাকাল অ্যাশ। 'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'ওটাই নিয়ম। ট্রুথ হেইভেনে বাইরের পুরুষের ঢোকার অনুমতি নেই।'

'আমি ভেতরে ঢুকব না, ডি। শুধু তোমাকে ওখানে পৌঁছে দেব।'

'কেন?'

'কেন, তা তুমি জানো।'

'তোমার ধারণা, আমার আর বাইরে থাকা নিরাপদ না, তা-ই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার জন্য কোন্‌টা নিরাপদ আর কোন্‌টা অনিরাপদ, সেটা ঠিক করা তোমার কাজ না,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'এমনকি আমারও কাজ না।'

'এখন আবার বলে বোসো না যে, ওটা ঈশ্বরের কাজ,' ফোড়ন কাটল অ্যাশ।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডিডি। অদ্ভুত সুন্দর হাসি। বুকের ভেতরে চিনচিন করে উঠল অ্যাশের।

'কাজটা ঈশ্বরেরও না–ট্রুথের।'

'তা তোমাকে সত্যের বাণী শোনায় কে?'

'অবুঝদের জন্য তাকে ঈশ্বর বলে ডাকাই সহজ।'

'ঈশ্বর কথা বলে তোমার সাথে?'

'তার প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে বলেন।'

ডিডির ফালতু কাল্টের কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে অ্যাশ। 'সেই প্রেরিত পুরুষটি কে শুনি? ক্যাস্পার ভারটেজ?'

'ঈশ্বর তাকে বাছাই করেছেন।'

'ভারটেজ হারামজাদা একটা ধাপ্পাবাজ।'

'শয়তান সত্যের প্রচার চায় না। সত্যের আলোতে সে মারা যায়।'

'জেলে বসে সত্যের আলো পেয়েছে ভারটেজ?'

'হ্যাঁ, ওখানে বসেই সত্যকে পেয়েছেন উনি। নির্জনতায়। ওরা তার ওপর অত্যাচার করে তাকে ক্ষতবিক্ষত করার পর। মিডিয়া আর বাইরের লোকজন ওর নামে খারাপ কথা বলে, কারণ সত্যের মুখ চেপে ধরতে চেষ্টা করছে ওরা।'

হতাশ হয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাশ। এই মেয়েকে কিছু বোঝাতে যাওয়ার মানে হয় না।

'ভারমন্ট সীমান্তের পর দ্বিতীয় এক্সিটে ট্রুথ হেইভেন,' পথ বাতলাল ডিডি।

রেডিয়ো চালিয়ে দিল অ্যাশ। সত্তরের দশকের ক্লাসিক, ফ্ল্যাশ অ্যান্ড দ্য প্যানের 'হেই, সেইন্ট পিটার' বাজছে। হাসি চলে এল অ্যাশের। গানটায় একটা লোক স্বর্গের দরজার সামনে এসে সন্ত পিটারের কাছে কাকুতি-মিনতি

করতে থাকে তাকে স্বর্গে ঢুকতে দেয়ার জন্যে, কারণ সারাটা জীবন সে নিউ ইয়র্কে কাটিয়েছে। আর এই শহরে জীবন কাটানো মানে নরকে জীবন কাটানো। অর্থাৎ নরকে যে মেয়াদ খাটার কথা, তা সে নিউ ইয়র্কেই খেটে ফেলেছে।

'তোমাদের কম্পাউন্ডে কি গান শোনার ব্যবস্থা আছে?' অ্যাশ জানতে চাইল।

'ওটাকে আমরা ট্রুথ হেইভেন ডাকি।'

'আহ্, ডিডি।'

'হ্যাঁ, আছে। আমাদের অনেক সদস্যই প্রতিভাবান মিউজিশিয়ান। ওরা নিজেদের গান লেখে।'

'বাইরের গান শোনো না তোমরা?'

'তাতে সত্যের প্রচার হবে না, অ্যাশ।'

'ভারটেজের আরেকটা নিয়ম?'

'প্লিজ ওর আগের নাম ধরে ডেকো না।'

'আগের নাম ধরে ডাকা যাবে না?'

'না। নিষেধ আছে।'

'আগের নাম,' আবার বলল অ্যাশ। 'তার মানে, নতুন নাম নিয়েছে ব্যাটা। তোমার নতুন নাম যেমন হলি, তেমনি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ওই নামটা কি ও-ই দিয়েছে?'

'ট্রুথ কাউন্সিল দিয়েছে।'

'কে কে আছে ট্রুথ কাউন্সিলে?'

'ট্রুথ, ভলান্টিয়ার, ভিজিটর।'

'তিনজন?'

'হ্যাঁ।'

'সবাই পুরুষ?'

'হ্যাঁ।'

'পবিত্র তিনের মতো।'

অ্যাশের দিকে ফিরল ডিডি। 'পবিত্র তিনের মতো কিছু না।'

এসব নিয়ে তর্ক করার মানে হয় না, ভাবল অ্যাশ। 'ট্রুথ বোধহয় ক্যাস্পার ভারটেজ, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর বাকি দুজন?'

'তারা ট্রুথের সন্তান। হেইভেনে জন্ম তাদের, ওখানেই বেড়ে ওঠা।'

'অর্থাৎ ভারটেজের ছেলে?'

'না। তবে তার সন্তানও বলা যায়।'

'বলা যায় মানে?'

'সে তুমি বুঝবে না, অ্যাশ।'

'সব কাল্টই এই কথাটা বলে। তর্কে না পারলেই বলে।' ডিডি প্রতিবাদ করার আগেই হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল সে। 'আর ট্রুথকে কেউ প্রশ্ন করলে তার কপালে কী ঘটে?'

'ট্রুথ মানেই তো সত্য। উনি ছাড়া আর সবই মিথ্যা। তাকে কে প্রশ্ন করবে?'

'দারুণ। খাসা। তাহলে তোমার নেতার প্রতিটা কথাই বেদবাক্য।'

'সিংহকে সিংহ বলা কি অন্যায়? উনিই সত্য। তাহলে তার কথা সত্য না হয়ে অন্য কিছু হবে কীভাবে?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাশ। ভারমন্টে ঢুকল ওদের গাড়ি। ক্ষণে ক্ষণে চোরাচোখে মেয়েটাকে দেখছে সে।

'ডিডি?'

চোখ বন্ধ করে ফেলল মেয়েটা।

'তুমি কি সত্যিই চাও যে তোমাকে আমি হলি নামে ডাকি?'

'না,' জবাব দিল ডিডি। 'ট্রুথ হেইভেনের বাইরে এলে তো আমি আর হলি নই, তাই না?'

'হুম।'

'হলি যে কাজ করতে পারে না ডিডি সেসব করতে পারে।'

'দারুণ বলেছ।'

'সত্যি?'

হাসি সামলানোর চেষ্টা করল অ্যাশ। 'আমি বোধহয় ডিডিকে বেশি পছন্দ করি।'

'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়। কিন্তু হলি অনেক বেশি পরিপূর্ণ। হলি সুখী, সে সত্যকে বোঝে।'

'ডিডি?' এক মুহূর্ত চুপ করে রইল অ্যাশ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নাকি "হলি" ডাকব?'

'এই এক্সিট।' পথ দেখাল ডিডি। 'কী বলবে, অ্যাশ?'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব সরাসরি?'

'হ্যাঁ, করো।'

'এসব বস্তাপচা বুলি তুমি বিশ্বাস করো কীভাবে?'

তীক্ষ্ণ চোখে ডিডির দিকে চেয়ে রইল সে। গাড়ির সিটে পা উঠিয়ে বসেছে মেয়েটা। 'আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি, অ্যাশ।'

'আমিও।'

'শাইনিং ট্রুথের ব্যাপারে জানার জন্যে গুগল করেছ তুমি?'

আসলেই করেছে সে। ডিডিদের নেতা, ক্যাস্পার ভারটেজের জন্ম ১৯৪৫ সালে। তার ঠিকুজি-কোষ্ঠী ঠিকঠাক জানা যায়নি আজও। গুজব প্রচলিত, লোকটার মা একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে ওঠে দেখে সে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা–ঠিক সেদিনই মারা গিয়েছিল তার স্বামী। এসবের অবশ্য কোনো প্রমাণ নেই। তবে গল্পটা লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে জনপ্রিয় হয়ে গেছে। অল্পবয়সে ক্যাস্পারকে নেব্রাস্কায় সবাই 'শস্যের নিরাময়কারী' হিসেবে চিনত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্যে তাকে ডাকত কৃষকরা। লোকটার এই দৈব ক্ষমতার সপক্ষেও অবশ্যি কোনো প্রমাণ নেই। নিজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভারটেজ। এই ক্ষমতা নাকি তার মধ্যে এত বেশি যে, ক্ষমতাটুকু নিজের মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে সে। ১৯৭০ সালের দিকে ধাপ্পাবাজির জন্যে জেলে পোরা হয় লোকটাকে। তার ধাপ্পাবাজির অবশ্য বিস্তর প্রমাণ আছে।

জেলে অন্যান্য কয়েদিদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে এক চোখ হারায় সে। এরপর তাকে 'হিট বক্স' নামে একটা নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে সরিয়ে নেয়া হয়। ওখানে নাকি এক দেবদূতের সাক্ষাৎ পায় সে। ঘটনাটা সে বানিয়ে বলেছে নাকি একা একা থাকতে থাকতে ভুলভাল দেখেছে, তা বলা মুশকিল। যাই হোক, ভারটেজ যে দেবদূতের দেখা পেয়েছিল তাকে কাল্টের অনুসারীরা 'ভিজিটর' নামে ডাকে। এই ভিজিটর তাকে শাইনিং ট্রুথের ব্যাপারে বলে। জেল থেকে বের হওয়ার পর এই দেবদূত তাকে আরো জানায়, অ্যারিজোনার মরুভূমিতে খুঁজলে একটা চিহ্ন পাবে সে। সেটা নাকি সে পেয়েছেও।

এরকম আরো বহু গাল-গপ্পো চালু আছে বাজারে। ফালতু সব কিংবদন্তি। 'দ্য শাইনিং ট্রুথ'-এর এখন একটা আশ্রমও আছে। ওদের বেশিরভাগ শিষ্যই নারী। সেখানে তাদের মগজধোলাই, ধর্ষণ, মারধোর, অত্যাচার, কিংবা নেশা করানো হয়।

'ট্রুথের সঙ্গে তোমার দেখা না হওয়াই ভালো,' ডিডি বলল।

'কাল্টটা যে উন্মাদের আখড়া, তা যে তুমি কেন বুঝতে পারছ না তা-ই মাথায় ঢুকছে না আমার।'

অ্যাশের দিকে ঘুরে বসল মেয়েটা। 'মিসেস কেনসিংটনের কথা মনে আছে তোমার?'

মিসেস কেনসিংটন ওদের ফস্টার মাদার ছিল। ওদেরকে হপ্তায় দুবার গির্জায় নিয়ে যেত মহিলা–মঙ্গলবার সকালে বাইবেল পড়ানোর জন্যে আর রোববার সকালে প্রার্থনার জন্যে। সবসময়। ওদের গির্জায় যাওয়া কক্ষনো বাদ যেত না।

'নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' সায় দিল অ্যাশ। 'আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন উনি।'

'তা করতেন। তুমি কি এখনো চার্চে যাও, অ্যাশ?'

'খুব কম। কালেভদ্রে।'

'ছোটবেলায় চার্চে যেতে খুব পছন্দ করতে তুমি,' ডিডি বলল।

'জায়গাটা খুব নীরব ছিল। নীরবতা পছন্দ করতাম আমি।'

'তখন আমাদের যেসব গল্প শোনানো হতো, ওগুলো মনে আছে তোমার?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল অ্যাশ।

'মিসেস কেনসিংটন সবগুলো গল্প বিশ্বাস করতেন। প্রত্যেকটা কথা।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'বলো তো, নৌকা বানানোর সময় নূহ নবির বয়স কত ছিল?'

'ডিডি।'

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে, পাঁচশো বছরের মতো। তোমার কি মনে হয় সত্যিই সব ধরনের জীবজন্তু একজোড়া করে নৌকায় তুলেছিলেন উনি? লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গ আছে সারা দুনিয়ায়। ওগুলোর সবকটাকে উনি নৌকায় তুলতে পেরেছিলেন? এসব কথা বিশ্বাস হয় তোমাদের অথচ ট্রুথের কথা বিশ্বাস হয় না?'

'দুটো এক জিনিস না।'

'নিশ্চয়ই এক জিনিস। চার্চে বসে এসব কাহিনি শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলতেন মিসেস কেনসিংটন। গল্পগুলো তোমার মনে আছে?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল অ্যাশ।

'দাঁড়াও, দেখি আমি মনে করতে পারি কি না,' ডিডি বলল। 'এক স্বর্গীয় শিশু, যে নিজেই তার পিতা, জন্মেছিল এক বিবাহিত কুমারীর গর্ভে। তারপর ছেলেটির পিতা–তা-ও সে নিজেই–তাকে অত্যাচার করে হত্যা করে। এরপর সে জোম্বির মতো আবার জিন্দা হয়ে ওঠে। তুমি যদি তার মাংস খাও, তার ওয়াইন গেলো আর তার পাছায় চুমু খাও, তাহলে সে তোমার ভেতর থেকে সব রকমের অশুভ বোধ বের করে নেবে...'

'ডিডি...'

'আরে দাঁড়াও, এখনো তো সবচেয়ে মজার অংশে আসিইনি। পৃথিবীতে শয়তান বিচরণের কারণ...এই অংশটা তোমার মনে আছে, অ্যাশ?'

আছে, কিন্তু সে কিছু বলল না।

'মনে নেই? শোনো তাহলে, খুব ভালো লাগবে। শয়তান বেঁচে আছে এক মাথামোটা নারীর জন্য, যার জন্ম হয়েছিল এক পুরুষের পাঁজর থেকে, যে এক কথাবলা সরীসৃপের ফাঁদে পা দিয়ে একটা খারাপ ফল খেয়ে ফেলে।' খুব মজার কথা বলছে যেন, এমন ভঙ্গিতে হাততালি দিল ডিডি–গাড়ির সিটে গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে। 'আরো বলব? সাগর কীভাবে দুই ভাগ হয়ে

গেল? এখনো এসব "পবিত্র" পুরুষরা কীভাবে রোমে বসে উত্তেজক পোশাক পরে দৈববাণী শোনায়, বলব?'

কিছু বলল না অ্যাশ, চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে।

'অ্যাশ?'

'কী?'

'আমার কথা শুনে তোমার মনে হতে পারে এসব বিশ্বাসকে আমি ব্যঙ্গ করছি,' বলল ডিডি। 'অথবা মিসেস কেনসিংটনকে ব্যঙ্গ করছি।'

'তা তো মনে হচ্ছেই।'

'কিন্তু তা আমি করছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অন্যদের বিশ্বাসকে ফালতু বলে উড়িয়ে দেয়ার আগে "স্বাভাবিক" বলে প্রচিলত গল্প আর বিশ্বাসগুলো নিয়ে আরেকটু ভালোমতো চিন্তা করা উচিত। নিজেদের ছাড়া আর সব ধর্মকেই আমরা উন্মাদের কাণ্ডকারখানা ভাবি।'

কথাটা স্বীকার করতে না চাইলেও, ডিডির কথায় যুক্তি আছে। তবু মেয়েটার কথার সুরে এমন একটা কিছু আছে যে...

'ট্রুথ স্রেফ একটা ধর্ম না, তার চেয়েও বেশি কিছু। এটা একটা জীবনব্যবস্থা। ট্রুথের অস্তিত্ব চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে। বেশিরভাগ মানুষের ঈশ্বরর বাসই অতীতে–হাজার হাজার বছর অতীতে, প্রাচীন বইয়ের পাতায়। কেন? লোকের ঈশ্বর কি তাদেরকে ছেড়ে গেছে? আমার ঈশ্বরের বাস বর্তমানে, এই এখানে। আজকের দিনে। বাস্তব পৃথিবীতে। ট্রুথ দেহত্যাগ করার পর তার সন্তানরা তার কাজ চালিয়ে নেবে। কারণ ট্রুথ–অর্থাৎ সত্যই কেবল বেঁচে থাকে। অ্যাশ, তুমি যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে পারতে, ছোটবেলা থেকেই বড় বড় ধর্মগুলোর মগজধোলাইয়ের শিকার না হতে, তাহলে দেখতে পেতে, ট্রুথ কোনো ফালতু গালগল্প বলে না। সাপ আর হস্তিদেবতাদের চেয়ে বেশি অর্থবহ কথা বলে ট্রুথ, তাই না?'

অ্যাশ কিছু বলল না।

'অ্যাশ?'

'কী?'

'কথা বলো।'

'কথা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ট্রুথের কথা শুনছ বলেই বোধহয় কথা খুঁজে পাচ্ছ না।'

'উঁহু, সেজন্যে না।'

'ডানে মোড় নাও,' ডিডি বলল। 'কাছাকাছি চলে এসেছি।'

রাস্তা এখন নির্জন, দুপাশে ঘন বন।

'তোমার কিন্তু ফেরার দরকার ছিল না,' বলল অ্যাশ।

মুখ ঘুরিয়ে নিল ডিডি, জানালা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বাইরে।

'কিছু টাকা জমানো আছে আমার,' বলে চলেছে অ্যাশ। 'দূরে কোথাও চলে যেতে পারি আমরা। শুধু তুমি আর আমি। একটা বাড়ি কিনব। আমার সাথে হলি হয়ে থাকতে পারবে তুমি।'

কোনো উত্তর এল না মেয়েটার তরফ থেকে।

'ডি?'

'হুঁ।'

'আমার কথা শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরে যেতে হবে না তোমাকে।'

'শশশ। আশ্রমের কাছে চলে এসেছি।'

(1,1) -90- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:38

২১

প্রফেসর ভ্যান ডি ভিকের পরিচিতি পাতা থেকে পাওয়া ফোন নম্বরে কল করল সাইমন। দুবার রিং হওয়ার পর ভয়েসমেইলে চলে গেল কলটা। ওর মেয়ে পেইজ গ্রিনের ব্যাপারে কথা বলতে চায়, সেজন্যে ফিরতি কল করার জন্যে প্রফেসরকে অনুরোধ জানিয়ে মেসেজ দিয়ে রাখল সাইমন। একই অনুরোধ করে একটা ইমেইলও পাঠিয়ে রাখল বাড়তি সতর্কতা হিসেবে।

স্যাম ও আনিয়া দুজনকেই কল করল সে, কিন্তু ওদের ফোনেও ভয়েসমেইলে চলে গেল কল। তাতে অবশ্য অবাক হলো না সে। বাচ্চারা কখনো ফোনে কথা বলে না, মেসেজ করে শুধু। কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল ওর। দুজনকে একই মেসেজ পাঠিয়ে রাখল:

ঠিক আছ? আমার সাথে কথা বলতে চাও?

ত্বরিত জবাব দিল স্যাম:

ঠিক আছি। না, দরকার নেই।

এই উত্তরেও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

নিউ ইয়র্কে ফিরে চলল সাইমন। ক্লাউড না স্ট্রিম কীসে যেন ওর আর ইনগ্রিডের একটা যৌথ অ্যাকাউন্ট আছে। ওদের দুজনের সমস্ত ছবি আর ডকুমেন্ট সংরক্ষিত আছে ওতে। গানও। দুজনে একই সার্ভিস ব্যবহার করে ওরা ভাগাভাগি করে। তাই সিরি-কে ইনগ্রিডের সাম্প্রতিকতম প্লেলিস্ট বাজাতে বলে সিটে গা এলিয়ে দিল সাইমন। আরাম করে গান শুনতে লাগল।

ইনগ্রিডের প্লেলিস্টের প্রথম গানটা শুনে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে: 'দ্য গার্ল ফ্রম ইপানেমা,' ১৯৬৪ সালে অ্যাস্ট্রাড গিলবার্টোর গাওয়া সংস্করণটা।

দারুণ।

মাথা ঝাঁকাল সাইমন। ইনগ্রিডের মতো একজন অসাধারণ নারী–রূপে, গুণে সবদিক থেকেই অনন্যা–ওকে কীভাবে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিল,

সেই সে ঘোর আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। জীবনে যত বিপদ-আপদ, বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, ইনগ্রিড ওকে ভালোবেসেছে, এই ব্যাপারটাই সাইমনকে চাঙা রেখেছে, জীবনের প্রতি ওকে কৃতজ্ঞ রেখেছে।

ফোন বাজার শব্দে চটকা ভাঙল ওর। কলার আইডি ভেসে উঠেছে গাড়ির নেভিগেশন পর্দায়।

ইভোনি।

সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল কলটা।

'ইনগ্রিডের খবর দিতে কল করিনি,' ভগ্নিপতিকে হতাশ করল ইভোনি। 'ওর অবস্থা আগের মতোই।'

'তাহলে?'

'খারাপ কিছুও হয়নি।'

'আচ্ছা।'

'আজ মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার,' বলল ইভোনি।

স্যাডি লোয়েনস্টাইনের কথা ভুলেই গিয়েছিল সাইমন।

'ওটা ব্যাপার না,' বলে চলেছে ইভোনি। 'স্যাডিকে ফোন করে মিটিংটা স্থগিত করতে পারি। অথবা আমি যেতে পারি, কিংবা...'

'না, আমি যাব।'

'সাইমন...'

'না, আমিই যাব। তাছাড়া ফেরার পথেই পড়বে।'

'সত্যিই যাবে?'

'হ্যাঁ। ইনগ্রিডের অবস্থা বদলালে...'

'তোমাকে জানাব। আমি নইলে রবার্ট। একটু পরই আমার জায়গায় আসবে ও।'

'বাচ্চারা কেমন আছে?'

'আনিয়া তোমার প্রতিবেশীর কাছে। স্যাম সারাক্ষণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত–মেসেজ না কী করছে, খোদা মালুম। দুই হপ্তা আগে একটা মেয়ের সাথে ডেটিং শুরু করেছে ও। ব্যাপারটা জানো?'

আরেকটা খোঁচা বুকের মধ্যে, যদিও এটা এত তীব্র না। 'নাহ।'

'মেয়েটা অ্যামহার্স্ট থেকে এখানে এসে ওর সাথে বসে থাকতে চায়। কথাটা শুনে হেসেছে স্যাম, তবে বলে দিয়েছে এখনই আসার দরকার নেই।'

'শিগগিরই ফিরছি আমি।'

'ওরা তোমাকে মিস করছে, কিন্তু তোমাকে ওদের দরকার নেই। আমার কথা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। তুমি কী করছ, তা বুঝতে পারছে ওরা।'

***

স্যাডি লোয়েনস্টাইন থাকে ইয়ঙ্কার্স, নিউ ইয়র্কের একটা কলোনিতে। জায়গাটা ব্রঙ্কসের উত্তরে। সাদামাটা চেহারার এলাকাটায় কর্মজীবী শ্রেণির বসবাস। তিরাশি বছর বয়সি স্যাডি এখানে গত সাতান্ন বছর ধরে থাকতে। এরচেয়ে ভালো জায়গায় থাকার সামর্থ্য আছে বৃদ্ধার। তার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে তথ্যটা অন্য যে-কারো চেয়ে ভালো জানে সাইমন। কনকনে শীতের সময়ও ফ্লোরিডায় বাসা নিয়ে থাকার সাধ্য আছে তার, কিন্তু সে থাকে না। জায়গা বদলানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই। বছরে দুবার ভেগাস ঘুরতে যায় সে। ব্যস, এটুকুই তার বাইরে বেরোনো। নিজের পুরনো বাড়িটাকে সে ভালোবাসে।

এই বয়সেও ধূমপান করে স্যাডি, সে কারণে গলার স্বর খ্যাসখেসে। বৃদ্ধার পরনে একটা সেকেলে মুমু। সাইমনকে রান্নাঘরের গোল ফরমিকা টেবিলে নিয়ে বসাল সে। এককালে সে এই চেয়ারে তার স্বামী ফ্রাঙ্ক আর জমজ ছেলে ব্যারি ও গ্রেগকে নিয়ে বসত। তাদের কেউই এখন এখানে থাকে না। ব্যারি এইডসে মারা গেছে, ১৯৯২ সালে। ফ্রাঙ্ক মরেছে ক্যান্সারে ভুগে, ২০০৪ সালে। বেঁচে আছে শুধু গ্রেগ। ফিনিক্সে থাকে সে, কালেভদ্রে বাড়িতে আসে।

ঘরের মেঝেতে লিনোলিয়ামের আচ্ছাদন। সিঙ্কের ওপর একটা ঘড়ি ঝুলছে, বছর বিশেক আগে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ভেগাসে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনেছিল।

'বসো,' স্যাডি বলল, 'তোমার পছন্দের চা বানিয়ে আনছি।'

ক্যামোমাইল পাতার সাথে লেবু আর মধু মিশিয়ে চা-টা বানায় স্যাডি। সাইমন চা খায় না। ওর মনে হয়, কফির চেয়ে চায়ের ঝাঁঝ অনেক কম। চা জিনিসটাকে ওর কাছে বাদামি পানির চেয়ে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না।

তবে এক যুগ আগে−তার আগেও হতে পারে, ওর মনে নেই−স্যাডি প্রথম ওকে এই ফ্লেভারের চা বানিয়ে খাওয়ায়। চা-টা কেমন লাগল জিজ্ঞেস করেছিল সে, স্যাম জবাব দিয়েছিল, 'খুব ভালো।' তারপর থেকে প্রতিবার এই চা খাওয়ায় ওকে বৃদ্ধা।

'গরম কিন্তু, সাবধানে খেয়ো।'

পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর ছবিঅলা একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে হলদেটে রেফ্রিজারেটরের ওপর। একসময় ব্যাংক থেকে এসব ক্যালেন্ডার ফ্রিতে দেয়া হতো। এখনো হয়তো দেয়, তবে সাইমনের চোখে পড়ে না। স্যাডি কোনো জায়গা থেকে আজও জোগাড় করে ওগুলো।

সেকেলে, সাধারণ ক্যালেন্ডারটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সাইমন।

এখানে এলে প্রতিবারই কাজটা করে সে। তারিখের একত্রিশটা ছোট ছোট বাক্সের দিকে (ফেব্রুয়ারি মাসের জন্যে আটাশ বা উনত্রিশটা) চেয়ে থাকে স্থির চোখে। বেশিরভাগ বাক্সেই কিছু লেখা নেই। একদম সাদা। শুধু ছয় তারিখের ঘরে নীল কালিতে লেখা: 'ডেন্টিস্ট, ২টা।' আর প্রতি মাসের

তৃতীয় মঙ্গলবারের ঘরে গাঢ় বেগুনি মার্কার দিয়ে বড় বড়, মোটা হরফে লেখা একটা শব্দ:

সাইমন!

হ্যাঁ, ওর নাম। পাশে একটা বিস্ময়চিহ্ন। স্যাডি লোয়েনস্টাইন আর কোথাও বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহার করে না।

ক্যালেন্ডারের এন্ট্রিটা–গাঢ় বেগুনি রঙে লেখা ওর নামের পাশে বিস্ময়চিহ্ন–প্রথম দেখা যায় আট বছর আগে। সাইমন তখন স্যাডিকে বোঝাচ্ছিল ওর এখানে আসা কমিয়ে দেয়া উচিত, কারণ স্যাডির বিনিয়োগ আর খরচ এখন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে–বাড়েও না, কমেও না। কাজেই এখন আর মাসে মাসে ওর আসার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তার কাজ এখন ফোনে কিংবা জুনিয়র কোনো সহকর্মীকে দিয়েই সেরে নেয়া যাবে। মাঝেমধ্যে এসে কেবল খোঁজ নিয়ে যাবে সাইমন।

ঠিক তখনই রেফ্রিজারেটরের দিকে তাকিয়ে ক্যালেন্ডারে নিজের নাম লেখা দেখতে পায় সে।

এন্ট্রিটার কথা জানায় সে ইনগ্রিডকে। ইভোনিকেও জানায়। এখন আর কাছেপিঠে স্যাডির পরিবারের কেউ থাকে না। ওর বন্ধু-বান্ধবরাও হয় মারা গেছে নইলে অন্য জায়গায় চলে গেছে। সুতরাং, মাসে একদিন সাইমনের এই আসা, রান্নাঘরের টেবিলে বসে ওর সঙ্গে কথা বলা, চায়ে চুমুক দিতে দিতে পোর্টফোলিয়ো দেখার একটা আলাদা অর্থ আছে বৃদ্ধার কাছে।

আলাদা অর্থ আছে সাইমনের কাছেও।

স্যাডির সঙ্গে কখনো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করেনি সে। কক্ষনো না।

আজ সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করলে রাগ করত ইনগ্রিড। সেজন্যেই এখানে এসেছে সে।

নিজের ল্যাপটপ থেকেই স্যাডির পোর্টফোলিয়ো দেখতে পারে সে। কিছুক্ষণ সেটা দেখল, যদিও তার কোনো দরকার ছিল না।

'সাইমন, আমাদের পুরনো স্টোরটার কথা মনে আছে তোমার?'

শহরে একটা ছোট অফিস-সাপ্লাই স্টোর ছিল স্যাডি আর ফ্রাঙ্কের। কাগজ, কলম বিক্রি হতো ওখানে–ফটোকপি করত, বিজনেস কার্ড বানাত।

'মনে থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই মনে আছে,' জবাব দিল সে।

'ইদানীং ওদিকে গেছ?'

'না। ওখানে তো এখন কাপড়ের দোকান হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের আঁটসাঁট কাপড় বেচত। ব্যাপারটা আমার পছন্দ ছিল না, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'অল্পবয়সে আমি কিন্তু দেখতে দারুণ ছিলাম।'

'এখনো দারুণ আছ।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বৃদ্ধা। 'মিষ্টি কথা বলতে হবে না। সৌন্দর্য কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানতাম আমি। আমি যেসব কাপড় পরতাম তা দেখে বাবার তো ফিট হওয়ার দশা হতো।' হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। 'এভাবেই ফ্রাঙ্কের নজরে পড়ে যাই। বেচারা। রকঅ্যাওয়ে বিচে টু-পিস পরা অবস্থায় আমাকে দেখেছিল ও। মাথা ঘুরে গিয়েছিল ওর।'

হাসল সাইমন। স্যাডিও হাসল ওর দিকে চেয়ে।

'যা-ই হোক, কাপড়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে,' বলে চলল সে। 'ওখানে এখন রেস্তোরাঁ দিয়েছে। কী সব খাবার বেচে আন্দাজ করো তো।'

'জানি না। কী বেচে?'

সিগারেটে একটা টান দিল স্যাডি, তারপর মুখ কুঁচকে বলল, 'এশিয়ান ফিউশন।'

'ওহ।'

'শব্দটার মানে কী?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

'এশিয়ান ফিউশন। খাবারের নাম মেশুগা।'

'তাই নাকি? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'ওরকমই কিছু একটা। খদ্দের টানার কায়দা।' মাথা ঝাঁকাল স্যাডি। 'এশিয়ান ফিউশন।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কী হয়েছে, সাইমন?'

'মানে?'

'মানে, তোমার কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'আমাকে গাধা ভাবো নাকি? তুমি ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে বুঝেছি, কিছু একটা হয়েছে। ঘটনা কী?'

'লম্বা কাহিনি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বৃদ্ধা, সাইমনের চোখে চোখ রাখল। 'বলে ফেলো, আমার কোনো ব্যস্ততা নেই।'

প্রায় সবই বলল তাকে সাইমন। অখণ্ড মনোযোগে, চেহারায় সহানুভূতি ফুটিয়ে সব শুনল স্যাডি। তবে তাকে সব বলার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না সাইমনের। কোনো মক্কেলকেই ব্যক্তিগত সমস্যার ফিরিস্তি শোনাতে পছন্দ করে না সে।

'তোমার কোনো এক বাচ্চার সমস্যা আছে,' বলল স্যাডি।

'এমনটা মনে হলো কেন তোমার?'

'এক সন্তান হারিয়েছি আমি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল স্যাডি। 'আর সন্তান হারালে মানুষের মধ্যে এই ধরনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জন্মে। তা সমস্যাটা কোন্ বাচ্চার?'

'সবার বড়টার,' জবাব দিল সাইমন।

'পেইজ। অনধিকার চর্চা করব না আমি।'

'মোটেই অনধিকার চর্চা করছ না তুমি।'

'ছোট্ট একটা উপদেশ দেব, সাইমন?'

'নিশ্চয়ই।'

'উপদেশ দেয়ার কাজটা তো সবসময় তুমিই করো, তাই না? অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দাও, কারণ টাকাপয়সার ব্যাপারে তুমি বিশেষজ্ঞ। আমার দক্ষতা...যাকগে, আমার ছেলেদের কথা বলি। আমি সবসময়ই জানতাম যে ব্যারি সমকামী। ব্যাপারটা অদ্ভুত। যমজ ভাই ছিল ওরা। একই বাড়িতে বড় হয়েছে। তুমি যেখানে বসে আছ, ঠিক সেখানে বসত ব্যারি। এই সিট ওর জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। গ্রেগ বসত ওর পাশে। কিন্তু যদ্দূর মনে করতে পারি, একদম ছোটবেলা থেকেই স্বভাব-চরিত্রে আলাদা ছিল ওরা। এমন না যে, অন্য কেউ এসে বলে দিয়েছিল যে, ব্যারি সমকামী। এমনিই ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম আমি। আমার ছেলেদের চেহারা প্রায় একরকম ছিল–কিন্তু স্বভাব-চরিত্র ছিল একেবারেই আলাদা। ফ্যাশন আর থিয়েটার খুব পছন্দ করত ব্যারি। গ্রেগ পছন্দ করত বেজবল আর গাড়ি। একেবারেই আলাদা স্বভাবের দুই ছেলেকে পেলে-পুষে বড় করেছি আমি।'

দম নেয়ার জন্যে থামল স্যাডি, হাসল একটুখানি। দুই হাত ভাঁজ করে কিচেন টেবিলের ওপর রাখল সাইমন। এসব কথা কিছু কিছু আগেও শুনেছে সে, তবে ছেলেদের নিয়ে খুব বেশি আলাপ করে না স্যাডি।

ঠিক তখনই চিন্তাটা ধাক্কা মারল ওর মাথায়।

যমজ বাচ্চা, জেনেটিকস।

প্রথমবার শোনার সময় ব্যারি আর গ্রেগের গল্প খুব ভালো লেগেছিল ওর, কারণ একরকম দেখতে যমজদের নিয়ে নানা রকম কল্পনা করত সে। হুবহু একরকম ডিএনএ নিয়ে একই বাড়িতে বড় হয়েছে ওরা, তারপর যৌনতার ক্ষেত্রে দুদিকে বেঁকে গেছে দুজনের পথ।

'ব্যারি যখন অসুস্থ হলো, গ্রেগের ওপর সেটার প্রভাব খেয়ালই করিনি আমরা,' আগের কথার খেই ধরল স্যাডি। 'ওর দিকে নজরই দিইনি। আসলে দিতে পারিনি। অসুখটার ভয়াবহতা সামাল দেয়ার জন্যেই সর্বক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করতে হতো আমাদের। চোখের সামনে যমজ ভাইকে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে দেখল গ্রেগ। বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না, সেসবের দরকার নেই। তবে গ্রেগ কখনো ব্যারির অসুস্থতার ধাক্কা সামলে উঠতে

পারেনি। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল ছেলেটা। তাই পালিয়ে গেল ও। ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি আমি।'

গ্রেগই তার মায়ের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেজন্যে মাঝেমধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো সাইমনকে। তিনবার বিয়ে করেছে সে, তিনবারই ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন আটাশ বছর বয়েসি এক নর্তকীর সঙ্গে থাকছে। রেনো-তে দেখা হয়েছিল দুজনের।

'ওকে হারিয়ে ফেলেছি আমি। কেন, জানো? কারণ ওর দিকে মনোযোগ দিইনি। কিন্তু তারপরও...' থেমে গেল বৃদ্ধা।

'তারপরও কী?'

'তারপরও ব্যারিকে বাঁচাতে পারিনি। ওটাই সব সমস্যার মূল, সাইমন। ব্যারিকে বাঁচাতে পারলে গ্রেগও ঠিক থাকত। ভয় পেত না।' একদিকে মাথা কাত করল স্যান্ডি। 'পেইজকে বাঁচাতে পারো না?'

'জানি না।'

'কিন্তু একটা সুযোগ তো আছে, নাকি?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

জেনেটিকস। জেনেটিকস নিয়ে পড়াশোনা করছিল পেইজ।

'তাহলে ওকে বাঁচাও, সাইমন।'

২২

রাস্তার কোথাও ট্রুথ হেইভেনের কোনো সাইনবোর্ড নেই। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ারও কিছু নেই।

‘বাঁয়ে মোড় নাও,’ পথ বাতলাচ্ছে ডিডি। ‘ওই পুরনো মেইলবক্সটার পাশে।’

পুরনো বলে কমই বলেছে, দেখে মনে হয় আসলে প্রাগৈতিহাসিক আমলের। মেইলবক্সের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে প্রতদিন এই রাস্তা ধরে যাবার সময় ছেলেপিলেরা ওতে বেজবলের কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে যায়।

অ্যাশের দিকে তাকাল ডিডি। ‘কী হয়েছে?’

‘আরো একটা ব্যাপারে পড়েছি আমি,’ বলল অ্যাশ।

‘কী?’

‘তোমাদের কি ওদের সাথে বিছানায় যেতে হয়?’

‘কাদের সাথে...?’

‘কাদের কথা বলেছি তুমি খুব ভালো করেই জানো। তোমার ওই ট্রুথ না ভিজিটর কী যেন, ওদের সাথে?’

জবাবে কিছু বলল না মেয়েটা।

‘আমি পড়েছি জোর করে তোমাদেরকে বিছানায় নেয় ওরা।’

‘সত্যের ওপর কখনো জোরাজুরি চলে না,’ নরম গলায় বলল ডিডি।

‘তার মানে, সত্যিই তোমাদের বিছানায় নেয় ওরা।’

‘জেনেসিস ১৯:৩২।’

‘কী?’

‘বাইবেলের লটের গল্পটা মনে আছে তোমার?’

‘কী সব ফালতু বকছ?’

‘গল্পটা তোমার মনে আছে নাকি নেই?’

অ্যাশের মনে হলো প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চাইছে মেয়েটা, তবু জবাব দিল সে, 'আবছা আবছা।'

'জেনেসিসের ১৯ নম্বর অধ্যায়ে লট, তার স্ত্রী আর ওদের দুই মেয়েকে সোডোম আর গোমোরাহ-এর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচিয়ে দেন ঈশ্বর।'

মাথা দোলাল অ্যাশ। 'কিন্তু লটের বউ প্রতারণা করে।'

'হ্যাঁ। শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তাকে লবণের থাম বানিয়ে দেন। যাকগে, ওকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা লটের মেয়েরা।'

'কেন?'

'ওরা যোয়ার-এ যাবার পর লটের মেয়েরা অনুযোগ জানায় যে, ওখানে কোনো পুরুষমানুষ নেই। কাজেই ওরা একটা ফন্দি আঁটে। ফন্দিটা কী, মনে আছে তোমার?'

'না।'

'বড় মেয়ে তার ছোট বোনকে বলে—জেনেসিসের ১৯:৩২ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি আমি—"আয় বাবাকে মাতাল করে দিই, যাতে আমরা তার সঙ্গে শুতে এবং তার দ্বারা গর্ভবতী হতে পারি।"'

কিছু বলল না অ্যাশ।

'তারপর কাজটা করে ওরা। হ্যাঁ, অজাচার করেছে ওরা। জেনেসিসেই আছে। দুই মেয়ে বাপকে মাতাল করে তার সঙ্গে শুয়ে সন্তান ধারণ করেছে।'

'আমার ধারণা ছিল, ওল্ড বা নিউ টেস্টামেন্টের সাথে ট্রুথের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'নেই-ই তো।'

'তাহলে লটকে ছুতো হিসেবে ব্যবহার করছ কেন?'

'আমার কোনো ছুতোর দরকার নেই, অ্যাশ। আর তোমার অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। কেবল একটা জিনিসই দরকার আমার—ট্রুথ—সত্য।'

উইন্ডশিল্ড দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে অ্যাশ। 'তার মানে, ওদের সাথে বিছানায় যাও তুমি।'

'তুমি সেক্স পছন্দ করো, অ্যাশ?'

'করি।'

'তাহলে তুমি যদি এমন একদল মানুষের সঙ্গে থাকো যেখানে অনেক নারীর সাথে সেক্স করতে হয়, সেটা কি কোনো সমস্যা?'

জবাব দিল না সে।

যতই এগোচ্ছে, বনের গভীরে প্রবেশ করছে ওরা। গাড়ির চাকার আঘাতে ধুলো উড়ছে। বিস্তর 'অনুপ্রবেশ নিষেধ' সাইনবোর্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঝুলছে গাছগুলোতে। নানা রঙের, নানা সাইজের। ট্রুথ হেইভেনের গেটের সামনে গাড়ি পৌঁছতে জানালার কাচ নামিয়ে দিল ডিডি। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে।

(2,1) -94- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:39

গেটের সামনে গাড়ি থামাল অ্যাশ। গাড়ির দরজা খুলল ডিডি। অ্যাশও খুলতে গেল, কিন্তু ওর কাঁধে হাত রেখে থামিয়ে দিল মেয়েটা। মাথা নেড়ে মানা করল।

'তুমি এখানে থাকো। দুই হাত সবসময় স্টিয়ারিং হুইলে রাখবে–এক সেকেন্ডের জন্যও সরাবে না। নাক চুলকানোর জন্যও হাত ওঠাবে না।'

ধূসর ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক বেরিয়ে এল গার্ডহাউস থেকে। ওদের দেখে মনে হলো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে যেন আবার আমেরিকায়। দুজনই সশস্ত্র, হাতে এআর-১৫। দুজনের মুখেই দাড়ির জঙ্গল। ঝোপের মতো ঘন ভুরু কুঁচকে খরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওরা অ্যাশের দিকে। চেহারায় নিরীহ গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল অ্যাশ। ওর নিজের হ্যান্ডগানগুলো হাতের কাছেই আছে। ওর হাতের টিপও বোধহয় লোক দুটোর চেয়ে ভালো। কিন্তু সেরা মার্কসম্যানও দুটো এআর-১৫-এর সামনে দুধের শিশু।

এই ব্যাপারটাই বোঝে না বেশিরভাগ লোক।

ব্যাপারটা প্রতিভা বা দক্ষতার নয়। লেব্রন জেমসের মতো সেরা বাস্কেটবল খেলোয়াড়ও বায়ুশূন্য স্থানে বল ড্রিবল করতে পারবে না।

গার্ডদের দিকে এগোল ডিডি। ডান হাতে কিছু একটা করল। প্রথমে দেখে মনে হলো শূন্যে ক্রুশ আঁকল বুঝি, কিন্তু পরক্ষণেই দেখল ত্রিভুজের মতো আকার করল। জবাবে লোক দুটোও একই অঙ্গভঙ্গি করল।

অনুমান করল অ্যাশ, বাকি সব ধর্মের মতোই এটাও কোনো আচার।

লোক দুটোর সঙ্গে দু-এক মিনিট কথা বলল ডিডি। ব্যাটারা মুহূর্তের জন্যেও অ্যাশের ওপর থেকে চোখ সরাল না। অ্যাশকেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হলো সেদিকে।

এ কারণেই হয়তো ধার্মিক জীবন কখনো টানতে পারেনি ওকে।

দ্য ট্রুথ। যত্ত সব ফালতু বাকোয়াজ!

কথা শেষ করে গাড়িতে ফিরে এল ডিডি। 'ডানে ঘোরাও।'

'কেন, গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলে কী সমস্যা?'

'আমাকে নিয়ে না এসব থেকে অনেক দূরে চলে যাবে?'

কথাটা শুনে খুশিতে হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এল অ্যাশের, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি দেখে দপ করে নিভে গেল সমস্ত উৎসাহ। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে, চেহারায় যেন হতাশাটা ফুটে না ওঠে।

'নিজের জায়গায় ফিরে এসেছ তুমি,' বলল সে। 'এবার তুমি নিরাপদ। আমাকে আর তোমার সঙ্গে থাকার দরকার নেই।'

'একটু দাঁড়াও, কেমন? কাউন্সিলের সাথে কথা বলতে হবে।'

'কেন?'

'আহা, একটু দাঁড়াও না, অ্যাশ। প্লিজ।'

ডিডির হাতে ভাঁজ করা কাপড় তুলে দিল এক গার্ড। ধূসর রঙের। ইউনিফর্মের মতো। পরনের কাপড়ের ওপরই ওগুলো পরে নিল মেয়েটা। দ্বিতীয়জন একটা পাগড়ি দিল ওকে। কনভেন্টে এরকম পাগড়ির দেখা পাওয়া যায়। এটাও ধূসর রঙের। পাগড়িটা মুকুটের মতো পরে নিল ও।

ডিডি সবসময় মাথা উঁচু করে হাঁটে, আত্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি হয়ে। অথচ ও এখন সামনে ঝুঁকে পড়েছে, চোখ আনত, ওর গোটা অবয়বে কারো অনুগত অনুসারীর ছাপ। আজ্ঞাবহ দাস যেন। রূপান্তরটা অ্যাশকে চমকে দিয়েছে। বিরক্তও হয়েছে ভীষণ।

ডিডি বিদায় নিয়েছে, নিজেকে বোঝাল সে। ও এখন হলি।

ওকে গেটের ভেতরে হেঁটে যেতে দেখল সে। শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে মেয়েটার অপস্রিয়মাণ অবয়ব দেখার চেষ্টা করছে। আরো কয়েকজন মহিলা দেখতে পেল ভেতরে–ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে–পরনে সেই একই ধূসর রঙের ইউনিফর্ম। কোনো পুরুষ নেই। তাদের জায়গা বোধহয় আলাদা।

দুই গার্ড খেয়াল করল ভেতরের কম্পাউন্ড আর ডিডিকে দেখছে ছেলেটা। ব্যাপারটা ওদের পছন্দ হলো না। তাই এমনভাবে ওর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন ভেতরের কিছু দেখতে না পায় সে। অ্যাশের ইচ্ছে হলো হারামজাদা দুটোকে গাড়ির তলায় পিষে ভর্তা করে ফেলে। ইচ্ছেটা প্রাণপণে দমিয়ে, গাড়ি থামিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে বলে স্থির করল সে। এই সিদ্ধান্তও পছন্দ হলো না গার্ডদের।

গাড়ি থেকে বেরোনোর পর যে জিনিসটা সবার আগে অ্যাশকে ধাক্কা দিল সেটি চারপাশের নিস্তব্ধতা। বিশুদ্ধ, ভারী, দমবন্ধ করা নীরবতায় থমথম করছে চারপাশ। নিস্তব্ধতাটুকু অবশ্য উপভোগ্য। সাধারণত সবসময় সবখানেই নানা ধরনের শব্দের রাজত্ব চলে–এমনকি গহীন অরণ্যেও হরেক রকমের আওয়াজ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কেবলই নীরবতার রাজত্ব। মুহূর্তের জন্যে স্থাণু হয়ে গেল অ্যাশ, গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ করেও এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে মন সরছে না। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে দুই চোখ বন্ধ করে ফেলল সে, গোটা সত্তাকে ডুব দিতে দিল এই নীরবতার সমুদ্রে। এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে বিবশ হয়ে থাকল সে। বড় মনোহারী মনে হলো এই মৌনতাকে। এই শান্ত, স্থির নিস্তব্ধতার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে সে। এই পরিবেশে সমস্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ আর যুক্তিবোধকে বিসর্জন দেয়া বড় সহজ।

আত্মসমর্পণ।

হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ। অন্যরা করুক ভারী মানসিক পরিশ্রম। সে বেঁচে থাকবে শুধু এই মুহূর্তের জন্যে। এই স্থবির নীরবতায় থেকে যাবে সে। নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক আওয়াজ শুনবে শুধু উৎকর্ণ হয়ে।

কিন্তু এ তো জীবন নয়।

এটা স্রেফ ছুটি কাটানো, একটা বিরতি, নিজেকে ক্ষণিকের জন্যে গুটিয়ে নেয়া। একটা সিগারেট বের করল অ্যাশ।

‘ধূমপান নিষেধ,’ এক গার্ড বলল।

তার কথা গ্রাহ্য করল না সে, জ্বালিয়ে ফেলল সিগারেটটা।

‘বললাম না...’

‘শশশ। এই শান্ত নীরবতা নষ্ট কোরো না।’

প্রথম গার্ড এক পা এগিয়ে এল অ্যাশের দিকে, কিন্তু দ্বিতীয়জন বুকে হাত রেখে থামাল ওকে। গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল অ্যাশ, গভীর দম নিল একটা। গলগল করে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে এল ওর নাক-মুখ দিয়ে। বেজায় নাখোশ হয়েছে প্রথম গার্ড। একটা ওয়াকিটকির খড়মড় শব্দ শুনতে পেল অ্যাশ। ঝুঁকে পড়ে মুখের সামনে ধরল ওটা দ্বিতীয় গার্ড, কিছু বলল ফিসফিসিয়ে।

মুখ বাঁকাল অ্যাশ। আজকাল ওয়াকিটকি কোনো কাজে লাগে নাকি? এদের কি মোবাইল ফোন নেই?

কয়েক সেকেন্ড বাদে, দ্বিতীয় গার্ডের কানে কানে কিছু একটা বলল প্রথমজন। দাঁত বের করে হাসল সে।

‘এই যে, বীরপুরুষ,’ ডাকল সে।

আরেক দফা ধোঁয়া ওগরাল অ্যাশ।

‘স্যাংচুয়ারিতে ডাকা হয়েছে তোমাকে।’

ওদের দিকে হাঁটা ধরল অ্যাশ।

‘ট্রুথ হেইভেনের ভেতরে ধূমপান চলবে না।’

তর্ক করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তাতে লাভ কী? সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে পায়ের নিচে পিষল। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে গেট খুলল দ্বিতীয় গার্ড। সেটআপটা খেয়াল করল অ্যাশ–চারদিকে দেয়ালঘেরা, সিকিউরিটি ক্যামেরা, রিমোট। প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে খুব।

খোলা গেটের দিকে পা বাড়াল সে, কিন্তু এআর-১৫ দেখিয়ে থামাল প্রথম গার্ড।

‘সাথে অস্ত্র-টস্ত্র আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে ওটা আমার কাছে দিয়ে দাও।’

‘আমার কাছে রাখতে পারব না?’

দুই গার্ড অস্ত্র তাক করল ওর দিকে।

‘আমার ডান পাশে হোলস্টার,’ বলল অ্যাশ।

প্রথম গার্ড চেক করল, কিছু পেল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাশ। ‘তোমার ডান পাশে খুঁজছ, আমার না।’

ওর দেহের অন্যপাশে হাত দিয়ে .৩৮-টা বের করে নিল লোকটা।

'চমৎকার জিনিস,' মন্তব্য করল সে।

'আমার গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দাও,' অ্যাশ বলল।

'কী বললে?'

'জিনিসটা আমি ভেতরে নিচ্ছি না, কিন্তু এখানে রেখে যাচ্ছি। আমার গাড়িতে রাখো ওটা। দরজা খোলা আছে।'

ওর কথার ধরন পছন্দ হলো না প্রথম গার্ডের, কিন্তু দ্বিতীয়জন মাথা দুলিয়ে কাজটা করতে বলে দিল। অস্ত্রটা ভেতরে রেখে দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল প্রথম গার্ড।

'আর কোনো অস্ত্র আছে?' জানতে চাইল সে।

'না।'

তারপরও, সাবধানতার অংশ হিসেবে, ঝটপট একবার ওকে তল্লাশি করল দ্বিতীয় গার্ড। তার কাজ শেষ হলে প্রথম গার্ড মাথার ইশারায় গেটের ভেতরে ঢুকতে বলল অ্যাশকে। দুজন দুপাশ থেকে রীতিমতো পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল ওকে–প্রথমজন ডানে, দ্বিতীয়জন বাঁয়ে।

এসব নিয়ে অবশ্য ভাবনা নেই অ্যাশের। বুঝতে পারছে, ট্রুথ কিংবা ভলান্টিয়ারের সাথে কথা বলেছে ডিডি। তার ফলেই ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তারা। ডিডি স্পষ্ট করে কিছু না বললেও, মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে, কাল্টেরই কেউ টাকাপয়সা খরচ করে খুনগুলোর ব্যবস্থা করেছে। ডিডি নিজে থেকে টাকা কিংবা শিকারের নামগুলো দেয়নি ওকে।

এই কাল্টের কেউ একজন চায়নি লোকগুলো আর বেঁচে থাকুক।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। খানিক এগোতেই, একচিলতে পরিষ্কার জায়গায় একটা বিল্ডিং দেখতে পেল অ্যাশ। প্রায় তিনতলা সমান উঁচু বিল্ডিংটার রংও ইউনিফর্মের মতোই ধূসর। চৌকোনা দালানটা দেখতে সবদিক থেকেই রাস্তার পাশের চেইন মোটেলের মতো। মিলিটারি ব্যারাকও বলা চলে। তবে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য বোধহয় জেলখানার সাথে।

ধূসর ছাড়া অন্য কোনো রঙের অস্তিত্বও নেই আশপাশে।

তবে কাজটা হয়তো ইচ্ছে করেই করা হয়েছে। অন্য রং থাকলে মাঝেসাঝে মনোযোগ ছুটে যেত।

এই রঙের মাঝেও এক ধরনের সৌন্দর্য আছে। প্রকৃতির কোলে শান্ত, নির্জন পরিবেশ। আধুনিক সমাজের রোজকার হইচই আর বিষাক্ত অস্থিরতা থেকে পালানোর জন্যে এরচেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে? কাল্টের কাজই তো এরকম। প্রচলিত সমাজের পঙ্কিল রীতিনীতির ওপর থেকে যাদের মোহভঙ্গ হয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করে একাট্টা করা। তাদেরকে একটা সহজ উত্তর সরবরাহ করা। বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। তাদেরকে কাল্টের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। তাদের সমস্ত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। সমস্ত কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে দেয়া, যাতে কোনো সংশয় বা প্রশ্ন তোলা না যায়।

(2,1) -96- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:40

একটা উঠান ঘিরে কয়েকটা তিনতলা ধূসর রঙের বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। উঠানটা পার হয়ে গেল ওরা। সবগুলো দরজা-জানালা উঠানমুখো। কাজেই নিজের ঘর থেকেও কেউ গাছপালা দেখতে পায় না। সবুজ ঘাসের গালিচা জন্মেছে উঠানে, এখানে-সেখানে কতগুলো কাঠের বেঞ্চি পাতা, এগুলোও ধূসর রঙের। বেঞ্চগুলো সব একটা উঁচু বেদিতে দাঁড় করানো বিরাট মূর্তির দিকে মুখ করানো। বেঞ্চিগুলোর চারদিকে লেখা–'ট্রুথ'। মূর্তিটা ফুট পনেরো উঁচু। হাস্যরত ক্যাস্পার ভারটেজের মূর্তি ওটা–দুই হাত উঁচানো। প্রতিটা জানালা থেকে কেবল এই মূর্তিটাই দেখা যায়।

উঠানে আরো কয়েকজন মহিলার দেখা পেল অ্যাশ। এদের পরনেও একইরকম ইউনিফর্ম, মাথায় পাগড়ি। কারো মুখে কথা নেই। টুঁ শব্দটিও করছে না কেউ। নবাগতের দিকে কেউ সেরকম আগ্রহভরে তাকাচ্ছেও না।

ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকল না অ্যাশের।

প্রথম গার্ড একটা দরজার তালা খুলে ওকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল। কামরাটার মেঝে পালিশ করা কাঠের। দেয়ালে তিনজন লোকের ছবি ঝুলছে। ছবিগুলো সাজানো হয়েছে ত্রিভুজের মতো করে। সবার ওপরে দ্য ট্রুথ ওরফে ক্যাস্পার ভারটেজ। তার দুই ছেলের ছবি–চেহারায় মিল আছে–ঝুলছে দুই পাশে। দ্য ভলান্টিয়ার আর দ্য ভিজিটর। কোনার দিকে কয়েকটা ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। কোনো একটা দেয়ালে আয়না লাগানো থাকলেই যে-কেউ ঘরটাকে এক্সারসাইজ স্টুডিয়ো বলে ভুল করত।

দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল গার্ড দুজন।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না অ্যাশের।

'কী হচ্ছে?' জানতে চাইল সে।

জবাব দিল ওরা। দ্বিতীয় গার্ড চলে গেল। অ্যাশ এখন সশস্ত্র প্রথম গার্ডের সঙ্গে একা। ওর দিকে তাকিয়ে দাঁতাল হাসি দিল লোকটা।

অশুভ অনুভূতিটা ক্রমেই বাড়ছে অ্যাশের।

মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে লাগল সে। ধরা যাক, ইতিমধ্যেই অবশ্য ধরে নিয়েছে সে, এই কাল্টই ভাড়া করেছিল ওকে। যে লোকগুলোকে সে খুন করেছে তারা হয়তো কাল্টের প্রাক্তন সদস্য ছিল, যদিও তাদের কাজকর্ম আর চেহারা দেখে ওরকম কিছু মনে হয়নি। উদাহরণস্বরূপ নিউ জার্সির ট্যাটু পার্লারের মালিক গর্সের কথাই ধরা যাক। লোকটা সমকামী ছিল। বোস্টনের গ্যানো বিবাহিত ছিল, দুই বাচ্চার বাপ ছিল সে। এই ধরনের লোক সাধারণত কাল্টের সদস্য হয় না। তবু, হতেও তো পারে। হয়তো যৌবনে হেইভেন ট্রুথের অনুসারী ছিল ওরা, এখন কোনো একটা কারণে ওদের মুখ বন্ধ করে দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

কিংবা কে জানে, অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। তাতে কিছু এসে-যায় না।

আসল ব্যাপার হলো কাজটা করে দিয়েছে অ্যাশ। তার জন্যে টাকাও পেয়েছে। টাকা কামিয়ে সেগুলো লুকিয়ে রাখার উপায় সে জানে। পুরো টাকা পেয়েছে সে–অর্ধেক প্রতিটা কাজের আগে, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হওয়ার পর।

কিন্তু কাল্টের কাছে এখন ওর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। খুব সম্ভব ব্যাপারটা তা-ই। ডিডি হয়তো এই ব্যাপারটা এখনো জানে না–সেজন্যেই অপেক্ষা করতে বলেছে ওকে। অ্যাশকে যে-ই ভাড়া করে থাকুক, সে তার সাথে যোগাযোগ করেছে ডিডির মাধ্যমে। সেজন্যেই হয়তো ট্রুথ কাউন্সিলের কাছে এসেছে মেয়েটা, আর কোনো কাজ আছে কি না জানতে। ট্রুথ কিংবা তার কোনো উপদেষ্টা হয়তো বলে দিয়েছে, 'না, ওকে আর দরকার নেই।'

আর ওরা বোধহয় এখন ওদের কাজের সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ মুছে ফেলতে চায়।

অ্যাশ পেশাদার লোক। সে কখনো মুখ খুলবে না। সেজন্যেই টাকা পায় সে।

কিন্তু কাল্টের নেতারা হয়তো সেটা জানে না।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়তো ওকে বিশ্বাস করত ওরা। কিন্তু অ্যাশ আর ডিডি যেহেতু পরিচিত–এমনকি বিশেষ একটা বন্ধনও আছে ওদের মধ্যে–তাই ভারটেজ হয়তো নিজেকে নিরাপদ মনে করছে না।

এই সমস্যার সবচেয়ে সহজ সমাধান কী? কী করলে সবচেয়ে নিরাপদ থাকবে ভারটেজ আর তার ছেলেরা?

অ্যাশকে খুন করে ফেলা। গহীন অরণ্যে ওকে মাটিচাপা দেয়া। তারপর ওর গাড়িটাও লোপাট করে দেয়া।

অ্যাশ কাল্টনেতা হলে তা-ই করত।

সহসা কামরার অপর পাশের একটা দরজা খুলে গেল। বছর পঞ্চাশের এক মহিলা পা রাখল ভেতরে। তাকে দেখে দৃষ্টি নামিয়ে ফেলল প্রথম গার্ড। লম্বা, একহারা গড়ন মহিলার। সুন্দর চেহারা। মাথা উঁচু রেখে, বুক টানটান করে হাঁটে। তার পরনেও ধূসর ইউনিফর্ম, তবে তার আস্তিনে লাল স্ট্রাইপ। মিলিটারির মতো। ম্যাটমেটে ধূসর রঙের মাঝে ডোরাকাটা লাল দাগগুলোকে দেখাচ্ছে অন্ধকারে জ্বলা নিয়ন বাতির মতো।

'এখানে এসেছ কেন?' জানতে চাইল মহিলা।

'এক বন্ধুকে নামিয়ে দিতে।'

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে গার্ডের দিকে তাকাল মহিলা। সিধে হয়ে দাঁড়াল লোকটা। 'আপনাকে তা-ই বলেছি আমি, মাদার অ্যাডিওনা।'

'অ্যাডিওনা?' অস্ফুটে বলল অ্যাশ।

ওর দিকে ঘুরল মহিলা। 'নামটা তোমার পরিচিত নাকি?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সে। 'অ্যাডিওনা রোমান দেবী ছিলেন।'

'ঠিক বলেছ।'

ছেলেবেলায় পুরাণের গল্প পড়তে ভালোবাসত অ্যাশ। পুরো গল্পটা মনে করার চেষ্টা করল সে। 'বাচ্চাদেরকে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে দেয়ার দেবী ছিলেন অ্যাডিওনা। আরেকজন দেবীর সাথে জোড়া ছিল তার।'

'অ্যাবিওনা,' বলল মহিলা। 'তুমি এসব জানো দেখে অবাক লাগছে।'

'আমিও খুব অবাক হয়েছি। পুরাণের দেবীর নামে নাম দেয়া হয়েছে আপনাকে?'

'হ্যাঁ।' চওড়া হাসি ফুটল মহিলার মুখে। 'কেন জানো?'

'উঁহু। আপনিই বলুন।'

'সব দেবতাই কাল্পনিক। নর্স, রোমান, গ্রিক, ইন্ডিয়ান, জুডিয়ো-খ্রিস্টান, পেগান...সব। শত শত বছর ধরে তাদের পূজা করেছে মানুষ, তাদের তুষ্ট করার জন্যে বলি দিয়েছে, তাদের বিধান অনুসরণ করে জীবন কাটিয়েছে। অথচ এসবই মিথ্যা। কী দুঃখজনক ব্যাপার, তাই না? মিথ্যার মাঝে জীবন কাটিয়ে দিল লক্ষ-কোটি মানুষ।'

'হয়তো,' বলল অ্যাশ।

'হয়তো?'

'হাতে এরচেয়ে ভালো কোনো বিকল্প না থাকলে ওটা দিয়েই তো কাজ চালিয়ে নিতে হয়।'

'এটা আসলে তোমার মনের কথা নয়, তাই না?'

কিছু বলল না অ্যাশ।

'দেবতারা মিথ্যে। একমাত্র সত্যই টিকে থাকে। সব ধর্মই শেষতক ভেঙে পড়ে কেন জানো? কারণ ওগুলো সত্য না।'

কষ্টেসৃষ্টে হাসি সামলাল অ্যাশ।

'তোমার নাম কী?' জানতে চাইল মহিলা।

'অ্যাশ।'

'অ্যাশ কী? আগে-পরে কিছু নেই?'

'নাহ, স্রেফ অ্যাশ।'

'হলিকে চেনো কীভাবে?'

জবাব দিল না সে।

'তুমি বোধহয় ওকে ডিডি নামে চেনো।'

এবারও কিছু বলল না অ্যাশ।

'তোমরা দুজন এতদিন কোথায় ছিলে?'

'ওকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?'

'করেছি। ও সত্যি কথা বলছে কি না যাচাই করতে হবে।'

স্থির দাঁড়িয়ে রইল অ্যাশ। ওর কাছে ঘেঁষে এল মাদার অ্যাডিওনা। মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'তোমার ডিডি এখন কী করছে জানো?'

‘না।’

‘ও এখন ন্যাংটো। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে। একজন লোক ওর পেছনে, আরেকজন সামনে।’

মুখের হাসি আরো চওড়া করল মহিলা। আশা করছে প্রতিক্রিয়া দেখাবে অ্যাশ। কিন্তু কিছু করল না সে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকল শুধু।

‘তো এই ব্যাপারে তোমার মতামত কী, অ্যাশ?’

‘তৃতীয় লোকটার ব্যাপারে ভাবছি আমি।’

‘মানে?’

‘মানে আপনি জানেন। ট্রুথ, ভলান্টিয়ার, ভিজিটর। একজন ওর ওপর পেছন থেকে চড়ে বসেছে, দ্বিতীয়জন সামনে থেকে, তাহলে তিন নম্বর লোকটা কোথায়?’

মুখের হাসি মুছল না মহিলার। ‘তোমাকে বোকা বানানো হয়েছে, অ্যাশ।’

‘আগেও অনেকবার বোকা বনেছি আমি।’

‘অনেককেই সেবা দেয় ও, কিন্তু তোমাকে দেয় না।’

মুখ বাঁকাল অ্যাশ। ‘এই কাজকে আপনারা স্রেফ “সেবা” বলেন?’

‘জানি, ব্যাপারটা তোমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। ওকে তুমি ভালোবাসো।’

‘দারুণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন। এবার আমি আমার গাড়িতে ফিরে যেতে পারি?’

‘তোমরা কোথায় ছিলে?’

‘সেটা আপনাকে বলছি না।’

মাথা নাড়ল মহিলা, এত ক্ষীণভাবে যে, প্রায় বোঝাই গেল না। কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট। প্রথম গার্ড এগিয়ে এল, হাতে একটা ব্যাটন। দুটো ঘটনা ঘটে গেল একসঙ্গে। এক, অ্যাশ বুঝতে পারল ব্যাটনটা অনেকটা গবাদি পশু তাড়ানোর চোখা মাথাঅলা লাঠির মতো। দুই, ব্যাটনটা ওর পিঠে ছোঁয়াল গার্ড।

পরক্ষণেই সুনামির মতো ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল ওর শরীরে।

কাঠের মেঝেতে পড়ে গেল অ্যাশ ধপ করে। বৈদ্যুতিক শকটা ওর গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওর মস্তিষ্ক অকেজো করে দিয়েছে শকটা। কর্মক্ষমতা হারিয়েছে সমস্ত পেশি।

মুখ থেকে ফেনা উঠতে লাগল অ্যাশের।

একবিন্দু নড়াচড়া করার ক্ষমতা রইল না ওর। এমনকি চিন্তা করার ক্ষমতাও নেই আর।

আতঙ্কের ছোঁয়া লাগল মহিলার কণ্ঠে। ‘আ...কোন্ সেটিং দিয়েছিলে ব্যাটনে?’

'সর্বোচ্চ।'

'মাথা ঠিক আছে তোমার? ছেলেটা তো মরে যাবে।'

'তাহলে কাজটা সেরেই ফেলা উচিত।'

দেখতে পেল অ্যাশ, ব্যাটনের মাথাটা আবার এগিয়ে আসছে ওর দিকে। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে–সরে যাওয়াটা বড্ড দরকার এখন–কিন্তু বৈদ্যুতিক শকটা ওর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অক্ষম করে দিয়েছে। মস্তিষ্কের নির্দেশ পেশিগুলোর কাছে পৌঁছুতে পারছে না।

দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাটনটা ওর বুকে ঠেকাল প্রথম গার্ড। অ্যাশের মনে হলো ওর হৃৎপিণ্ড যেন বিস্ফোরিত হয়ে গেছে।

তারপর নেমে এল নিকষ আঁধার।

২৩

কোনো পরিবর্তন নেই।

এই একই কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সাইমন। ইনগ্রিডের বেডের পাশে চেয়ার টেনে বসেছে সে। ওর একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে স্থির চোখে, ওর নিশ্বাস নেয়া দেখছে। ইনগ্রিড সবসময় এভাবে চিত হয়ে ঘুমাত, তাই কোমার মধ্যেও ওকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে যেন। সাইমনের মনেই হচ্ছে না কোমায় আছে ওর ভালোবাসার মানুষটা। অথচ ও ভাবত কোমায় চলে গেলে মানুষকে অন্যরকম দেখায়। নানা রকমের নল লাগানো আছে বটে ইনগ্রিডের শরীরে, মেশিনের মৃদু গুঞ্জনও আছে, তবু কোমায় চলে যাওয়া মানুষ মনে হচ্ছে না ওকে।

কোনো পরিবর্তন নেই।

এ এক অসহ্য অবস্থা। না নরকে যেতে পারছে, না স্বর্গে। এ যেন অনন্তকাল ধরে প্রায়শ্চিত্ত করা। অনেকেই বলে এই অবস্থাই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। এ এক অন্তহীন অপেক্ষা। যারা এসব বলে তাদের জন্যে সমবেদনা আছে সাইমনের। কিন্তু আপাতত ইনগ্রিডের এই অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট সে। অবস্থা এরচেয়ে সামান্য খারাপ হলেই চিরকালের জন্যে ওকে হারাবে সে। খুব ভালো করেই জানে সাইমন, সূক্ষ্ম এক সুতোর ওপর ঝুলছে ইনগ্রিডের জীবন। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই ওকে হারাবে। তারচেয়ে এই অবস্থায় বেঁচে থাকাও ভালো।

সে বরং ভেবে নেবে ইনগ্রিড ঘুমাচ্ছে। একদৃষ্টে ওর স্নিগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে রইল সাইমন।

সর্বশেষ কবে ওকে এমনভাবে ঘুমাতে দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল সে। অ্যান্টিগুয়ায়, ওদের হানিমুনের সময়। সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে

গিয়েছিল সাইমনের। ওর পাশে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল ইনগ্রিড। নিবিষ্ট হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল সেদিন সাইমন।

বড়জোর দশ কি পনেরো সেকেন্ড এভাবে তাকিয়ে ছিল সে, তারপর চোখ না খুলেই, এমনকি একটুও নড়াচড়া না করেই ইনগ্রিড বলেছিল, 'এভাবে তাকিয়ে থেকো না। খুব অস্বস্তি লাগে।'

স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হেসে ফেলল সাইমন। ওর হাতের মুঠোয় ইনগ্রিডের হাত। এখনো উষ্ণ। জীবন্ত। রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। মোটেই মুমূর্ষু মনে হচ্ছে না ওকে। স্রেফ ঘুমোচ্ছে ও–শিগগিরই জেগে উঠবে।

আর জেগে ওঠার পর সবার আগে জানতে চাইবে পেইজের কথা।

সাইমনের মনেও কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মেয়ের ব্যাপারে।

স্যাডি লোয়েনস্টাইনের বাসা থেকে বেরিয়ে ইলেনাকে কল করেছিল সে। জেনেটিকসের ব্যাপারে পেইজের আগ্রহী হয়ে ওঠার তথ্যটা দিয়েছে তাকে। তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে ইলেনার কাছে। পাল্টা কয়েকটা প্রশ্ন করেছে সে। মাত্র কয়েকটার জবাব দিতে পেরেছে সাইমন।

শেষে আইলিন ভনের ফোন নম্বর চেয়ে নিয়েছে ইলেনা।

'ঘটনা কী?' নম্বর দেয়ার পর জানতে চেয়েছিল সাইমন।

'হয়তো কিছুই না। তবে খুন হওয়ার খানিক আগেই একটা ডিএনএ সাইটে ঢুঁ মেরেছিল ডেমিয়েন গর্স।'

'মানে কী এসবের?'

'কয়েকটা ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে নিই। আপনি এখন হাসপাতালে ফিরছেন?'

'হ্যাঁ।'

ওখানে দেখা করার কথা বলে ফোন কেটে দিয়েছে ইলেনা।

বাচ্চারা বোধহয় ভালোই আছে। আনিয়া বাড়িতে, সুজি ফিস্কের সাথে। ওকে আপাতত বাড়িতে রাখাই ভালো মনে হয়েছে সাইমনের। এই ফ্লোরে কাজ করা হাসাপাতালের কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলেছে স্যাম। ছেলেটা এসব কাজ খুব ভালো পারে, চট করে যে-কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে। ও এখন হাসপাতালের লাউঞ্জে, ফিজিকস পরীক্ষার জন্যে পড়ার চেষ্টা করছে। ছেলেটা শুধু চটপটেই নয়, প্রচুর পরিশ্রমও করতে পারে। কোনোমতে ভালো ফল করার জন্যে যতটুকু দরকার, ছাত্রজীবনে তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেনি কখনো সাইমন। তাই ছেলের এই আশ্চর্য পরিশ্রম করার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যায়। রোজ ভোরে ঘুম ওঠে, নাস্তার আগে ব্যায়াম করে, সময়মতো হোমওয়ার্ক সেরে ফেলে। মাঝে মাঝে ওকে একটু বিরতি নেয়ার পরামর্শ দিতে ইচ্ছে করে সাইমনের। খুব বেশি নিয়ম মেনে চলে স্যাম।

(1,1) -100- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:41

তবে এখন ওরকম কোনো উপদেশ দেয়ার ইচ্ছে ওর নেই। পড়াশোনা করলে বরং মায়ের জন্যে দুশ্চিন্তা একটু কমবে ছেলেটার। মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে পারবে।

নিজেকে সাইমন খুব বেশি কল্পনাপ্রবণ মানুষ মনে করে না। কিন্তু যতটুকু কল্পনাক্ষমতা আছে, ডিএনএ টেস্টের কথা শোনার পর, সেটা শুধু একটা রাস্তার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। অথচ ওই কুৎসিত, অন্ধকার, কণ্টকিত রাস্তায় চলার ইচ্ছে ওর কোনো কালেই ছিল না।

আইলিন ভনের বলা শব্দগুলো অনুরণিত হচ্ছে ওর মস্তিষ্কে: *'বাড়িতে নানান সমস্যা চলছে।'*

ইভোনি এসে ঢুকল রুমে। 'কী খবর?'

'আচ্ছা...এমনটা কি হওয়া সম্ভব যে, পেইজ আমার সন্তান নয়?'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ইভোনি। 'কী বললে?'

'কী বললাম তা তো শুনলেই।'

তার দিকে ফিরল সাইমন। পাণ্ডুর হয়ে গেছে ইভোনির চেহারা, কাঁপছে থরথর করে।

'আমি পেইজের আসল বাবা নই, এমন কোনো সম্ভাবনা আছে?'

'ঈশ্বর! না।'

'আমি স্রেফ সত্যিটা জানতে চাই।'

'কী সব আবোলতাবোল বকছ, সাইমন?'

'ও কি অন্য কারো সাথে শুয়ে থাকতে পারে?'

'ইনগ্রিড?'

'আর কার কথা বলছি?'

'জানি না। কী পাগলামি করছ?'

'তার মানে, এই সম্ভাবনা শূন্য।'

'হ্যাঁ, শূন্য।'

স্ত্রীর দিকে ফিরে চাইল সাইমন।

'সাইমন, এসব কী হচ্ছে বলো তো?' কাঁপা গলায় বলল ইভোনি।

'কোনো ব্যাপারেই কেউ শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না।'

'না, তা পারে না।' অধৈর্যের ছোঁয়া লাগল ইভোনির কণ্ঠে। 'তুমি যে অন্য কোনো সন্তানের জন্ম দাওনি তা-ও একশোভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না।'

'তুমি জানো ওকে আমি কতটা ভালোবাসি।'

'হ্যাঁ, জানি। আর ও-ও তোমাকে ঠিক ততটাই ভালোবাসে।'

'কিন্তু আমি গল্পের পুরোটা জানি না, তাই না?'

'তুমি কী বলছ মাথায় ঢুকছে না আমার।'

‘ঢুকছে, খুব ভালো করেই ঢুকছে। ওর জীবনে এমন একটা অধ্যায় আছে যা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। এমনকি আমিও না।’

‘সবার জীবনেই এমন একটা করে অধ্যায় থাকে।’

‘আমি তা বলিনি।’

‘তাহলে কী বলেছ?’

‘কী বলেছি তা তুমি জানো।’

‘আজ এসব কথা আসছে কোত্থেকে?’

‘আসছে পেইজকে খোঁজা শুরু হওয়ার পর থেকে।’

‘এতদিন খোঁজাখুঁজির পর এখন মনে হচ্ছে যে তুমি ওর বাবা নও?’

ঘুরে ইভোনির মুখোমুখি হলো সাইমন। ‘তোমার ব্যাপারে আমি সব জানি, ইভোনি।’

‘তোমার বুঝি তা-ই ধারণা?’

‘হ্যাঁ’

জবাবে কিছু বলল না ইভোনি। বিছানায় শোয়া ইনগ্রিডের দিকে তাকাল সাইমন। ‘ওকে আমি ভালোবাসি। মনে-প্রাণে ভালোবাসি। কিন্তু ওর জীবনের কিছু অধ্যায় আছে যা আমার অজানা।’

এবারও কিছু বলল না ইভোনি।

‘ইভোনি?’

‘কী শুনতে চাও আমার মুখ থেকে? ইনগ্রিড সবসময়ই নিজেকে একটা রহস্যের চাদরে মুড়িয়ে রেখেছে–এ ব্যাপারে তোমার সাথে আমি একমত। সোজাসুজিই বলি–এই কারণেই তোমাকে এত টেনেছে ও।’

মাথা দোলাল সাইমন। ‘হ্যাঁ, প্রথমে তা-ই হয়েছিল।’

‘ওকে তুমি গভীরভাবে ভালোবাসো।’

‘হ্যাঁ।’

‘তবু ভাবছ ও তোমার সাথে সবচেয়ে জঘন্য উপায়ে প্রতারণা করেছে কি না।’

‘সত্যিই কি করেছে?’

‘না।’

‘কিন্তু কোথাও একটা ঘাপলা আছে।’

‘ব্যাপারটার সাথে পেইজের কোনো সম্পর্ক নেই...’

‘তাহলে কীসের সাথে আছে?’

‘...ওর গুলি খাওয়ার সাথেও কোনো সম্পর্ক নেই।’

‘কিন্তু একটা গোপন অধ্যায় তো আছে, নাকি?’

‘হ্যাঁ, একটা রহস্যময় অতীত আছে নিশ্চিতভাবেই।’ হতাশভাবে দুই হাত তুলল ইভোনি। ‘সবারই আছে।’

‘আমার নেই। তোমার নেই।’

(1,1) -101- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:41

'থামো তো।'

'কেমন অতীত আছে ওর?'

'স্রেফ একটা অতীত, সাইমন।' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ইভোনি। 'ব্যস, আর কিছু না। তুমি আসার আগেও ওর একটা জীবন ছিল–স্কুল, নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি, অনেকের সাথে সম্পর্ক, চাকরি–সব মিলিয়েই ছিল সেই জীবন।'

'কিন্তু তুমি সেই জীবনের কথা বলছ না। অস্বাভাবিক কিছু একটার কথা বলছ।'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল ইভোনি, মাথা নাড়ল। 'সেসব নিয়ে কথা বলা উচিত না আমার।'

'এখন এসব উচিত-অনুচিত নিয়ে ভাবার সময় নেই, ইভোনি।'

'না, নেই। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তোমার।'

'করি,' এক বাক্যে জানিয়ে দিল সাইমন।

'বেশ। আমরা এখন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কথা বলব।'

মাথা ঝাঁকাল সাইমন। 'এখন যা হচ্ছে–পেইজ যে কারণেই বদলে যাক না কেন–তার শুরু অনেক আগেই হয়েছিল বলে বিশ্বাস আমার।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'জানি না।'

বিছানার কাছে সরে এল ইভোনি। 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, সাইমন।'

'করো।'

'আচ্ছা, একটা সুন্দর দৃশ্য কল্পনা করো। কোমা থেকে ফিরে এল ইনগ্রিড। পেইজকে খুঁজে পেলে তুমি। নেশা-টেশা ছেড়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল ও। মানে, একেবারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল। জীবনের এই কুৎসিত অধ্যায়কে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল।'

'ঠিক আছে।'

'তারপর নতুন করে জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল পেইজ। একজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো ওর। লোকটা অসাধারণ। ওকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করে, কল্পনার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। দারুণ একটা সংসার গড়ে তুলল দুজনে মিলে। এবং পেইজ চায় না এই অসাধারণ লোকটি কখনো ওর অতীত সম্পর্কে জানুক। চায় না লোকটা জানুক যে একসময় ও নেশাখোর ছিল, নোংরা কোনো নেশার আখড়ায় অসভ্য সব মানুষের সাথে থাকত।'

'ইয়ার্কি মারছ করছ না তো তুমি?'

'প্রশ্নই ওঠে না। পেইজ লোকটাকে ভালোবাসে। লোকটার চোখে যে ভালোবাসার আলো জ্বলে, সেটা নিভে যাক তা চায় না ও। বুঝতে পারছ পরিস্থিতিটা?'

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর স্বর ফুটল সাইমনের কণ্ঠে। 'ঈশ্বর! কী লুকাচ্ছে ও?'

'তাতে কিছু আসে-যায় না...'

'তা ঠিক।'

'...যেমন পেইজের নোংরা অতীতেও লোকটার কিছু যায়-আসে না।'

'ইভোনি?'

'কী?'

'তোমার কি সত্যিই মনে হয় এসব গোপন কথা ফাঁস হওয়ার কারণে ইনগ্রিডের প্রতি আমার অনুভূতি বদলে যাবে?'

জবাব দিল না ইভোনি।

'বদলে গেলে আমাদের ভালোবাসা বড় দুর্বল,' আবার বলল সাইমন।

'তোমাদের ভালোবাসা মোটেই দুর্বল না। কিন্তু এসব জেনে গেলে ওকে তুমি যে চোখে দেখ তা বদলে যাবে।'

'ভালোবাসার আলো নিভে যাবে চোখ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ধারণা ভুল। ওকে আমি এখনো ঠিক আগের মতোই ভালোবাসি।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ইভোনি। 'আমারও তা-ই বিশ্বাস।'

'তো?'

'তো ওর দূর অতীতের সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই।' হাত তুলে সাইমনের প্রতিবাদ থামিয়ে দিল সে। 'এসব কথা বাদ দাও।'

বাদ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সব জানতে হবে সাইমনকে। কিন্তু ঠিক তখনই সে টের পেল, ওর হাতের ওপর রাখা ইনগ্রিডের হাতটা শক্ত হয়ে চেপে বসেছে। আনন্দে লাফিয়ে উঠল ওর বুক। ঝট করে ফিরে তাকাল স্ত্রীর দিকে। মনে আশা, এক্ষুনি চোখ খুলে তাকাবে ইনগ্রিড, ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠবে। কিন্তু খিঁচুনি উঠল ওর শরীরে, পরক্ষণেই কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল, সেইসাথে ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো বেঁকে গেল ওর শরীর। চোখ খুলল না ইনগ্রিড, বরং উল্টে গেল। চোখের সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে।

ক্রমাগত বিপ-বিপ আওয়াজ আসতে লাগল মেশিনগুলো থেকে। অ্যালার্ম বেজে উঠল কোথাও।

ঝড়ের বেগে কে যেন ঢুকল রুমের ভেতর। তারপর আরো একজন। তৃতীয় একজন ঠেলে সরিয়ে দিল সাইমনকে। খানিক বাদে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল রুম। ইনগ্রিডের বিছানা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই–ওর খিঁচুনি থামছে না। জরুরি গলায় একের-পর-এক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে মানুষগুলো। আতঙ্কিত কণ্ঠে মেডিক্যালের ভাষায় কথা বলছে। তারপর ষষ্ঠ একজন লোক রুমে ঢুকে আস্তে কিন্তু দৃঢ়ভাবে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দিল সাইমন আর ইভোনিকে।

***

(1,1) -102- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:41

তড়িঘড়ি করে ইনগ্রিডকে সার্জারির জন্য নিয়ে যাওয়া হলো।

কেউ কিছু জানাচ্ছে না সাইমনকে। একজন নার্স কেবল বলল, 'যত শিগগিরই সম্ভব আপনাদের সাথে কথা বলবেন ডাক্তার।'

অনেকগুলো প্রশ্ন করতে চাইছিল সে, কিন্তু কাজে বাধা পড়বে বলে কিছু বলল না। জনাকীর্ণ ওয়েটিং রুমে পায়চারি করছে সে। দুশ্চিন্তায় নখ কামড়াতে লাগল খানিক পর। এটা ওর ছোটবেলার অভ্যাস, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর অবশ্য ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ টের পেল, আসলে অভ্যাসটা এখনো ছাড়তে পারেনি। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর।

ইভোনিকে খুঁজতে লাগল সাইমন, ওর স্ত্রীর অতীতের ব্যাপারে বিস্তারিত জানবার জন্যে। কিন্তু কোথাও পেল না ওকে, একেবারে হাওয়ায় উবে গেছে যেন। কেন? ও কি সাইমনকে এড়াতে চাইছে? নাকি জরুরি কাজে অফিসে গেছে? অফিসে কী যেন জরুরি কাজ আছে বলেছিল বোধহয়।

ইভোনির ওপর বিরক্তি আর রাগের মাঝামাঝি একটা অনুভূতি কাজ করছে সাইমনের মধ্যে। ইনগ্রিডকে চব্বিশ বছর ধরে চেনে সাইমন–পেইজের জন্মের তিন বছর আগে থেকে। ওর জন্মের আগে কিংবা তারও আগের কোনো ঘটনার সাথে বর্তমান ঘটনার সম্পর্ক থাকে কী করে?

উঁহু, কোনো যুক্তিতেই ফেলা যাচ্ছে না ঘটনাগুলোকে।

'সাইমন?'

আচমকা ইলেনা রেমিরেজ উদয় হলো ওর পাশে। ইনগ্রিডের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়েছে কি না জানতে চাইল সে। ইনগ্রিডকে সার্জারি রুমে নিয়ে যাওয়ার কথা জানাল সাইমন তাকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী কী জানতে পারলেন বলুন।'

ওয়েটিং রুমের এক কোণে চলে গেল দুজনে।

'ঘটনাগুলো এখনো এক সুতোয় গাঁথতে পারিনি,' নিচু গলায় বলল ইলেনা।

'কিন্তু কিছু একটা তো পেয়েছেন আপনি, তাই না?'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করল ইলেনা। 'হ্যাঁ। কিন্তু ওটার সাথে আপনার বা আপনার মেয়ের সম্পর্ক কী, তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি।'

'খুলে বলুন।'

'পেইজ আর ফ্যামিলি ট্রি ক্লাবটা দিয়ে শুরু করা যাক।'

'ঠিক আছে।'

'ডিএনএইয়োরস্টোরি ডট কম নামে একটা ডিএনএ সাইটে ঢুকেছিল।' সতর্ক ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল ইলেনা, যেন কেউ আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছে। 'সেজন্যে আমার ক্লায়েন্টকে বলেছিলাম তার ছেলে হেনরির চার্জ কার্ডও যেন পরীক্ষা করে দেখে।'

'তারপর?'

'ডিএনএইয়োরস্টোরি-তে একটা চার্জ ছিল। আসলে কয়েকটা ডিএন সাইটে সাইনআপ করেছিল হেনরি থর্প।'

'তাহলে তো পেইজের ক্রেডিট কার্ডও বোধহয় চেক করা উচিত,' বলল সাইমন। 'দেখা যাক ও-ও সাইনআপ করেছিল কি না।'

'হ্যাঁ।'

'অ্যারনের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেন? সে-ও ঢুকেছিল ওই সাইটে?'

'চার্জ কার্ড না পেলে সেটা জানার কোনো উপায় নেই। ওর মাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন?'

'তা পারব। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাব কি না সন্দেহ।'

'চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নেই,' ইলেনা বলল। 'কিন্তু তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক, ওদের সবাই একই ডিএনএ ওয়েবসাইটে নমুনা পাঠিয়ে নিজেদের ডিএনএন পরীক্ষা করিয়েছিল। এসব টেস্ট কীভাবে করা হয় জানেন?'

'উঁহু।'

'একটা টেস্ট টিউবের ভেতর থুতু ফেললে ওটা থেকে আপনার ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হয়। একেক সাইট একেকভাবে কাজ করে। কেউ কেউ দাবি করে ডিএনএ দেখে ওরা আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা বলে দিতে পারে–যেমন, আপনার ডিএনএ-তে আলজেইমার কিংবা পার্কিনসন্স রোগের কোনো উপাদান আছে কি না।'

'নিখুঁতভাবে বলতে পারে?'

'কিছু বিতর্ক আছে বিজ্ঞানটা নিয়ে, তবে সেসব এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার অন্তত তা-ই মনে হয়। এই ডিএনএ সাইটগুলো আপনাকে আপনার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন ধরুন, আপনার মধ্যে পনেরো শতাংশ ইটালিয়ান আর বাইশ শতাংশ স্প্যানিশ রক্ত আছে–এই ব্যাপারটা বের করে দেবে ওরা টেস্ট করে। পূর্বপুরুষদের অভিবাসনের ম্যাপও করে দেবে এরা। যেমন, আপনার পূর্বপুরুষদের যাত্রা কোত্থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর তারা ধীরে ধীরে কোথায় থিতু হলো, এসব বলে দেবে আরকি। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।'

'হ্যাঁ। ইন্টারেস্টিংও। কিন্তু এসবের সাথে এই টেস্টের কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে কি না, তা-ই ভাবছি।'

'এই টেস্টগুলো তো আপনার বাবা-মা সম্পর্কেও তথ্য দিতে পারে, তাই না?' সাইমন বলল।

'হ্যাঁ। অন্য আত্মীয়দের সম্পর্কেও তথ্য দিতে পারে। এসব জানার জন্যেই বোধহয় টেস্ট করিয়েছিল হেনরি থর্প আর ডেমিয়েন গর্স।'

'কারণ ওরা ছিল দত্তক সন্তান,' বলল সাইমন।

'আর ওরা নিজেদের আসল বাবা-মায়ের ব্যাপারে কিছু জানত না। এটাই মূল চাবিকাঠি। দত্তক যারা নেয় তাদেরকে সাধারণত রেজিস্ট্রি করে নিতে হয়, যাতে বাচ্চাগুলো পরে চাইলে নিজেদের আসল বাবা-মা বা ভাইবোন কিংবা অন্য আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করতে পারে।'

(1,1) -103- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:42

মুখ ঘষল সাইমন। 'অ্যারন কর্ভালও বোধহয় এরকম কিছু করেছিল। ওর মায়ের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল হয়তো।'

'হ্যাঁ। কিংবা হয়তো প্রমাণ করতে চেয়েছিল ওর বাপ আসলে ওর বাপ না।'

'মানে, অ্যারনও দত্তক নেয়া সন্তান হতে পারে বলছেন?'

'হতেই পারে। এখনো নিশ্চিত জানি না। একটা সমস্যা হচ্ছে এই ডিএনএ সাইটগুলো খুব বিতর্কিত। মানে, লাখ লাখ লোক ডিএনএ টেস্ট করিয়েছে এসব সাইটে। কেবল গত বছরই বারো মিলিয়ন লোক টেস্ট করিয়েছে।'

মাথা দোলাল সাইমন। 'আমার পরিচিত অনেকেই নমুনা পাঠিয়েছে।'

'আমিও অনেককে দেখেছি নমুনা পাঠাতে। তারপরও সবাই-ই একটা ইন্টারনেট কোম্পানির কাছে নিজের ডিএনএ পাঠাতে ঠিক ভরসা পায় না–একটু ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই এসব সাইট নিরাপত্তা আর গোপনীয়তার ব্যাপারে একেবারে চরমপন্থিদের মতো আচরণ করে। চেনাজানা সবগুলো কন্টাক্টের মাধ্যমে চেষ্টা করেছি আমি। ওয়ারেন্ট ছাড়া একটা কথাও বলতে রাজি না ডিএনএইয়োরস্টোরি। আর ওরা যেকোনো ওয়ারেন্টের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে লড়বে বলে জানিয়েছে।'

'কিন্তু আপনার প্রভাবশালী বন্ধুরা...'

'...যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। একেবারেই আলাদা উপায়ে, আলাদা স্টেটে, আলাদা অস্ত্রের মাধ্যমে হওয়া দুটো খুনের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র কয়েকটা ইন্টারনেট মেসেজ। আদালতে এসব প্রমাণ নিয়ে দাঁড়ানোই যাবে না।'

মহিলার দেয়া তথ্য হজম করতে চেষ্টা করছে সাইমন। 'তাহলে আপনার ধারণা, অ্যারন আপনার ক্লায়েন্ট আর এই গর্স লোকটার মধ্যে কোনো ধরনের যোগসূত্র আছে?'

'ঠিক জানি না। তবে থাকতেও পারে।'

'এদের দুজন খুন হয়েছে,' সাইমন বলল। 'আর তৃতীয়জন–আপনার ক্লায়েন্ট–নিখোঁজ।'

'হ্যাঁ।'

'একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।'

মাথা দোলাল ইলেনা। 'পেইজ।'

'হ্যাঁ। আপনার হাইপোথিসিসে আমার মেয়ের জায়গাটা কোথায়?'

'এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি,' বলল ইলেনা।

'তারপর?'

'অনেক কেসেই পুলিশ এসব ডিএনএ টেস্ট ব্যবহার করে অপরাধের সুরাহা করেছে। পেইজ হয়তো কোনো অপরাধের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। কীভাবে পড়েছিল, জানতে চাইবেন না, বলতে পারব না।'

'কোন্ ধরনের অপরাধ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইলেনা। 'জানি না।'

'অ্যারন কর্ভালকে খুঁজে বের করবে কেন ও?'

'ও-ই খুঁজে বের করেছিল কি না, তা আমরা জানি না। আমরা শুধু জানি যে, পেইজ ওর সাথে দেখা করতে কানেক্টিকাট গিয়েছিল।'

মাথা দোলাল সাইমন। 'তাহলে অ্যারন কর্ভালও প্রথমে ওর সাথে দেখা করতে আসতে পারে।'

'হয়তো। ব্যাপার হচ্ছে, যোগসূত্রগুলো খুঁজে বের করা কঠিন। আমার প্রযুক্তিগত ব্যাপারগুলো দেখে যে ছেলেটা, লু, সে খোঁজখবর নিচ্ছে। ও জানতে পেরেছে হেনরি একটা এনক্রিপ্ট করা মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করছিল–হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবারের মতো। এনক্রিপ্ট করা বলে এখনো মেসেজগুলো দেখতে পারেনি ও। তবে লু-র ধারণা, হেনরি হয়তো ডিএনএ সাইটটায় মেসেজ করেছিল। ওদের নিজস্ব মেসেজিং সিস্টেম আছে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে ইলেনার দিকে তাকিয়ে রইল সাইমন।

'আমিও বুঝিনি ওর কথা,' হাত নেড়ে বলল ইলেনা। 'আসল ব্যাপার হচ্ছে, লু চেষ্টা করছে। আমার অফিসকেও কাজে লাগিয়ে দিয়েছি অ্যারন কর্ভালের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে। ওর জন্ম সনদ বা ওরকম যা যা পাওয়া যায় সব চেক করতে বলেছিলাম। এই কাজ করতে গিয়েই বড়সড় একটা তথ্য পেয়েছি।'

থেমে লম্বা দম নিল ইলেনা।

'কী তথ্য?' জানতে চাইল সাইমন।

'আরেকটা যোগসূত্র পেয়েছি।'

ইলেনার কণ্ঠে কেমন অস্বাভাবিকতার ছোঁয়া।

'ওদের সবার মধ্যে?' দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'না। শুধু হেনরি থর্প আর ডেমিয়েন গর্সের মধ্যে।'

'কী পেয়েছেন?'

'ওরা দুজনেই দত্তক নেয়া সন্তান ছিল।'

'সেটা তো আমরা জানি।'

'একই এজেন্সি থেকে দত্তক নেয়া হয়েছিল ওদের দুজনকে।'

হতভম্ব হয়ে গেল সাইমন।

'এজেন্সিটার নাম হোপ ফেইথ।'

'কোথাকার এজেন্সি?'

'মেইন-এর। উইন্ডহ্যাম নামে এক শহরে।'

'বুঝলাম না। আপনার ক্লায়েন্ট থাকে শিকাগোতে। ডেমিয়েন গর্স থাকত নিউ জার্সিতে। অথচ ওদের দুজনকে দত্তক নেয়া হয়েছিল মেইন থেকে?'

'হ্যাঁ।'

বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকাল সাইমন। 'এখন তাহলে কী করব আমরা?'

'আপনি এখানে স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন,' ইলেনা বলল। 'আমি মেইনে যাচ্ছি।'

(1,1) -104- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:42

২৪

শেষবার যখন মেইনের পোর্টল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল জেটপোর্টে পা রেখেছিল, তখন জোয়েল ছিল ইলেনার সঙ্গে। জোয়েলের ভাগ্নি, একই সঙ্গে ধর্মকন্যাও, তখন এদিকে ছুটি কাটাচ্ছিল। নেটিভ আমেরিকান নামের একটা ক্যাম্পে ছিল সে–ক্যাম্প মানু না কী যেন।

জোয়েলের প্রাক্তন স্ত্রী মার্লিনও থাকে মেইনে। কাজেই একটা পরিবারের অস্বস্তিকর খরদৃষ্টিও সামলাতে হতো ইলেনাকে। জোয়েলের মতো ছয় ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চতার সুদর্শন, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন পুরুষ পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার বেঁটেখাটো ও আপাত-অনাকর্ষণীয় ইলেনার মধ্যে কী পেয়েছিল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি পরিবারটা। বুঝে উঠতে পারেনি খোদ ইলেনাও।

'দারুণ মজা হবে,' ওকে আশ্বস্ত করেছিল জোয়েল।

'মজা না ছাই।'

'পানির ধারে নিজস্ব কেবিন আছে আমাদের।'

'তা-ই নাকি?'

'ঠিক আছে, ওটা ব্যক্তিগত না,' হার মেনেছিল জোয়েল। 'পানির ধারেও না। আর আমরা থাকব বাঙ্ক বেডে।'

'আহা, দারুণ লাগছে শুনতে।'

ট্রিপটাকে দুঃস্বপ্নের মতো লাগবে মনে হয়েছিল ইলেনার। ক্যাম্পিং, প্রকৃতি, পোকামাকড়, তিরন্দাজি, কিংবা ক্যানু চালানো, কোনোটাই পছন্দ করত না সে। জুনের গোড়ার দিকের কথা। মেইনের সামার ক্যাম্পগুলো এই সময় কিছু বাড়তি পয়সা কামানোর জন্য নানান ইভেন্টের আয়োজন করে।

ইলেনাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ছুটিটা খুব ভালো কেটেছিল ওদের। দারুণ মজা করেছিল দুজনে। রাতের বেলায়–এই স্মৃতিটাই ওকে সবচেয়ে বেশি তাড়া করে ফেরে–এক বোতল ওয়াইন আর দুটো গ্লাস জোগাড় করে নিয়ে

আসত জোয়েল। এক্সট্রা-লার্জ স্লিপিং ব্যাগ দিয়ে মুড়িয়ে আনত সে বোতল আর গ্লাসগুলো। ক্যাম্পের সবগুলো বাতি নিভে গেলে ওপরের বাঙ্ক থেকে নেমে আসত জোয়েল। হাত ধরাধরি করে সকার খেলার মাঠে চলে যেত দুজনে। তারপর উন্মত্ত প্রেম করত মেইনের তারাখচিত নীল আকাশের নিচে।

জোয়েলের সঙ্গে বিছানায় যেতে এত ভালো লাগত কেন ওর?

কারণ লোকটা ইলেনার শরীরের এমন জায়গায় পৌঁছুতে পারত যার নাগাল অন্য কোনো পুরুষ কখনো পায়নি। কেন? অজস্রবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে ইলেনা। তারপর উপলব্ধি করেছে, সঙ্গম–উপভোগ্য সঙ্গম–আসলে পুরোটাই বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের ব্যাপার। জোয়েলকে সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিত ইলেনা, সম্পূর্ণ সঁপে দিত নিজেকে। ওরা কখনো একজন আরেকজনকে বিচার করতে যায়নি, পরস্পরের কাছে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি, কখনো সংশয়ে ভোগেনি। জোয়েলকে সে আনন্দ দিতে চাইত, একইভাবে জোয়েলও চাইত ওকে আনন্দ দিতে। একইসাথে দুজনেই স্বার্থপর হতে চাইত। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ওদের।

জীবনে এসব জিনিস রোজ রোজ পায় না মানুষ। বড়জোর এক কি দুবার। বেশিরভাগ মানুষ পায়ই না।

ইলেনা জানে, এসব সে আর কখনো পাবে না। পাওয়ার চেষ্টা করে লাভও নেই। সে ডেট করে না–অবশ্য ওরকম প্রস্তাব যে হরহামেশাই পায়, তা না–এমনকি নতুন কোনো সম্পর্কে জড়ানোর ইচ্ছাও নেই ওর। আসলে কাউকে বিশ্বাস করে তার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়ার মতো কারো দেখা সে পায়নি, পাবেও না।

হাওয়ার্ড জনসন'স-এ রুম নিয়েছে ইলেনা। ওর কামরা থেকে দুটো গ্যাস স্টেশন আর একটা ৭-ইলেভেন দেখা যায়। অন্যান্য আরামদায়ক ও বিলাসবহুল হোটেল ছেড়ে সে এই হোটেলে উঠেছে স্রেফ নস্টালজিয়ার কারণে। ছোটবেলায় পরিবারের সাথে রাতে ডিনার করতে যেত হাওয়ার্ড জনসন'স মোটর লজে।

ফ্রন্ট ডেস্কে রেস্তোরাঁর কথা জিজ্ঞেস করতে রিসেপশনিস্ট ওর দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন সোয়াহিলি ভাষায় প্রশ্ন শুনছে। 'আমাদের এখানে রেস্তোরাঁ নেই।'

'আপনারা হাওয়ার্ড জনসন'স, অথচ রেস্তোরাঁ নেই?'

'না। পোর্টল্যান্ড পাই কোম্পানি কাছেই। ডক'স সিফুড-ও বেশি দূরে না।'

হতাশ হয়ে লবি থেকে বেরিয়ে এল ইলেনা। একটা বারে ঢুকে গলা পর্যন্ত গিলল। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুজন পুরুষ–বাবা আর জোয়েলকে নিয়ে ভাবল অনেকক্ষণ। তারপর একটা রাইড শেয়ার করে ফিরে এল হাওয়ার্ড জনসন'স-এ।

সকালে নীল ব্লেজার আর জিন্স পরে রওনা হলো উইন্ডহ্যামের হোপ ফেইথে। আধঘণ্টা লাগল পৌঁছুতে। ইলেনার অফিস ইতিমধ্যে হেনরি থর্প আর ডেমিয়েন গর্সের পরিবারের সাথে কথা বলে দুই পরিবারের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছে ওকে।

দ্য ফেইথ হোপ অ্যাডপশন এজেন্সিটা রুজভেল্ট ট্রেইলের পেছনে একটা অ্যাপলবি-তে অবস্থিত। এজেন্সির মালিক–ধূসর চুলঅলা এক লোক, নাম মেইশ আইজাকসন–মুখে নার্ভাস হাসি নিয়ে ইলেনাকে স্বাগত জানাল। লোকটার গালভর্তি উস্কখুস্ক দাড়ি, নাকের ডগায় চশমা।

‘আপনাকে কীভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না,’ তৃতীয়বারের মতো বলল আইজাকসন।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে লোকটার কপালে। বসতে বসতে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির কাগজ ধরিয়ে দিল ইলেনা তার হাতে। কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে চোখ তুলে তাকাল আইজাকসন। জানতে চাইল, ‘দত্তক নেয়া হয়েছিল কত বছর আগে?’

‘হেনরি থর্পকে চব্বিশ বছর আগে নেয়া হয়েছিল। ডেমিয়েন গর্সকে বছর তিরিশেক আগে।’

‘তাহলে আপনাকে সাহায্য করার কোনো উপায় দেখছি না।’

‘দত্তকের ব্যাপারে কোনো তথ্য বা কাগজপত্র আছে কি না দেখতে চাই আমি।’

‘এত বছর আগের কাগজপত্র?’

‘হ্যাঁ।’

দুই হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল আইজাকসন। ‘মিস রেমিরেজ, আপনি তো জানেন দুটোই গোপন দত্তক ছিল। জানেন না?’

‘হ্যাঁ, জানি।’

‘কাজেই আমার কাছে যদি তথ্য থাকতও, তবু, আইন মেনেই, দত্তকের রেকর্ড আপনাকে দেখাতে পারতাম না।’

ম্যানিকিউর করা আঙুল চাটল লোকটা, তারপর সাইডবোর্ড থেকে এক তা কাগজ বের করে ঠেলে দিল ইলেনার দিকে। ‘দত্তকের আইন-কানুন আজকাল কিছুটা শিথিল হলেও, এখনো বেশ কিছু প্রটোকল মেনে চলতে হয়।’

কাগজটায় চোখ বোলাল ইলেনা।

‘তাই প্রথমেই আপনার যে কাজটা করা উচিত তা হলো কাউন্টি ক্লার্কের কাছে গিয়ে ধরনা দেয়া। নিয়ম-কানুন সব বলে দেব আমি। তার মাধ্যমে কাউন্টি কোর্টে পিটিশন করবেন। সেই কাজ হয়ে গেলে একজন জাজের সাথে মিটিঙের তারিখ দেয়া হবে...’

‘ওসব করার সময় নেই আমার হাতে।’

'আমার হাত-পা বাঁধা, মিস রেমিরেজ।'

'পরিবারগুলো এখানে, আপনার অফিসে দত্তক নেয়ার কাজ সেরেছে। আপনার সেবা নিয়েছে তারা। এখন তারাই চায় আমি যেন সমস্ত কাগজপত্র দেখি।'

মাথা চুলকাল লোকটা, চোখ নামিয়ে ফেলেছে। 'সম্মান রেখেই বলছি, এই ব্যাপারে পরিবারগুলোর আসলে কথা বলার কোনো অধিকার নেই। যাদের দত্তক নেয়ার হয়েছিল, তাদের দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। কাজেই কোর্টে পিটিশন করবে নাকি আমাদের অফিসে ধরনা দেবে, সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কেবল তাদেরই। শুনেছি মি. গর্স কদিন আগে মারা গেছেন। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, খুন করা হয়েছে তাকে।'

'ওহ, ঈশ্বর! ভয়াবহ ব্যাপার।'

'সে কারণেই এখানে এসেছি আমি।'

'ওনার দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য আমার সমবেদনা রইল। কিন্তু আইনসম্মত উপায়ে এগোতে গেলে...একজন দত্তক নেয়া সন্তান মারা গেলে আইন কী বলে তা আমার জানা নেই...'

'মারা যায়নি, খুন হয়েছে।'

'...দত্তক নেয়া বাবা-মাকেও সন্তানের আসল বাবা-মায়ের ব্যাপারে তথ্য দেয়ার নিয়ম আছে কি না নিশ্চিত নই আমি। হেনরি থর্প তো বেঁচে আছে, তাই না?'

'রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে সে।'

'তবু, তার বদলে তার পক্ষ থেকে বাবা-মা বা অভিভাবকের পিটিশন করার আইনি অধিকার আছে বলে মনে হয় না,' আইজাকসন বলল।

'ওদের দুজনকে এখান থেকেই দত্তক নেয়া হয়েছিল, মি. আইজাকসন।'

'জানি।'

'যে দুজনকে আপনার এজেন্সির মাধ্যমে পোষ্য নেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে যে ইদানীং যোগাযোগ হয়েছিল তা জানেন?'

কিছু বলল না লোকটা।

'এদের একজন এখন মৃত, আরেকজন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ।'

'আপনাকে এখন চলে যেতে বলব আমি।'

'বলুন।' দুই হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল ইলেনা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আইজাকসনের দিকে।

'দেখুন, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হতাম,' মরিয়া গলায় বলল লোকটা। 'কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা।'

'দত্তক দুটোর কাজ আপনি নিজে করেছিলেন?'

'এতগুলো বছরে আমরা অসংখ্য দত্তকের কাজ করেছি।'

'অ্যারন কর্ভাল নামটা কি আপনার পরিচিত? তার বাপের নামটা হয়তো মনে আছে আপনার–উইলি। পরিবারটা কানেক্টিকাটে একটা ট্রি ফার্ম আর ইনের মালিক।'

মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল আইজাকসন।

'মি. কর্ভাল আপনাদের ক্লায়েন্ট ছিল?' জিজ্ঞেস করল ইলেনা।

'আমি জানি না।'

'সে-ও মারা গেছে। মানে, অ্যারন কর্ভাল।'

নিমেষে মুখের রং সরে গেল লোকটার।

'ওকে কি এখান থেকে দত্তক নেয়া হয়েছিল?'

'আমি জানি না,' আবারও একই কথা বলল আইজাকসন।

'ফাইল চেক করুন।'

'আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে বলব আমি।'

'উঁহু, এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি। আপনি তখন এখানেই কাজ করতেন–ছেলেগুলোকে যখন পুষ্যি নেয়া হয়।'

'এই এজেন্সিটা আমিই খুলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। এজেন্সিটা খোলার পেছনের গল্পটা খুব সুন্দর। আপনার পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। তাই চাইতেন বাচ্চাদের যেন সুন্দর পরিবার উপহার দেয়া যায়। এসব আমি জানি। সব জানি আপনার সম্পর্কে। আপনাকে দেখে সৎ লোকই মনে হয়, কিন্তু আপনার দত্তক নেয়ার কাগজপত্রের কোথাও যদি কোনো গোলমাল থাকে...'

'নেই।'

'কিন্তু যদি থাকে, আমি সেটা খুঁজে বের করব। আপনার গোটা অতীত খুঁড়ে বের করব আমি। আর অতীতের কোনো কাজে যদি বিন্দুমাত্র খুঁতও পাই, আপনাকে ধসিয়ে দেব। আমার দিকে তাকান, মি. আইজাকসন।'

ইলেনার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করল লোকটা।

'কিছু একটা জানেন আপনি।'

'জানি না।'

'জানেন।'

'এখানকার সব দত্তকের কাজই নিয়ম মেনে করা হয়। আমার কোনো কর্মচারী যদি জোচ্চুরির চেষ্টা করে...'

এতক্ষণে লাইনে এসেছে লোকটা। ভুরু কোঁচকাল ইলেনা। 'সেক্ষেত্রে আমাকে আপনার বন্ধু হিসেবে পাবেন, মি. আইজাকসন। যতভাবে সম্ভব, সাহায্য করব আপনাকে। ফাইলগুলো দেখতে দিন আমাকে। আপনার ফাইলগুলো। আইনিগুলো না। জোচ্চোরটাকে খুঁজে বের করব আমি।'

কিছু বলল না লোকটা।

'মি. আইজাকসন?'

(2,1) -106- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:43

'ফাইলগুলো আপনাকে দেখাতে পারব না।'

'কেন?'

'নষ্ট হয়ে গেছে। পাঁচ বছর আগে। আগুন লেগেছিল এখানে। আমাদের সমস্ত রেকর্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাতে অবশ্য সমস্যা ছিল না। দরকারি সব কাগজপত্র কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে রাখা হয়। কিন্তু আইনের বাইরে যেসব দত্তকের কাজ করি, ওগুলোর কাগজপত্র যদি দেখাতে চাইও, পারব না। ওগুলোও কাউন্টি অফিসে আছে। ওখানে যেতে হবে আপনাকে।'

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার দিকে চেয়ে রইল ইলেনা। 'আমার কাছ থেকে কিছু একটা চেপে যাচ্ছেন আপনি, মি. আইজাকসন।'

'অবৈধ কোনো কাজ হয়নি আমার এজেন্সিতে।'

'ঠিক আছে।'

'আর যদি করা হয়ে থাকে, যা-ই করা হোক না কেন, বাচ্চাদের ভালোর জন্যই করা হয়েছিল। আমি কেবল বাচ্চাদের ভালোর চিন্তাই করেছি।'

'এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু এখন ওই বাচ্চাগুলোকেই টার্গেট করা হচ্ছে—খুন করা হচ্ছে ওদের।'

'এসব খুনোখুনির সাথে আমাদের কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই,' ইলেনা বলল। 'হয়তো আপনার নাম পরিষ্কার করতে পারব আমি। এই কেসগুলোর কথা আপনার মনে আছে?'

'একদিক থেকে দেখতে গেলে, আছে। আরেকদিক থেকে দেখতে গেলে, নেই।'

'মানে কী?'

'একটু বাড়তি গোপনীয়তার দরকার হয়েছিল এই দত্তকগুলোর জন্য।'

'যেমন?'

'বাচ্চাগুলোর মায়েরা অবিবাহিত ছিল।'

'অনেক মা-ই তো অবিবাহিত থাকে, তাই না? তখনকার দিনেও থাকত।'

'হ্যাঁ, থাকে,' সায় দিল আইজাকসন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু এই মায়েরা গোঁড়া খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে ছিল।'

'কোন্ গোত্রের?'

'জানি না। তবে আমার ধারণা...তারা পুরুষদের পছন্দ করত না।'

'মানে?'

'মানে জানি না। আসলেই জানি না। কিন্তু মায়েদের নাম জানানো হয়নি আমাকে।'

'আপনি এই এজেন্সির মালিক।'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে কাগজপত্রে সই করতে হতো।'

'করতামও। কেবল তখনই, মাত্র একবারের জন্যে, মায়েদের নাম দেখতে পেতাম। কিন্তু একটা নামও মনে নেই।'

মনে আছে–টের পেল ইলেনা–আলবত মনে আছে।

'বাবার নাম?'

'অজ্ঞাত লেখা থাকত।'

গায়ের জোরে দাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করেছে লোকটা। পটপট করে দু-একটা দাড়ি ছিঁড়ে চলে এল তার হাতে।

'আপনার কর্মচারীর কথা বলছিলেন।'

'কী?'

'বলছিলেন, আপনার কোনো কর্মচারী জোচ্চুরি করতে পারে।' লোকটার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল ইলেনা। 'এসব কেস নিয়ে কেউ কাজ করেছিল?'

এমনভাবে মাথা নাড়ল আইজাকসন যে, হ্যাঁ নাকি না বলল বোঝার জো নেই। তবে ইলেনা হ্যাঁ-ই ধরে নিল। জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'তার নাম,' জবাব দিল আইজাকসন, 'অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।'

'দত্তকের কেস নিয়ে কাজ করত সে?'

'হ্যাঁ।' তারপর দু-এক মুহূর্ত ভেবে যোগ করল আইজাকসন, 'ওরকমই।'

'এই কেসগুলো কি সে-ই নিয়ে আসত?'

'অ্যালিসন খুব গোপনে দেখা করতে আসত আমার সাথে,' বহু দূর থেকে ভেসে এল যেন লোকটার কণ্ঠ। 'এসে বলত, কয়েকটা বাচ্চার খুব সাহায্য দরকার। আমি সাহায্য করার প্রস্তাব দিতাম। কিছু শর্তের বিনিময়ে আমার সাহায্য নিত ও।'

'কী ধরনের শর্ত?'

'আমাকে এই বাচ্চাদের ব্যাপারে কিচ্ছু জানানো হবে না। আর আমিও কোনো প্রশ্ন করতে পারব না।'

এইমাত্র পাওয়া তথ্যগুলো মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখল ইলেনা কয়েক মুহূর্ত। এফবিআইয়ে যখন ছিল, ওর টিম কয়েকটা গির্জা আর এজেন্সির হর্তাকর্তাদের গ্রেপ্তার করেছিল অবৈধ দত্তকের জন্যে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ বাচ্চাদের চাহিদা থাকে আকাশছোঁয়া। অত্যন্ত চড়া দামের বিনিময়ে এসব বাচ্চাকে দত্তক দিত গির্জা আর এজেন্সিগুলো। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দত্তক গ্রহণকারী বাবা-মায়েদের অতীত ইতিহাসে এমন কিছু থাকে যে, তাদের জন্যে আইনিভাবে পুষ্যি নেয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও মোটা টাকার বিনিময়ে কাজ সারা হয়।

মাঝে মাঝে টাকার অঙ্কটা অবিশ্বাস্য রকমের বেশি হয়।

এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ইলেনাকে। এখানে সে অবৈধভাবে বাচ্চা বেচার দায়ে আইজাকসনকে গ্রেপ্তার করতে আসেনি। লোকটা বিশ-ত্রিশ বছর

আগে কী করেছে-না-করেছে সেসবও ওর মাথাব্যথা না। ওর কেবল একটা জিনিসই দরকার–তথ্য।

ওর মনের কথা পড়তে পেরেই যেন আইজাকসন বলে উঠল, 'সত্যি বলছি, আপনাকে সাহায্য করার মতো কোনো তথ্য আমার কাছে নেই।'

'কিন্তু অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের কাছে তো থাকতে পারে, নাকি?'

ধীরে ধীরে ওপরে-নিচে মাথা দোলাল আইজাকসন।

'সে এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'গত বিশ বছর ধরে আমার সাথে কাজ করছে না ও। আগের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।'

'কোথায়?'

শ্রাগ করল আইজাকসন। 'অনেক বছর ধরেই দেখা নেই ওর সাথে। যোগাযোগও নেই। ...তবে গত বছর পোর্টল্যান্ডের একটা ক্যাফেতে কাজ করতে দেখেছিলাম ওকে। কিন্তু আমাকে দেখে ও...' কথা শেষ না করে থেমে গেল লোকটা।

'আপনাকে দেখে কী করল?' তাগাদা দিল ইলেনা।

'চট করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছু নিয়েছিলাম আমি, স্রেফ হাই বলার জন্যে। কিন্তু আমি দরজার কাছে যেতে যেতে...' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আইজাকসন। 'তবে ওটা অ্যালিসন না-ও হতে পারে। আমি হয়তো ভুল দেখেছিলাম। মানে, অন্যরকম দেখাচ্ছিল ওকে। ওর চুল অনেক লম্বা ছিল, রং ছিল কুচকুচে কালো। কিন্তু এই মহিলার চুল একেবারেই খাটো, আর ধবধবে সাদা। কাজেই...' কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। 'নাহ, অ্যালিসনই ছিল ওটা। আমি নিশ্চিত।'

'মি. আইজাকসন?'

চোখ তুলে তাকাল লোকটা।

'ক্যাফেটা কোথায়?'

(1,1) -108- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:44

২৫

চোখ খুলতেই ডিডির অনিন্দ্য সুন্দর চেহারাটা ভেসে উঠল অ্যাশের সামনে।

আমি বোধহয় মরেই গেছি, ভাবল অ্যাশ। মৃত্যুর পর প্রিয়জনকে দেখছি।

'সব ঠিক আছে,' ওকে অবাক করে দিয়ে কথা বলে উঠল ডিডি, কেমন একটা স্বর্গীয় ছোঁয়া ওর কণ্ঠে। 'চুপ করে শুয়ে থাকো।'

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাচ্ছে অ্যাশ। ডিডির পেছনে তাকাল সে। হ্যাঁ, এখনো ট্রুথ হেইভেনের কম্পাউন্ডেই শুয়ে আছে। কামরাটা একেবারেই সাদামাটাভাবে সাজানো। দেয়ালে কোনো কারুকার্য বা ছবি নেই, কোথাও কোনো আসবাবও চোখে পড়ছে না। সেই একই ধূসর রং দেয়ালের।

আরো কয়েকজন লোক রয়েছে ঘরে। ডিডির বাধা সত্ত্বেও বিছানায় উঠে বসল অ্যাশ। দূরের এক কোণে মাদার অ্যাডিওনাকে দেখতে পেল, দুই চোখ মেঝের দিকে নামানো। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বিছানার দুপাশে। অন্য ঘরের দেয়ালে এদের ছবি টাঙানো দেখেছে সে–ভিজিটর আর ভলান্টিয়ার।

ভারটেজের এক ছেলে–ভিজিটর নাকি?–ঘুরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটা কথাও বলল না। অন্যজন মাদার অ্যাডিওনার দিকে ফিরে হিসিয়ে উঠল, 'তোমার ভাগ্য ভালো।'

'আ...আমি দুঃখিত।'

'কী ভাবছিলে তুমি?'

'ও একজন বহিরাগত, এবং অনুপ্রবেশকারী,' চোখ নিচু রেখেই জবাব দিল মাদার অ্যাডিওনা। 'ট্রুথকে বাঁচাচ্ছিলাম আমি।'

'মিথ্যা কথা,' ডিডি প্রতিবাদ করল।

হাত নেড়ে ওকে চুপ করিয়ে দিল ট্রুথের পুত্র, এখনো খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে।

'এটা তোমার জায়গা না, মাদার।'

(2,1) -108- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:44

নতদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল মহিলা।

'এতই যদি দুশ্চিন্তা থাকত, কাউন্সিলের কাছে আসতে তুমি।'

গসম্ভ্রমে মাথা দোলাল মাদার অ্যাডিওনা। 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

তার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল ভারটেজ তনয়। 'তুমি এখন যেতে পারো।'

'যাওয়ার আগে,' অ্যাশের দিকে পা বাড়াল মহিলা, 'আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা করে যেতে চাই।'

বিছানার কাছে পৌঁছে অ্যাশের বাম হাত ধরল মাদার অ্যাডিওনা। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমাকে আঘাত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। সত্য চিরজীবী হোক।'

বাকি দুজনও সমস্বরে বিড়বিড় করল, 'সত্য চিরজীবী হোক।'

অ্যাশের হাত শক্ত করে চেপে ধরল মাদার অ্যাডিওনা।

সেই মুহূর্তে একটুকরো কাগজ চালান করে দিল সে অ্যাশের হাতে।

মহিলার দিকে চোখ তুলে চাইল সে। ওর উদ্দেশে আস্তে করে মাথা কাত করল মাদার অ্যাডিওনা। ওর হাতের মুঠো বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

'এখন কেমন লাগছে?' ডিডি জানতে চাইল।

'ভালো।'

'তাহলে কাপড় পরে নাও। ট্রুথ তোমার সাথে দেখা করতে চান।'

***

একটা ব্ল্যাকবোর্ডে, রঙিন চকে দ্য গ্রিন-এন-লিন ভেগান ক্যাফে-র সমস্ত পণ্যের বিজ্ঞাপন লেখা। ক্যাফের ডান দিকের একটা কর্কবোর্ডে সব ধরনের পরিবেশ মেলা, ইয়োগা ক্লাস আর রান্নার ক্লাসের বিজ্ঞাপন সাঁটা।

কাউন্টারের পেছনে বসে আছে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।

বয়স্ক নিরামিষভোজীর আদর্শ উদাহণ মহিলা। স্বাস্থ্যবতী, লম্বা, চকচকে ত্বক। মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল–এত সাদা যে স্বাভাবিক নাকি তা নিয়ে ধন্ধে পড়ে যেতে হয়। মহিলার দাঁতও ঝকঝকে সাদা, যদিও হাসিটা দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চিত। তার দিকে এগোনোর সময় ইলেনা দেখল ঘনঘন চোখ পিটপিট করছে মহিলা, যেন কোনো খারাপ খবরের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

'আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি?'

মহিলার হাতে নিজের বিজনেস কার্ড গুঁজে দিল ইলেনা, ওতে ওর ব্যক্তিগত নম্বর আছে। কার্ডটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল মহিলা।

'অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার,' বলল ইলেনা।

মহিলার বয়স খুব সম্ভব ষাটের আশেপাশে, যদিও দেখে আরো কমই মনে হয়। ইলেনার মুখে নামটা শুনে চোখ পিটপিটানি আরো বেড়ে গেল তার। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ওই নামের কাউকে চিনি না আমি।'

‘চেনেন। ওটা আপনার নাম। পরে বদলে ফেলেছেন।’

‘আপনার নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে...’

‘আপনার হাতে দুটো উপায় আছে, অ্যালিসন। এক, আড়ালে গিয়ে আপনার সঙ্গে গোপনে কয়েক মিনিট কথা বলব, তারপর চিরদিনের জন্যে বিদায় নেব আমি। আর কখনো মুখ দেখাব না।’

‘নইলে?’

‘নইলে দ্বিতীয় রাস্তা দেখতে হবে আমাকে। আপনার জীবন ওলট-পালট করে দেব।’

পাঁচ মিনিট পর, ক্যাফের পেছনের দিকের কোনায় চলে গেল ইলেনা আর অ্যালিসন। দাড়িঅলা এক লোককে কাউন্টারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে অ্যালিসন। লোকটাকে সে রাউল বলে ডাকছিল। বাসনকোসন মোছার ন্যাকড়া দিয়ে কফির মগ মুছতে মুছতে তীক্ষ্ণ চোখে ইলেনার দিকে চেয়ে আছে রাউল। তাকে পাত্তা দিল না ইলেনা।

চেয়ারে বসেই সরাসরি কাজের কথা পাড়ল সে।

খুন, মক্কেলের নিখোঁজ সন্তান, দত্তক নেয়ার ঘাপলা—পুরো গল্প বলে গেল গড়গড় করে।

প্রথমে কিছুই স্বীকার করল না অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার: ‘আমি এসবের কিছু জানি না।’

‘জানেন না মানে! নিশ্চয়ই জানেন। ফেইথ হোপে দত্তক দেয়ার কাজ করতেন আপনি। মেইশ আইজাকসনকে ওসব দত্তকের ব্যাপারে মুখ খুলতে বারণ করতেন। তাকে আমার দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারি...’

‘তার দরকার নেই।’

‘তাহলে ভণিতা বাদ দিয়ে সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। আপনি বাচ্চা বেচাকেনার ব্যবসা করছিলেন কি না তাতে আমার কিচ্ছু যায়-আসে না।’

কিন্তু সত্যিটা হলো, তাতে ইলেনার অনেক কিছুই যায়-আসে। এসব ঝামেলা চুকে গেলে, আইনের লোককে খবর দেবে সে, যেন মেফ্লাওয়ার আর আইজাকসনের ব্যাপারটা তদন্ত করে। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে হেনরি থর্পকে খুঁজে বের করা।

‘আপনাকে তো নামগুলো বললামই,’ আগের কথার খেই ধরল ইলেনা। ‘ওদের কাউকে মনে আছে?’

‘প্রচুর দত্তকের কাজ করেছি আমি।’

অস্বস্তিতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মেফ্লাওয়ার, কুঁকড়ে গেছে একেবারে। চোখ পিটপিটানি শুরু হয়েছে আবার। চোয়াল ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। হাত দুটো ভাঁজ করে কোলে রাখা। এফবিআইয়ে থাকার সময় শারীরিক ভাষা খুব মন দিয়ে পড়ত ইলেনা। কালে কালে রীতিমতো দক্ষ হয়ে উঠেছে এ

ব্যাপারে। জীবনের কোনো এক পর্যায়ে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার, খুব সম্ভব শারীরিক, নিপীড়নের শিকার হয়েছে। পিতৃ বা মাতৃস্থানীয় অথবা স্বামীর মতো কারো হাতে নির্যাতিত হয়েছে মহিলা। কিংবা কে জানে, হয়তো দুই জায়গায়ই মার খেয়েছে। চোখের ওই পিটপিটানি শুরু হয় মারধোর খাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার সময়। আর কুঁকড়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে নীরবে আত্মসমর্পণ করে করুণা ভিক্ষা করছে।

আরো কিছুক্ষণ ইলেনার দিকে তাকিয়ে থাকল রাউল। তার বয়স পঁচিশ, বড়জোর তিরিশ–অ্যালিসনের নির্যাতনের উৎস হওয়ার পক্ষে বয়েসটা অনেক কম। সে হয়তো মহিলার জীবনকাহিনি জানে, তাই তাকে আর ভোগান্তি সইতে দিতে চায় না। ব্যাপারটা হয়তো কোনোভাবে বুঝে গেছে সে।

হাল ছাড়ল না ইলেনা। 'কাজটা তো আপনি বাচ্চাদের সাহায্য করার জন্যে করেছিলেন, তাই না?'

মুখ তুলে চাইল অ্যালিসন। চোখ এখনো পিটপিট করছে, তবে এখন তাতে আশার ছোঁয়া। 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।'

'ওদেরকে কিছু একটা থেকে বাঁচাচ্ছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কী থেকে?' মহিলার কাছে ঘেঁষে এল ইলেনা। 'ওদেরকে আপনি কীসের থেকে বাঁচাচ্ছিলেন, অ্যালিসন।'

'ওদেরকে আমি স্রেফ ভালো একটা পরিবার দিতে চেয়েছিলাম। ব্যস, আর কিছু না।'

'কিন্তু এই দত্তকগুলোর কোথাও একটা ঘাপলা আছে, তাই না?' ইলেনা বলল। 'বাচ্চাগুলোর কথা কাউকে জানাতে পারছিলেন না আপনি। কাজেই মেইনের ছোট একটা এজেন্সির কাছে গিয়ে ধরনা দিলেন। কিছু টাকাপয়সার বিনিময়ে কাজ সারলেন হয়তো। যাহোক, তাতে কিছু আসে-যায় না।'

'আমি যা-ই করেছি,' চোখ পিটপিট করতে করতে বলল অ্যালিসন, 'ছেলেদের সাহায্য করার জন্যে করেছি।'

মাথা দোলাল ইলেনা, মহিলাকে কথা চালিয়ে যাবার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছে, কিন্তু একটা শব্দ ওর কানে বাজল:

ছেলেদের।

অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার বলেছে, কাজটা সে করেছে ছেলেদের সাহায্য করার জন্যে। বাচ্চাদের নয়, মেয়েদের নয়, ছেলেদের সাহায্য করার জন্যে।

'ওরা সবাই ছেলে ছিল?' জানতে চাইল ইলেনা।

জবাব দিল না অ্যালিসন।

'পেইজ নামটা কি...'

'শুধু ছেলে,' মাথা নেড়ে, ফিসফিসিয়ে বলল অ্যালিসন। 'বুঝতে পারছেন না, ছেলেগুলোকে সাহায্য করার জন্যে কাজটা করেছি আমি?'

(1,1) -110- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:44

'কিন্তু ওরা এখন হরেদরে মারা পড়ছে।'

একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামল অ্যালিসনের গাল বেয়ে।

আরেকটা ধাক্কা দিল ইলেনা। 'ওরা যখন খুন হচ্ছে, আপনি তখন চুপচাপ বসে মজা দেখবেন?'

'ঈশ্বর! আমি কী করেছি? আমি কী করতে পারি?'

'আমার সঙ্গে কথা বলুন, অ্যালিসন।'

'পারব না। আমাকে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াতে গেল সে। বাহু ধরে তাকে থামিয়ে দিল ইলেনা। 'আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার।'

চোখ বন্ধ করে ফেলল অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার। 'খুনগুলো স্রেফ কাকতাল।'

'না।'

'হ্যাঁ। অনেকগুলো বাচ্চাকে দত্তক দিলে এদের মাঝে কেউ কেউ তো অকালে মারা যেতেই পারে।'

'ছেলেগুলোকে কোত্থেকে আনতেন? কারা ছিল এদের বাবা-মা?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' মরিয়া গলায় বলল অ্যালিসন।

'তাহলে বুঝিয়ে বলুন।'

হাত ছুটিয়ে নিল অ্যালিসন। তার মুখের ভঙ্গি এখন বদলে গেছে। এখনো চোখ পিটপিট করছে, এখনো আতঙ্কিত, কিন্তু সেইসাথে তাতে এখন প্রত্যাখ্যানের ছাপও স্পষ্ট।

'ওদেরকে আমি বাঁচিয়েছি,' বলল সে।

'না, বাঁচাননি। আপনি যা-ই করুন না কেন, যে গোপন রহস্যই লুকিয়ে রাখুন না কেন, এত বছর পর সেটা আবার ফিরে এসেছে।'

'অসম্ভব।'

'আপনি হয়তো ভেবেছিলেন অতীতকে কবর দিতে পেরেছেন...'

'কবর দেয়ার চেয়েও বেশি কিছু করেছি। পুড়িয়ে দিয়েছি। সমস্ত প্রমাণ পুড়িয়ে দিয়েছি আমি। এমনকি এখন আর নামগুলোও মনে নেই আমার।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল অ্যালিসন, দুই চোখ জ্বলছে ধকধক করে। 'কান খুলে আমার কথা শুনুন। ওই বাচ্চাদের আঘাত করার মতো কেউ নেই। কেউ যেন ওদের ক্ষতি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করেছি আমি।'

'কী করেছিলেন আপনি, অ্যালিসন?'

জবাব এল না।

'অ্যালিসন?'

'ভদ্রমহিলা কি তোমাকে বিরক্ত করছেন, অ্যালি?'

রাউলের দিকে তাকিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় দীর্ঘশ্বাস গোপন করল ইলেনা। চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে যুবক।

'ব্যক্তিগত আলাপ করছি আমরা,' খেঁকিয়ে উঠল ইলেনা। 'তুমি কাউন্টারে বসে থাকো...'

'আমি তোমার সাথে কথা বলছি না, মিস...'

পরক্ষণেই, কোনোরকম পূর্বসংকেত না দিয়ে, চলে গেল অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।

মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়েছিল ইলেনা। সেই ফাঁকে সরে গেছে অ্যালিসন। সে এখন হলওয়েতে, পেছন দিকে যাচ্ছে।

ইলেনার অনেক গুণ থাকলেও, পায়ের খোঁড়ানির জন্যে দ্রুত হাঁটার গুণটা নেই। ঝটপট পিছু নেয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখল ওকে পেছনে ফেলে অনেক দূরে চলে গেছে অ্যালিসন।

ইলেনা ওর পিছু নেয়া শুরু করতেই ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল রাউল আর তার এক সহকারী। গতি কমাল না ইলেনা। ওকে থামাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল রাউল। যুবকের হাত ওর শরীর স্পর্শ করতেই, তার কাঁধ চেপে ধরে কুঁচকিতে হাঁটুর গুঁতো বসিয়ে দিল ইলেনা।

কোঁত করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল রাউলের মুখ থেকে, পরক্ষণেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। এবার তার সহকারী এগিয়ে এল। এক মুহূর্ত পর গোড়াকাটা গাছের মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে-ও।

লোকগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ইলেনা। কয়েকটা বাথরুম পেরিয়ে পেছনের দরজার কাছে চলে এল। দড়াম করে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজাটা। একটা গলিপথ উন্মুক্ত হয়ে গেল চোখের সামনে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল ইলেনা।

কিন্তু ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।

(1,1) -111- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:44

২৬

এখনো কোনো খবর আসেনি ডাক্তারের কাছ থেকে। ওয়েটিং রুমে অস্থির চিত্তে পায়চারি করছে সাইমন। খানিক আগে ইলেনা রেমিরেজের সাথে হওয়া আলাপটুকু নেড়েচেড়ে দেখছে মনে মনে। অ্যারনের সৎমা এনিডের নম্বর নেই ওর কাছে, তাই কর্ভাল ইনে কল করল। ফোন ধরল এক মহিলা–গলা শুনে মনে হলো সেদিন দেখা হওয়া রিসেপশনিস্ট। তার কাছে একটা মেসেজ রেখে ফোন কেটে দিল সাইমন।

পরবর্তী কাজ: পেইজের চার্জ কার্ড চেক করা। ল্যানফোর্ড কলেজে থাকার সময় পেইজ যে ভিসা কার্ড ব্যবহার করত সেটার ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল সাইমন। মেয়ে নেশার জিনিস কেনার জন্যে কার্ডটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে ওটা বাতিল করে দিয়েছিল সে। তবে এখনো পুরনো রেকর্ড দেখার সুযোগ আছে। সবগুলো চার্জ ডাউনলোড করে চোখ ওটার ওপর চোখ বোলাতে শুরু করল সাইমন।

কাজটা ক্লান্তিকর। কলেজপড়ুয়া ছেলেমেয়েরা যেভাবে টাকাপয়সা খরচ করে, পেইজের প্রথমদিকের খরচও তেমনই ছিল। খাওয়া-দাওয়ার, ল্যানফোর্ড কলেজ স্টোর থেকে বই-খাতা কেনার এবং কলেজের লোগো সংবলিত সোয়েটশার্ট কেনার খরচ।

ডিনএইয়োরস্টোরি-কে কোনো টাকা দেয়া হয়নি কার্ডটা ব্যবহার করে।

তবে উনআশি ডলারের চার্জ পেল একটা সাইমন। অ্যানস-স্টোরি নামের একটা কোম্পানিকে দেয়া হয়েছে টাকাটা। কোম্পানিটার নাম লিখে গুগলে সার্চ করল সে। হ্যাঁ, ওটা একটা জিনিয়ালোজির ওয়েবসাইট। কোম্পানিটা ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে বংশলতিকার সমস্ত শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়। সাইটটা দেখছে, এমন সময় একটা ক্লান্ত নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল ওর নাম ধরে।

'সাইমন গ্রিন?'

ডা. হিদার গ্রু-র পরনে নীল অপারেশনের পোশাক। রংটা পছন্দ হলো সাইমনের, এই গুরুগম্ভীর পরিবেশের সঙ্গে মানানসই।

'আপনার স্ত্রীর সার্জারি শেষ হয়েছে। তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল।'

'ও কি এখনো কোমায়?'

'খুব সম্ভব, হ্যাঁ। তবে যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল, তার সমাধান করেছি আমরা।'

আরো কয়েক কথায় সমস্যাটা ওকে বিস্তারিত জানালেন ডা. গ্রু, কিন্তু তার বেশিরভাগই বুঝতে পারল না সাইমন। কেবল একটা ব্যাপারই বুঝতে পারছে সে:

ইনগ্রিডের অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই।

ডাক্তারের কথা শেষ হলে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'ওকে একটু দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

তাকে রিকভারি রুমে নিয়ে গেলেন ডাক্তার গ্রু। সার্জারির ধকলে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ইনগ্রিডকে। নিথর শুয়ে আছে সে, আগের মতোই, কিন্তু এই নিস্তব্ধতাকে আগের চেয়েও ভয়াবহ মনে হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর হাত ধরল সাইমন, যেন যেকোনো মুহূর্তে প্রাণপাখি উড়ে যাবে ওর দেহ থেকে।

ইনগ্রিডের হাত ধরে অতীতের সুখস্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা চালাল সাইমন। এখানেই জন্মেছিল ওদের বাচ্চারা। প্রতিবার সন্তান জন্ম দেয়ার পর এই হাসপাতালেই হাসিমুখে শুয়ে ছিল ইনগ্রিড। অথচ ওর মুখে এখন আর সেই হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। দুর্বল, পাণ্ডুর, বিধ্বস্ত এক ইনগ্রিডকে শুয়ে আছে আজ সাইমনের চোখের সামনে। ওর অতীত আর জীবনের গোপন অধ্যায় সম্পর্কে ইভোনি যা বলেছিল, সেসব নিয়ে ভাবছে সাইমন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে।

'আমার কিছু যায়-আসে না।' অচেতন স্ত্রীর উদ্দেশে সশব্দে বলল সে।

অতীতে ইনগ্রিড যা-ই করুক–সবচেয়ে জঘন্য কাজগুলো কল্পনা করার চেষ্টা করল সে: চুরি, নেশা, পতিতাবৃত্তি, এমনকি খুনও–সব ক্ষমা করে দেবে সে। ওসবে কিছু এসে-যায় না ওর। কোনো প্রশ্ন করবে না ওসব নিয়ে।

উঠে দাঁড়াল সাইমন, ঠোঁট নিয়ে গেল স্ত্রীর কানের কাছে।

'আমি শুধু তোমাকে ফিরে চাই, সোনা।'

কথাটা সত্যি। আবার একদিকে থেকে মিথ্যেও। স্ত্রী অতীতে কী করেছে-না-করেছে তার থোড়াই কেয়ার করে সে। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। ভোর ছটায় ডিউটি নার্স কে জেনে নিয়ে তাকে নিজের ফোন নম্বর দিল সাইমন। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। ও সাধারণত সাবওয়ে ধরে বাসায় ফেরে, কিন্তু আজ পাতালে থাকতে চায় না। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফোন কল এলে মিস করতে পারে, পাতালে ফোনের নেটওয়ার্ক থাকে না।

হাসপাতাল থেকে আপার ওয়েস্ট সাইডের বাসায় যেতে বড়জোর পনেরো মিনিট লাগবে। হাসপাতাল থেকে জরুরি ফোন এলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে পারবে।

ইনগ্রিডকে ছেড়ে আসতে মোটেও ইচ্ছে করছে না, কিন্তু জরুরি কয়েকটা কাজ আছে হাতে।

অ্যাপ খুলে একটা রাইড শেয়ার ডাকল সাইমন। সেভেন্টি ফিফথ স্ট্রিটের কাছে কলম্বাস অ্যাভিনিয়ে ডুয়েন রিডমি ফার্মেসির সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। দৌড়ে ভেতরে ফার্মেসির গেল সাইমন, ফিরে এল ছয় প্যাকেট টুথব্রাশ নিয়ে। বাড়ি ফিরে দেখে, অ্যাপার্টমেন্টটা শুনশান। করিডরে দাঁড়িয়ে ডান দিকের বেডরুমে উঁকি দিল সাইমন।

একদিকে কাত হয়ে, গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছে স্যাম। পা দুটো বুকের কাছে উঠিয়ে দিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে। ছেলেটা সবসময় এভাবেই ঘুমায়। ওকে জাগাল না সাইমন। রান্নাঘরে ঢুকে জিপলক প্লাস্টিক ব্যাগ রাখা ড্রয়ারটা খুলল সে। কয়েকটা ব্যাগ বের করে নিয়ে নিঃশব্দে 'মেয়েদের বাথরুমের' দিকে পা বাড়াল, বাথরুমটা ছোটবোন আনিয়ার সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করত পেইজ।

যতক্ষণ পর্যন্ত রোঁয়া না ওঠে যায়, টুথব্রাশ বদলায় না বাচ্চারা। তাই দুই মাস অন্তর অন্তর নতুন ব্রাশ কিনে বদলে দেয়ার দায়িত্বটা সাইমনই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আজও এ কাজই করতে যাচ্ছে সে।

পেইজ সর্বশেষ থাকার সময় যে টুথব্রাশটা ব্যবহার করেছিল, সেটা এখনো আছে বাথরুমে। কতদিন আগে এসেছিল মেয়েটা?

ওর ব্রাশটা সাবধানে তুলে নিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখল সাইমন। আশা করছে নমুনা বের করার মতো যথেষ্ট ডিএনএ পাওয়া যাবে ওতে। বাথরুম থেকে বেরোতে গিয়ে সহসা থমকে দাঁড়াল ও।

ইনগ্রিডকে সে বিশ্বাস করে। সত্যিই করে।

তবু পরে-পস্তানোর-চেয়ে-এখন-সাবধান-থাকা-ভালো নীতির ওপর আস্থা রেখে আনিয়ার ব্রাশটা আলাদা একটা জিপলক ব্যাগে রাখল সে। তারপর অন্য বাথরুমে ঢুকে স্যামেরটাও ঢোকাল আলাদা একটা ব্যাগে।

নিজেকে ওর মানসিকভাবে অসুস্থ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করছে যেন ইনগ্রিডের সঙ্গে।

কাজ সেরে নিজের ঘরে চলে গেল সাইমন। প্লাস্টিক ব্যাগগুলো নিজের ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে রাখল। ফোন চেক করে দেখল কোনো মেসেজ-টেসেজ আছে কি না। নেই। অসময়ে হয়ে যাচ্ছে, তবু সুজি ফিস্ককে মেসেজ করল সে:

কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ি ফিরেছি। তুমি জেগে থাকলে, আনিয়াকে ঘুম থেকে তুলে ব্রেকফাস্টের জন্যে বাসায় পাঠাতে পারবে?

ওকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সুজি:

এখুনি ওঠাচ্ছি। ইনগ্রিডের অবস্থার উন্নতি হয়েছে?

সাইমন লিখল, না, উন্নতি নেই। তারপর আনিয়ার দিকে খেয়াল রাখার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল তাকে। সুজি জবাব দিল, আনিয়ার সঙ্গ খুব উপভোগ্য, ওকে সামলাতে একটুও কষ্ট হয়নি, খুব লক্ষ্মী হয়ে থেকেছে। সাইমন জানে, কথাটা সত্যি। সুজি দুই মেয়ের মা। এই বয়সের বেশিরভাগ বোনের মতো ওর দুই মেয়ের মধ্যেও সারাক্ষণই ঠোকাঠুকি লেগে থাকে। এদের সাথে তৃতীয় একজন ঢোকায় দুজনের মারামারি ভদ্রতার খাতিরে হলেও একটু কমেছে।

সাইমন মেসেজ করল: *তবু আমি কৃতজ্ঞ।*

তারপর কিচেনে ফিরে গেল সে। দ্রুত হাতে নাস্তা বানাল ছেলেমেয়ের জন্যে। ফিস্কদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এসেই বাপকে জড়িয়ে ধরল আনিয়া। ওকে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে ফেলল সাইমন।

গোল ডাইনিং টেবিলটাকে ঘিরে বসল তিনজনে। ইনগ্রিডের জোরাজুরিতেই গোল টেবিল বসানো হয়েছে রান্নাঘরে। খেতে বসে কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা মুখ চকলেটে মাখামাখি হয়ে গেল আনিয়ার। সেটা নিয়ে ওকে টিপ্পনী কাটল স্যাম।

আনিয়া নিজের চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরল। স্যামও জড়িয়ে ধরল ওকে। ছোটবোনের সান্নিধ্যে খানিকটা সান্ত্বনাও পেল সে। আবারও বুকটা মুচড়ে উঠল সাইমনের। ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্যাম ইনগ্রিডের অভাবটা বোধ করছে বড্ড বেশি করে। ইনগ্রিডের জ্ঞান ফেরার পর এই মুহূর্তের কথা ওকে জানাবে সে। বলবে, ওর ছেলে কীভাবে ছোটবোনের সান্নিধ্যে থেকে শোক সহ্য করার শক্তি সংগ্রহ করেছে।

কথাটা শুনে খুব খুশি হবে ইনগ্রিড।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসনকোসন ধুতে লেগে গেল স্যাম আর আনিয়া। ওদের পরিবারের নিয়ম–রান্না যে করবে ধোয়ামোছার কাজ সে করবে না। সাইমন নিজের বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজাটায় তালা লাগানো আছে। বাচ্চারা যাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় ভেতরে এসে মনোযোগ নষ্ট করতে না পারে সেজন্যে লাগিয়েছিল। তালাটা লাগিয়ে দিয়ে ইনগ্রিডের ক্লজিট খুলল সাইমন। একেবারে পেছন দিকে ছয়টা ব্যাগ ঝুলছে হরেক রঙের জামার সাথে। নীল রঙের চতুর্থ ব্যাগটা খুলল সে। তারপর হাত ঢুকিয়ে দিল ওটার ভেতরে।

এই ব্যাগের মধ্যে টাকাপয়সা লুকিয়ে রাখে ওরা।

কাগজে মোড়ানো দশ হাজার ডলারের একটা বান্ডিল বের করে নিয়ে ব্যাকপ্যাকে, টুথব্রাশগুলোর সঙ্গে রেখে দিল সে। তারপর ফোনটা আরেকবার চেক করে রান্নাঘরে ফিরে গেল। স্কুলের জন্যে তৈরি হয়ে গেছে আনিয়া।

বাবাকে আরেকবার জড়িয়ে ধরে বিদায় জানিয়ে সুজি ফ্রিস্কের সঙ্গে চলে গেল ও। দরজা বন্ধ করে ইনগ্রিডের সঙ্গে আরেক দফা কাল্পনিক কথাবার্তা চালাল সাইমন। এবার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইল এসব ঝুটঝামেলা কাটিয়ে ওঠার পর সুজিকে কী উপহার দেয়া যায়।

সহসা টের পেল সাইমন, সারাক্ষণই ইনগ্রিডের সঙ্গে কাল্পনিক কথাবার্তা চলছে ওর। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁক ছাড়ল সে, 'স্যাম? রেডি?'

এলিভেটরে চেপে নিচে নেমে এল বাপ-ছেলে। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল তাতে। ড্রাইভার বিদেশি। গাড়ি চালাতে চালাতে ইয়ারপিসে বিদেশি একটা ভাষায় কথা বলছে লোকটা। ভাষাটা সাইমনের অপরিচিত।

'তোমার মায়ের একটু সমস্যা হয়েছিল,' ছেলেকে জানাল সে। 'তবে এখন ঠিক আছে।'

তারপর পুরো ঘটনা খুলে বলল ওকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সব শুনল স্যাম। হাসপাতাল পৌঁছে সাইমন বলল, 'ওপরে গিয়ে মার সাথে বসো। আমি একটু পর আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'একটা কাজ আছে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল স্যাম?

'কী হলো?'

'তুমি মাকে গুলি খেতে দিয়েছ।'

আত্মসমর্থনের জন্যে মুখ খুলল সাইমন, কিন্তু পরক্ষণেই বন্ধ করে ফেলল।

'মাকে রক্ষা করা উচিত ছিল তোমার।'

'জানি,' দোষ মেনে নিল সাইমন। 'সেজন্য আমি দুঃখিত।'

আর দেরি করল না সে, ছেলেকে সাইডওয়াকে রেখে এগিয়ে চলল। সেই মুহূর্তটায় ফিরে গেল ও। লুথারকে পিস্তল তাক করতে দেখল মানসচোখে। দেখল, নিজে গতিপথ থেকে সরে যাচ্ছে সে, যাতে বুলেটটা ওর বদলে ইনগ্রিডকে আঘাত করে।

কী ভিতু সে!

কিন্তু আসলেই কি তা-ই ঘটেছিল?

ও কি আসলেই সরে গিয়েছিল বুলেটের গতিপথ থেকে? জানে না সাইমন। সেই 'স্মৃতিটা' সত্যি বলে মনে হয় না ওর, কিন্তু...একটু পিছিয়ে গেলে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে, সময় আর প্রকৃত স্মৃতিগুলো সব জট পাকিয়ে গেছে। ঘটনাটা ওর মনে যে ঘা সৃষ্টি করেছে তা কখনো শুকাবার নয়।

ওর কি এর চেয়েও বেশি কিছু করার ছিল? ও কি বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পারত?

হয়তো।

সাইমনের সত্তার একটা অংশ বলছে, ওর চিন্তা-ভাবনা অন্যায্য। অত্যন্ত দ্রুত, চোখের নিমেষে ঘটে গেছে গোটা ঘটনা। প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনো সময়ই পায়নি ও। কিন্তু তাতে বাস্তবতাটা বদলে যাচ্ছে না। এর চেয়েও বেশি করা উচিত ছিল ওর। ইনগ্রিডকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়া উচিত ছিল। ওর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত সাইমন।

'মাকে রক্ষা করা উচিত ছিল তোমার...'

শোভলিন প্যাভিলিয়নে ঢুকে পড়ল সাইমন। এলিভেটরে চেপে বারোতলায় উঠে এল। রিসেপশনিস্ট ওকে করিডর ধরে ল্যাবে নিয়ে গেল। র‍্যান্ডি স্প্র্যাট নামে এক ল্যাব টেকনিশিয়ান গ্লাভস পরা হাতে করমর্দন করে স্বাগত জানাল ওকে।

'কাজটা যথাযথ নিয়ম মেনে করছি না কেন বুঝতে পারছি না,' স্প্র্যাট বলল।

কিছু না বলে ব্যাকপ্যাক খুলল সাইমন। টুথব্রাশ ভরা প্লাস্টিকের ব্যাগ তিনটে ধরিয়ে দিল স্প্র্যাটের হাতে। প্রথমে ভেবেছিল শুধু পেইজের ব্রাশটা আনবে–কিন্তু পরে ওর মনের সবচেয়ে অন্ধকার কোণটা স্থির করল, বাকি দুজনই বা বাদ থাকে কেন!

'আমি এদের বাপ কি না জানতে হবে।' তারপর পেইজের হলুদ ব্রাশটা দেখাল সে। 'তবে এটার ব্যাপারে জানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

কাজটা করতে ভালো লাগছে না সাইমনের। নিজেকে প্রবোধ দিল সে, এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, নিশ্চয়তার প্রশ্ন।

পরক্ষণেই আবার উপলব্ধি করল, জোর করে নিজের কাজকে যৌক্তিকতা দিতে চাইছে সে।

কিছু এসে-যায় না তাতে।

'আপনারা বলেছিলেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফল জানাতে পারবেন,' সাইমন বলল।

মাথা দোলাল স্প্র্যাট। 'তিন দিন সময় দিন।'

'লাভ নেই।'

'মানে?'

ব্যাকপ্যাক থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করল সাইমন।

'বুঝলাম না।'

'এখানে নগদ দশ হাজার ডলার আছে। আজকের মধ্যে ফল জানান, আরো দশ দেব।'

২৭

দ্য ট্রুথের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে।

বিছানায় শায়িত মানুষটাকে দেখে অন্তত তা-ই মনে হলো অ্যাশের।

ক্যাস্পার ভারটেজের দুই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বিছানার দুপাশে। অন্তিম দিনগুলোতে বাপকে পাহারা দিচ্ছে দুই ক্লান্ত-শ্রান্ত প্রহরী। শোকের চাদর চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে দুজনকে। দুই ভাইয়ের আসল নাম জানে না অ্যাশ—অন্য কোনো নাম আছে কি না সে ব্যাপারেরও নিশ্চিত নয়—তেমনি কোন্‌টা ভিজিটর আর কোন্‌টা ভলান্টিয়ার, তাতেও ওর কিছু এসে-যায় না।

হাতজোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে অ্যাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডিডি, দুই চোখ আনত। দুই ভাইও একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। কোনার দিকে দুজন ধূসর ইউনিফর্ম পরা মহিলা সমস্বরে, ধীরে-সুস্থে ফোঁপাচ্ছে; যেন এই পরিস্থিতির উপযুক্ত আবহসংগীতের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বর্তেছে তাদের ওপর।

কামরায় একমাত্র ট্রুথের চোখই খোলা এবং ওপরের দিকে তোলা। এক ধরনের সাদা টিউনিক পরা মানুষটা বিছানার মাঝখানে শুয়ে রয়েছে। তার ধূসর দাড়িগুলো বেশ লম্বা, মাথার চুলও। স্কুলের লাইব্রেরিতে এক বইয়ে সিস্টিন চ্যাপেলের দেয়ালে আঁকা একটা ঈশ্বরের ম্যুরাল দেখেছিল অ্যাশ। ঠিক সেই ম্যুরালের মতো দেখাচ্ছে লোকটাকে।

ম্যুরালটায় ঈশ্বরকে শক্তিশালী, পেশিবহুল দেখাচ্ছিল। কিন্তু ট্রুথকে মোটেও শক্তিশালী দেখাচ্ছে না। ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ক্ষয়ে আসছে তার। কিন্তু লোকটার মুখের হাসি এখনো আগের মতোই উজ্জ্বল, চোখে অপার্থিব আলো। তার সাথে চোখাচোখি হলো অ্যাশের। মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারল কী হচ্ছে এখানে। স্রেফ চোখের দৃষ্টি দিয়ে গেঁথে ফেলছে ওকে ট্রুথ। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও প্রায় অতিপ্রাকৃতিক সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী বুড়ো।

এক হাত তুলে ইশারায় অ্যাশকে কাছে ডাকল ট্রুথ। ডিডির দিকে ফিরল সে। মাথা দুলিয়ে ওকে এগিয়ে যেতে বলল মেয়েটা। ট্রুথের মাথা নড়ছে না,

তবে তার চোখ অ্যাশের পিছু পিছু ঘুরছে। ছেলেটার এক হাত ধরল সে। আশ্চর্য রকমের শক্তি ধরে বুড়ো কব্জিতে।

‘ধন্যবাদ, অ্যাশ।’

লোকটার অনন্যসাধারণ আকর্ষণ আর সম্মোহনী ক্ষমতা অনুভব করতে পারছে অ্যাশ। সব মানুষই একটা-না-একটা বিশেষ গুণের অধিকারী। কেউ দ্রুত দৌড়াতে পারে, কেউ গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরে, কেউ কেউ আবার গণিতে খুব দক্ষ। তেমনি এই লোকও–ক্যাস্পার ভারটেজ–বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী। এই গুণগুলো দেখে যে-কেউ হতবাক ও সম্মোহিত হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে যারা একটা জিনিসের ওপর বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, তারা সম্মোহিত হয় সবচেয়ে বেশি।

অ্যাশ অবশ্য ওরকম কেউ নয়।

মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখার ক্ষমতা আছে ওর। এই মুহূর্তে সে একইসঙ্গে কৌতূহলী এবং বিচলিত। ও কাজ করে বেনামে। নিরাপদ ওয়েবসাইট ও অ্যাপের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড দিয়ে বেনামে যোগাযোগ করতে হয় ওর সঙ্গে। যারা ওকে ভাড়া করে সে কখনো তাদের সামনাসামনি হয় না। কক্ষনো না।

ডিডি এসব জানে। কাজটার বিপদ সম্পর্কেও জানে সে।

বুড়োর হাত ছেড়ে দিয়ে ডিডির দিকে তাকাল অ্যাশ। চোখে নীরব প্রশ্ন–ডিডির কাছে জানতে চাইছে–ওকে এখানে নিয়ে এল কেন ও? জবাবে স্নিগ্ধ হাসি দিল মেয়েটা। যেন বলতে চাইল, ধৈর্য ধরো।

এতক্ষণ ফোঁপাচ্ছিল যে মহিলা দুজন, তারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল দুই গার্ড–অ্যাশকে ইলেকট্রিক শক দিয়েছে যে বেজন্মাটা, সে-ও আছে। এবারও ব্যাপারটা পছন্দ হলো না অ্যাশের। বিশেষ করে প্রথম গার্ডের চেহারায় পরিতৃপ্তির ছাপটা একটুও পছন্দ হলো না তার।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর, বহু কষ্টে মুখ খুলতে পারল বৃদ্ধ। ‘শাইনিং ট্রুথ চিরজীবী হোক।’

ঘরের বাকিরাও তাল মেলাল তার সঙ্গে: ‘শাইনিং ট্রুথ চিরজীবী হোক।’

আচার। এসব ধর্মীয় আচারকে অ্যাশ মনে-প্রাণে ঘৃণা করে।

‘যাও,’ ওকে বলল বুড়ো। ‘সত্য চিরস্থায়ী হবে।’

বাকিরাও একঘেয়ে সুরে বলল, ‘সত্য চিরস্থায়ী হবে।’

অ্যাশের দিকে চেয়ে সন্তুষ্টির হাসি দিল প্রথম গার্ড। তারপর ডিডির দেহের ওপর ঘুরে এল তার চোখ। এরপর অ্যাশের দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না অ্যাশ। ডিডির দিকে চাইল সে। মেয়েটা জানে সব।

এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা একটু একটু করে বুঝতে পারছে সে।

এক ভাই একটা চাবি ধরিয়ে দিল অ্যাশের হাতে। ‘একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। কেউ ট্রেস করতে পারবে না।’

(1,1) -115- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:46

চাবিটা নিল অ্যাশ। প্রথম সুযোগেই রাস্তার ধারে থেমে, একইরকম অন্য একটা গাড়ির সাথে লাইসেন্স প্লেট বদলে নেবে সে। কোনো ঝুঁকি নেবে না। এই স্টেট থেকে বেরোনোর পর হয়তো আবার লাইসেন্স প্লেট বদলে নেবে।

'আমাদের বিশ্বাস, ব্যাপারটা তুমি সামলাতে পারবে,' দ্বিতীয় ভাই বলল।

কিছু না বলে দরজার দিকে এগোল অ্যাশ। পুরোটা সময় হাসি হাসি মুখ করে ওর দিকে চেয়ে রইল প্রথম গার্ড। অ্যাশ যখন তার কাছে পৌঁছে মুখোমুখি দাঁড়াল, তখনও হাসি মুছল না বেজন্মাটার মুখ থেকে। ওর হাতের তালুতে যখন ছুরিটা বেরিয়ে এল, ওটার ধারালো ফলা গার্ডটার গলা ফাঁক করে দিল, তখনও হাসি লেগে রইল লোকটার ঠোঁটে।

ছুরি চালানোর পর পিছিয়ে গেল না অ্যাশ। গার্ডের গলা থেকে ছিটকে আসা রক্তে ভিজে যেতে দিল নিজের চেহারা। একবারের জন্যেও শিউরে উঠল না। অপেক্ষা করছে, কখন সবিস্ময়ে মরণশ্বাস তুলবে ব্যাটা। অচিরেই ইচ্ছে পূরণ হলো ওর।

এবার দ্বিতীয় গার্ডের দিকে এগোল সে। লোকটা এখনো বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে সঙ্গীর দিকে। তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল অ্যাশ।

গলাকাটা প্রথম গার্ড ধপ করে পড়ে গেছে মেঝেতে। গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে দুই দিয়ে। দেখে মনে হচ্ছে লোকটা যেন নিজেই নিজেকে খুন করছে গলা টিপে। জান্তব ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে তার গলা দিয়ে।

কেউ নড়ছে না, কথা বলছে না। খিঁচুনি দিয়ে উঠল গার্ডটা, হাত-পা ছুঁড়ছে জবাই হওয়া জন্তুর মতো, অবশেষে ধীরে ধীরে নিথর হয়ে গেল তার দেহ।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পুরো নাটকটা দেখেছে ভারটেজ ভাইয়েরা। জীবিত গার্ডও হতভম্ব। ডিডির চেহারায় এখনো সেই স্নিগ্ধ হাসি। তাতে অবাক হয়নি অ্যাশ। ওকে অবাক করল ট্রুথের চেহারা সবজান্তা ভাবটা।

লোকটা কি আগে থেকেই জানত কী করতে যাচ্ছে অ্যাশ?

ওর উদ্দেশে মাথাটা আলতো করে দোলাল ট্রুথ। যেন বলতে চাইছে: 'মেসেজ পেয়েছি।'

অ্যাশের জন্যে ব্যাপারটা খুব সোজা। ওকে আঘাত করেছিল গার্ডটা, তার মূল্য চুকাতে হয়েছে তাকে। তুমি আমাকে ঘুষি মারলে, আমি তোমাকে দ্বিগুণ জোরে ঘুষি মারব। খুব সহজ হিসেব।

ঘটনাটা কামরায় উপস্থিত বাকিদের জন্যেও একটা বার্তা। আমার সাথে লাগতে এলে আমি তোমাদের সাথে দ্বিগুণ উৎসাহে লাগতে যাব। যে কাজের জন্যে ওকে ভাড়া করা হয়, সেটা নিখুঁতভাবে করে অ্যাশ। কাজের বিনিময়ে টাকা পেয়ে গেলে সবকিছু ওখানেই চুকেবুকে যায়। ওকে ডাবল ক্রস করার চেষ্টা করে কোনো ফায়দা নেই।

সত্যি বলতে কী, ওকে ডাবল ক্রস করাটা হবে মস্ত ভুল।

দুই ভাইয়ের দিকে চাইল অ্যাশ। 'আশা করি রক্ত পরিষ্কার করার লোক আছে তোমাদের?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল তারা।

মুখ থেকে রক্ত মোছার জন্যে একটা তোয়ালে দিল ডিডি ওর হাতে। ঝটপট কাজটা সারল সে।

তারপর বলল, 'আমরা নিজেরাই পথ দেখে যেতে পারব।'

ডিডিকে নিয়ে আবার গেটের কাছে ফিরে এল অ্যাশ। একটা অ্যাক্যুরা আরডিএক্স অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ডিডির জন্যে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে ধরল সে। কাজটা করার সময় আশ্রমের দিকে ফিরে চাইল–দেখল পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মাদার অ্যাডিওনা। একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে মহিলা। এত দূর থেকেও তার চোখের আকুতি দেখতে পাচ্ছে সে।

আতঙ্কিত চেহারায় মাথা ঝাঁকাল মহিলা।

কোনো জবাব দিল না অ্যাশ।

ঘুরে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল ও। গাছে ছাওয়া পথ ধরে ফিরে চলল–রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে, ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে বিন্দুর মতো হয়ে যাচ্ছে ট্রুথ হেইভেনের গেট। সদর রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। প্রথম ট্রাফিক লাইট পেতেই মাদার অ্যাডিওনার দেয়া চিরকুটটা বের করল সে। প্রথমবারের মতো পড়ল কাগজটা:

ওকে খুন কোরো না। প্লিজ।

বড় বড় হরফে লেখা পাঁচটা শব্দ। তার নিচে বাঁকা হরফে লেখা:

এই মেসেজটা কাউকে দেখিয়ো না, এমনকি মেয়েটাকেও না। এখানে কী হচ্ছে, কল্পনাও করতে পারবে না।

'ওটা কী?' জানতে চাইল ডিডি।

চিরকুটটা ওর হাতে দিল অ্যাশ। 'আমার রুম থেকে বেরোনোর আগে কাগজটা দিয়েছিল মাদার অ্যাডিওনা।'

চিরকুটটা পড়ল ডিডি।

'এখানে কী হচ্ছে, কল্পনাও করতে পারবে না,' বিড়বিড় করল অ্যাশ। 'মানে কী?'

'জানি না,' ডিডি জবাব দিল। 'কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেছ দেখে খুশি হয়েছি।'

'ওই মহিলার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস করি আমি তোমাকে।'

'তোমাকে ছুরিটা দিয়ে বোধহয় ভালোই করেছি।'

'হ্যাঁ, কোনো ক্ষতি হয়নি,' অ্যাশ বলল। 'আমি যে ওকে খুন করব, তুমি জানতে?'

'হ্যাঁ। কেউ তোমাকে একটা ঘুষি দিলে, তুমি তাকে দুটো ফেরত দাও।'

(1,1) -116- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:46

'তোমার নেতারা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়নি?'

'সত্য সবসময়ই জয়ী হয়।'

'ওই গার্ডটাকে মারা সত্য ছিল?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ডিডি। 'সে মারা যাচ্ছে। তুমি তো তা জানো, তাই না?'

'ট্রুথের কথা বলছ?'

হাসল মেয়েটা। 'সত্য কখনো মরতে পারে না। তবে হ্যাঁ, এখন যে লোক সত্যের প্রতিমূর্তি, সে মারা যাচ্ছে।'

'তার মৃত্যুর সাথে কি আমাকে যে কাজের জন্যে ভাড়া করা হয়েছিল, তার কোনো সম্পর্ক আছে?'

'সেটা জেনে কি লাভ আছে কোনো? কিছু এসে-যায় তাতে?'

খানিকক্ষণ ভেবে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাশ। 'নাহ, এসে-যায় না।'

সিটে হেলান দিয়ে, দুই হাঁটু তুলে বসল ডিডি।

'মাদার অ্যাডিওনার চিরকুটটা পড়ে কী মনে হলো?' জানতে চাইল অ্যাশ।

একগোছা চুল আঙুলে প্যাঁচাতে লাগল ডিডি। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ট্রুথকে জানাবে ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করল অ্যাশ।

কয়েক মুহূর্ত ভাবল ডিডি। 'না, এখন জানাব না। এখন আমাদের কাজের ওপর মনোযোগ দিতে চাই।'

২৮

আইসিউতে ফিরে এসে অবাক হয়ে গেল সাইমন। ডিটেকটিভ আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। মুহূর্তের জন্যে আশায় ভরে উঠল ওর বুক–পেইজকে খুঁজে পেয়েছে নাকি ওরা? কিন্তু ফ্যাগবেনলের চেহারা দেখেই বুঝতে পারল, কোনো সুখবর নেই। যত দ্রুত ফুলে উঠেছিল, তারচেয়েও দ্রুত চুপসে গেল আশার বেলুনটা।

'পেইজের ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি,' বলল ফ্যাগবেনলে।

'তাহলে?'

ডিটেকটিভের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল সাইমন, ইনগ্রিডের পাশে বসা স্যাম কী করছে দেখার জন্যে। নতুন কিছু ঘটছে না ওখানে, তাই ফ্যাগবেনলের দিকে মনোযোগ সরিয়ে আনল সে।

'ব্যাপারটা লুথার রিটযকে নিয়ে।'

ওর স্ত্রীকে গুলি করেছে যে ছেলেটা। 'কেন, ওর কী হয়েছে?'

'ছাড়া পেয়ে গেছে।'

'কী?'

'জামিনে বেরিয়েছে। রোকো বন্ড সই করেছে ওর জন্যে।'

'বিচারের জন্যে রিমান্ডে নেয়া হয়নি ওকে?'

'সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী অনুসারে, প্রমাণ হওয়ার আগে সব অভিযুক্তকে নির্দোষ ধরে নেয়া হয়। গোটা আমেরিকাতেই এই কাজ হয়, জানেনই তো।'

'ও ছাড়া পেয়ে গেছে?' ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল সাইমন। 'তাতে ইনগ্রিডের বিপদ বাড়বে না তো?'

'নাহ। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভালো।'

একজন নার্স চলে গেল পাশ দিয়ে। পথ আটকে কথা বলছে বলে ওদের দিকে বিরক্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গেল সে যেতে যেতে। একপাশে সরে এল দুজনে।

'ব্যাপার হচ্ছে,' ফ্যাগবেনলে বলল, 'লুথারের বিরুদ্ধে কেসটা নিরেট নয়।'

'কেন?'

'ও দাবি করছে, আপনি ওকে প্রথম গুলি করেছিলেন।'

'আমি?'

'আপনি বা আপনার স্ত্রী–দুজনের যেকোনো একজন।'

'গান পাউডারের টেস্ট চালাননি ওর ওপর?'

'চালিয়েছি। দুটো দাবি করেছে ব্যাটা। এক, সে শ্যুটিং প্র্যাকটিস করছিল। দুই, তাতেও সন্তুষ্ট না হলে, আপনি ওর ওপর প্রথম গুলি চালিয়েছিলেন বলে সে-ও গুলি চালিয়েছে আপনার ওপর।'

ব্যঙ্গের হাসি দিল সাইমন। 'ওর কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'দেখুন, ঘটনার সব খুঁটিনাটি আমি জানি না। কিন্তু লুথার রিটয দাবি করছে–সে গুলি চালিয়েছিল আত্মরক্ষার্থে। ফলে কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন উঠবে এখন।'

'যেমন?'

'যেমন, আপনি আর ইনগ্রিড ওখানে গিয়েছিলেন কেন?'

'আমাদের মেয়েকে খুঁজতে।'

'ঠিক। তার মানে আপনারা উত্তেজিত এবং চিন্তিত ছিলেন, তাই না? আপনারা এমন একটা নেশার আখড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে আপনাদের মেয়ে ঘন ঘন যেত। সে কোথায় লুকিয়েছে, তা আপনাদের জানাতে রাজি হচ্ছিল না কেউ। হয়তো সেজন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন আপনারা। কাজেই আপনি বা আপনার স্ত্রী পিস্তল বের করে...'

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন।'

'...ওকে, মানে লুথারকে গুলি করেন। ফলে সে-ও পাল্টা গুলি করে।'

মুখ বাঁকাল সাইমন।

'লুথার বাড়ি ফিরে গেছে, গুরুতর জখম থেকে ধীরে ধীরে সেরে উঠছে...'

'আর আমার স্ত্রী...' লাল হয়ে গেছে সাইমনের চেহারা, '...এখান থেকে দশ গজ দূরে কোমায় শুয়ে আছে।'

'আমি জানি। কিন্তু এ কথাও তো সত্যি যে, লুথারকেও গুলি করেছে কেউ।'

আরেকটু কাছে ঘেঁষে এল ফ্যাগবেনলে। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল সাইমন। বুঝতে পারল কী হচ্ছে এখানে।

'আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানতে না পারছি ওকে কে গুলি করেছিল, লুথারের আত্মরক্ষার দাবি যৌক্তিক সন্দেহ জিইয়ে রাখবে। সাক্ষীরা, যদি ওখানে উপস্থিত কেউ এগিয়ে আসে আরকি, আপনার সমর্থনে কথা বলবে

না। ওরা মুখ খুলবে লুথারের সমর্থনে।' হাসল ফ্যাগবেনলে। 'ওই আখড়ায় আপনার কোনো বন্ধু ছিল না, সাইমন। নাকি ছিল?'

'না,' বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে মিথ্যেটা বলে দিল সাইমন। লুথারকে গুলি করে ওদের বাঁচিয়েছে কর্নেলিয়াস, কিন্তু সে কথা ও প্রাণ থাকতে স্বীকার করবে না। 'প্রশ্নই ওঠে না।'

'ঠিক। কাজেই আর কোনো সন্দেহভাজন নেই। সুতরাং, লুথারের উকিল দাবি করবে, আপনিই প্রথম লুথার রিটযকে গুলি করেছিলেন। সবাই এদিক-ওদিক পালানোর পর যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন আপনি। সেই সুযোগে পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলেন। আপনার হাতে দস্তানা ছিল, ওগুলোও লুকিয়ে ফেলেন। এরকম হাজারটা দাবি করবে ওরা।'

'ডিটেকটিভ?'

'বলুন?'

'আপনি কি আমাকে গ্রেপ্তার করছেন?'

'না।'

'তাহলে এসব নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা বোধহয় যাবে। লুথারের গল্প বিশ্বাস করি না আমি। কিন্তু একটা ব্যাপার অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে।'

'কোন্ ব্যাপার?'

'ওকে শনাক্ত করার জন্যে আমরা যখন ওর হাসপাতাল রুমে গিয়েছিলাম, সে কথা মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'লুথারের মাথা কিন্তু অত ভালো না। মানে, ঘটনাস্থলে গুলি খাওয়ার কথা স্বীকার করার মতো বোকা বলা যায় ওকে।'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে, ওর মগজ যে খুব ধারালো, তা না।'

'ঠিক।'

'অথচ ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম কাজটা কেন করেছে, সে কী বলেছিল মনে আছে?'

কিছু বলল না সাইমন।

'আপনাকে দেখিয়েছিল ও, সাইমন। বলেছিল, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না কেন?'

মনে আছে সাইমনের। মনে আছে, রাগে কেমন ফুঁসছিল সে। লুথারের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করছিল নরকের কীটটাকে শেষ করে দিতে। ওরকম একটা কীট ওর ইনগ্রিডকে খুন করে ফেলার ক্ষমতা রাখে, ভাবতেই রাগে দাউদাউ করে জ্বলছিল ওর মাথা।

'মিছেই আমার ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করছিল ও, ডিটেকটিভ। আপনাদের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছিল।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'ওর মাথায় অত ঘিলু আছে বলে মনে হয় না, সাইমন। আমার ধারণা, লুথার এমন কিছু জানে যা আমাদেরকে এখনো বলেনি।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সাইমন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী জানে?'

'আপনিই বলুন,' ফ্যাগবেনলে বলল। 'লুথারকে কে গুলি করেছিল, সাইমন? কে বাঁচিয়েছিল আপনাদের?'

'জানি না।'

'মিথ্যে কথা।'

কিছু বলল না সাইমন।

'আরেকটা ব্যাপার, স্যার,' বলে চলল ফ্যাগবেনলে। 'একটা ঘরের মধ্যে একবার যখন একটা মিথ্যে ঢুকে পড়ে, তখন আরো একগাদা মিথ্যে ঢোকে ওটার পিছু পিছু। তারপর মিথ্যেগুলো সব পুঞ্জিভূত হয়ে সত্যটাকে চাপা দিয়ে দেয়। কাজেই আরেকবার করছি প্রশ্নটা: কে গুলি করেছিল লুথারকে?'

'বলেছিই তো,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সাইমন, 'জানি না। আর কিছু?'

'না।'

'তাহলে আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরতে চাই।'

সাইমনের কাঁধে বন্ধুসুলভ, আলতো চাপড় দিল ফ্যাগবেনলে। 'যোগাযোগ রাখব।'

সে বিদায় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল সাইমনের মোবাইল। নম্বরটা চিনতে পারল না, তাই কলটা ভয়েসমেইলে পাঠিয়ে দেবে কি না ভাবল ও। আজকাল ফোনে বড্ড বেশি পরামর্শ নেয়ার জন্যে যোগাযোগ করে মক্কেলরা। কিন্তু জায়গার কোড দেখে বুঝল ল্যানফোর্ড কলেজ এলাকা থেকে এসেছে কলটা। কাজেই একপাশে সরে গিয়ে ফোন রিসিভ করল সাইমন।

'হ্যালো?'

'মি. গ্রিন?'

'জি, বলছি।'

'আপনার ইমেইল আর ফোন মেসেজ পেয়ে কল করছি। আমি লুইস ভ্যান ডি বিক। ল্যানফোর্ড কলেজের প্রফেসর।'

ভদ্রলোককে মেসেজ করার কথা ভুলেই গিয়েছিল সাইমন। 'ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'কোনো সমস্যা নেই।'

'আমার মেয়ে পেইজের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে ফোন করেছিলাম আপনাকে।'

নীরবতা নেমে এল ফোনের অপরপ্রান্তে।

'ওকে মনে আছে আপনার?' সাইমন বলল। 'পেইজ গ্রিন।'

'হ্যাঁ।' বহু দূর থেকে ভেসে এল যেন প্রফেসরের গলা। 'নিশ্চয়ই মনে আছে।'

'ওর কী হয়েছে জানেন?'

'কলেজ ছেড়ে দিয়েছে জানতাম।'

'ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রফেসর।'

'ওহ্, দুঃখিত।'

'আমার ধারণা, কলেজে থাকতে কিছু একটা হয়েছিল ওর। শুরুটা ল্যানফোর্ডে হয়েছিল বলে আমার ধারণা।'

'মি. গ্রিন?'

'জি?'

'আমার যদ্দূর মনে পড়ে, আপনার পরিবার ম্যানহাটনে থাকে।'

'জি।'

'আপনি এখন আছেন ওখানে?'

'শহরে? হ্যাঁ, আছি।'

'এই সেমিস্টারে আমি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি।'

সাইমনের বিশ্ববিদ্যালয়।

'এই ব্যাপারে বোধহয় আমাদের সামনাসামনি আলাপ করা উচিত,' বলল ভ্যান ডি বিক।

'বিশ মিনিটের মধ্যে আসতে পারব আমি।'

'আরেকটু সময় লাগবে আমার। ক্যাম্পাস চেনেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'মেইন বিল্ডিঙের সামনে একটা বড় ভাস্কর্য আছে।'

মূল ভবনটাকে লো মেমোরিয়াল লাইব্রেরি বলা হয়। ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যটা গ্রিক দেবী অ্যাথেনার। কোনো এক অদ্ভুত কারণে ওটার নাম দেয়া হয়েছে আলমা ম্যাটার।

'চিনি।'

'এক ঘণ্টা পর ওখানে চলে আসুন।'

***

ইলেনার হাঁটুর গুঁতো খেয়ে রাউল আর তার সঙ্গী ধরাশায়ী হওয়ার পর কেউ একজন ৯১১-এ কল করেছিল। তার আধঘণ্টা বাদে হাজির হলো পুলিশ। তখনও ব্যথায় মোচড়ামুচড়ি করছে রাউল, অভিযোগ করতে চায় ইলেনার নামে।

'ও আমার বংশপ্রদীপের ওপর হামলা করেছে!' খেঁকিয়ে উঠে বলল সে।

মুখ টিপে হাসল পুলিশ অফিসাররা, তবে জবানবন্দি যে নিতে হবে তা জানে। রাউল আর তার স্যাঙাতকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে ইলেনা বলল, 'তুমি অভিযোগ করলে, আমিও করব।'

'কিন্তু তুমি...'

'...আমি তোমাকে মেরেছি।'

রাউল তখনও কুঁচকিতে হাত বোলাচ্ছে, পোষা পাখিকে আদর করছে যেন।

'কিন্তু তুমি আমাকে প্রথম আক্রমণ করেছ,' বলল ইলেনা।

'কী? কী করে বুঝলে?'

'রাউল, এই খেলায় তুমি নতুন–একেবারেই আনাড়ি। আমি বহুদিনের পুরনো খেলোয়াড়। সার্ভেইলেন্স টেপ পরীক্ষা করলেই সবাই দেখতে পাবে তুমিই প্রথম এগিয়ে এসে আমাকে স্পর্শ করেছ।'

'তুমি আমার বন্ধুকে তাড়া করছিলে!'

'আর তুমি আমাকে সেই কাজে বাধা দিচ্ছিলে, তাই নিজেকে বাঁচিয়েছি আমি। খেলাটা এভাবে হবে, বুঝলে? এরচেয়ে খারাপও হবে। আমাকে দেখ, রাউল।' হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল ইলেনা। 'আমি বেঁটেখাটো, মোটাসোটা মেয়েমানুষ। বাড়াবাড়ি করলে দেখবে কুঁচকি ছোটখাটো, গোলগাল মধ্যবয়স্ক এক মহিলার হাঁটুর গুঁতো খেয়ে তোমার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল হয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল রাউলের চোখজোড়া। ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখেনি সে, তার স্যাঙাত হয়তো ভেবেছে।

'তো আমি কি খেলায় নামব, রাউল?'

দুই হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল যুবক।

'রাউল?'

'বেশ, অভিযোগ করব না আমি,' বাচ্চাদের মতো গাল ফুলিয়ে বলল সে।

'বেশ। কিন্তু আমি করব কি না ভাবছি। করেও ফেলতে পারি।'

'কী?'

এবার লেনদেন সেরে ফেলল ইলেনা। অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের 'আসল' নাম–অ্যালি ম্যাসন–এবং বর্তমান ঠিকানা আদায় করে নিল রাউলের কাছ থেকে। বিনিময়ে কথা দিল যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর অভিযোগ করবে না ও। বাক্সটনের বাইরে, একটা ফার্মে থাকে অ্যালিসন। গাড়ি চালিয়ে ওখানে চলে গেল ইলেনা। বাড়িতে কাউকে পেল না। বাইরে খানিকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবে কি না ভাবল সে। কিন্তু বাড়ির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বহু দিন ধরে এখানে কেউ থাকে না।

কাজেই হাওয়ার্ড জনসন'সে ফিরে এল ইলেনা। রুমে ঢুকে ভাবতে বসল, এবার কী করবে। হোম অফিস থেকে খবর পাঠিয়েছে লু, অ্যালি ম্যাসন ওই ফার্মহাউসে স্টেফানি মার্স নামে আরেকজন মহিলার সঙ্গে থাকে।

স্টেফানি মার্স কি তার বন্ধু? পার্টনার? এসব জেনে কি কিছু এসে-যায়?

আরেকবার বাক্সটনে গিয়ে দেখবে নাকি?

এবার অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের কাছ থেকে আগেরবারের চেয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা পাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু একটা কেসের পেছনে কচ্ছপের মতো কামড়ে থাকতে পারে বলেই এই পেশায় এত উন্নতি করেছে ইলেনা। আর তাছাড়া, প্রথম সাক্ষাতে যে কোনো লাভ হয়নি তা তো নয়। হয়েছে, ভালো লাভই হয়েছে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার–ওই দত্তকগুলোর মধ্যে কোথাও একটা ঘাপলা আছে। এই সন্দেহ আগেও ছিল ইলেনার মনে, তবে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার পর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে গেল আরকি। জানতে পেরেছে, অন্তত অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার মনে করত বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো দরকার। আর এই রহস্যে নতুন পাওয়া বড় ধাঁধাটা হচ্ছে:

দত্তক নেয়া বাচ্চাগুলো সব ছেলেশিশু।

কেন? মেয়েবাচ্চা দত্তক দেয়া হলো না কেন?

প্যাড আর কলম নিয়ে বয়েসগুলো লিখে ফেলল ইলেনা। ডেমিয়েন গর্সের বয়েস সবচেয়ে বেশি, হেনরি থর্পের সবচেয়ে কম। দুজনের বয়সের তফাত দশ বছর। দশ বছর। দীর্ঘ সময়। এত লম্বা সময় ধরে ব্যাপারটার সাথে জড়িত ছিল অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।

তার মানে, গভীরভাবেই জড়িত ছিল মহিলা। খুব গভীরভাবে।

ফোন বেজে উঠল ইলেনার। ওর ফোনে কী যেন একটা বিশেষ অ্যাপ ইনস্টল করে দিয়েছে লু। অ্যাপটার বদৌলতে ওর ফোনে আসা কোনো কলই ট্রেস করা যায় না। ছেলেটা বলেছিল, 'হোয়াইট হাউস থেকে যারা খবর ফাঁস করে, তারা এই অ্যাপ ব্যবহার করে। এজন্যই ওরা কখনো ধরা পড়ে না।'

'তুমি একা?' ফোন রিসিভ করার পর ওপাশ থেকে জানতে চাইল লু।

'প্রেম করার জন্য তো আর ফোন দাওনি, তাই না?'

'নাহ। তোমার ল্যাপটপ খোলো।'

লু-র কণ্ঠে উত্তেজনার ছোঁয়া টের পাচ্ছে ইলেনা। বলল, 'ঠিক আছে।'

'একটা লিঙ্ক ইমেইল করেছি তোমাকে। ওটাতে ক্লিক করো।'

ব্রাউজার করে ইমেইলে লগইন করতে লাগল ইলেনা।

'ক্লিক করেছ?'

'একটু সময় তো দেবে, নাকি? পাসওয়ার্ড টাইপ করছি।'

'মানে? পাসওয়ার্ড সেভ করে রাখোনি?'

'সেভ করে কীভাবে?'

'উফ! থাক, বাদ দাও। লিঙ্ক খুললে বোলো।'

লু-র ইমেইল খুলে লিঙ্কে ক্লিক করল ইলেনা। অ্যানস-স্টোরি নামের একটা ওয়েবসাইট ভেসে উঠল ল্যাপটপের পর্দায়।

'খুলেছি,' বলল সে। 'দাঁড়াও, একটা জিনিস চেক করে নিই।'

ফোন হাতে নিয়ে টেক্সট মেসেজগুলো চেক করতে লাগল ও। সাইমন গ্রিনের কাছ থেকে একটা মেসেজ এসেছে। ও জানিয়েছে, ওর মেয়ে পেইজ ডিএনএইয়োরস্টোরিকে কোনো টাকা দেয়নি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে। তবে অন্য একটা সাইটকে ৭৯ ডলার দিয়েছে। সাইটটার নাম:

অ্যানস-স্টোরি।

সাইমনের টেক্সট পড়ে শোনাল সে লু-কে।

'আচ্ছা,' বলল লু। 'তার মানে, আমি যতটা ভেবেছিলাম, খবরটা তার চেয়েও বড়।'

হোম পেজে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ইলেনার চোখ। কোনো সন্দেহ নেই–এটাও একটা ডিএনএ জিনিয়ালোজি সাইট। 'আবিষ্কার করুন আপনি আসলে কে', 'আপনি শুধু আপনিই–আপনার অনন্য জাতিগত উৎপত্তি জানুন'–এরকম ক্যাপশন দেয়া বেশ কিছু মানুষের ছবি ঘুরছে সাইটটায়। মানুষগুলো নিজেদের জিনগত পরিচয় জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত।

এসবের নিচে প্যাকেজের দাম লেখা। প্রথম প্যাকেজটার মূল্য ৭৯ ডলার। এই প্যাকেজের আওতায় পূর্বপুরুষের পরিচয় জানা যায় এবং ডিএনএ সূত্রে যাদের সাথে আত্মীয়তা আছে, তাদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় প্যাকেজের আওতায়ও একই সেবা দেয়া হয়ে থাকে, তবে বাড়তি আশি ডলার দিলে 'পরিপূর্ণ মেডিক্যাল রিপোর্ট' দেয়া হয়। ওই রিপোর্টের বদৌলতে আরো স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়।

সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্যাকেজের ওপর জ্বলজ্বলে, বড় বড় হরফে লেখা–'রিকমেন্ডেড'। কী আশ্চর্য! কোম্পানি নিজে তাদের পণ্যের ওপর বাড়তি টাকা খরচ করার পরামর্শ দিচ্ছে।

'হোম পেজে ঢুকেছ?' জানতে চাইল লু।

'হ্যাঁ।'

'সাইন ইন-এ ক্লিক করো।'

'আচ্ছা।'

'দুটো ঘর দেখতে পাবে। ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড।'

'পেয়েছি।'

'ঠিক আছে, এবার আইনি কাজকারবার করব। তোমাকে অ্যাপ ব্যবহার করে কল করেছি হেনরি থর্পের ডিএনএ অ্যাকাউন্টে ঢোকার উপায় বের করে ফেলেছি বলে।'

'কীভাবে করলে?'

'সত্যিই শুনতে চাও?'

'না।'

'বেশ। কাজটা সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ কি না নিশ্চিত নই আমি। কাজটাকে টেকনিক্যালি হ্যাকিং বলা যায়। তোমাকে কিন্তু আগেভাগেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

'লু?'

'হুঁ?'

'ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড বলো।'

বলল সে। ওগুলো টাইপ করল ইলেনা। ল্যাপটপের পর্দায় ভেসে উঠল: 'ওয়েলকাম ব্যাক, হেনরি। হিয়ার ইজ ইয়োর এথনিক কম্পোজিশন।'

হেনরি ৯৮ শতাংশ ইউরোপিয়ান। তার মধ্যে ৫৮ শতাংশ এসেছে গ্রেট ব্রিটেন থেকে–২০ শতাংশ আয়ারল্যান্ড, ১৪ শতাংশ অ্যাশকেনাযি ইহুদি, ৫ শতাংশ স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে। বাকি ৩ শতাংশ উল্লেখযোগ্য নয়।

'স্ক্রল করে একেবারে নিচের দিকে চলে যাও,' লু বলল।

তা-ই করল ইলেনা।

'"ইয়োর ডিএনএ রিলেটিভস" লেখা লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ওতে ক্লিক করো।'

নতুন একটা পেজ খুলে গেল। ওটার ওপরের দিকে লেখা, 'সর্টেড স্ট্রেংথ অফ রিলেশনশিপ।' তার পাশে লেখা, 'ইউ হ্যাভ ৮৯৮ রিলেটিভস।'

'আটশো আটানব্বইজন আত্মীয়?' সবিস্ময়ে বলল ইলেনা।

'স্বাভাবিক। লতায়-পাতায় কাজিন ওরা। যাকগে, তুমি প্রথম পেজে ক্লিক করো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লু।

ক্লিক করল ইলেনা। এই পেজ লোড হতে একটু সময় লাগছে।

'দেখতে পাচ্ছ?'

'শান্ত হও, বাছা। হাওয়ার্ড জনসন'সের ওয়াইফাই ব্যবহার করছি আমি। স্পিড কম।'

খানিক বাদেই জিনিসটা দেখতে পেল ও। গোটা কেস এবার ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল ওর সামনে। বড় একটা ধাঁধার সমাধান মিলে যাচ্ছে যেন।

চারজন মানুষের নাম আছে হেনরির সৎ ভাই/বোন হিসেবে।

'শালা!' অস্ফুটে গাল বকে উঠল ইলেনা।

'হুম।'

তালিকার প্রথম নাম: ম্যাপলউডের ডেমিয়েন গর্স, নিউ জার্সি। খুন হওয়া ট্যাটু পার্লারের মালিক ইলেনার মক্কেলের সৎ ভাই ছিল।

তার নিচে একজন 'সৎ ভাই'য়ের নাম। এখানে অবশ্য শুধু আদ্যক্ষর দেয়া।

'নর্থইস্টের এসি,' নামটা পড়ল ইলেনা। পুরো নাম আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হলো না। 'অ্যারন কর্ভাল।'

'সম্ভবত।'

'নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় আছে?'

'চেষ্টা করছি। সাইটটায় নাম গোপন রেখে রেজিস্ট্রেশন করা যায় না। দুটো পছন্দ দেয় ওরা। হয় পুরো নাম দাও, নইলে আদ্যক্ষর। কিন্তু আসল নাম দিতে হবে। অর্ধেক লোক পুরো নাম দেয়, বাকিরা আদ্যক্ষর।'

এর নিচেও একজন সৎ ভাইয়ের নাম–ট্যালাহাসি-র এনবি–আদ্যক্ষর–ফ্লোরিডা।

'এনবি-র পুরো নাম জানার উপায় নেই?'

'বৈধ উপায়ে জানার উপায় নেই।'

'অবৈধ পথে?'

'তা-ও পারা যাবে না। হেনরি থর্প হিসেবে ওকে মেসেজ পাঠাতে পারব। চেষ্টা করে দেখতে পারি পুরো নাম বলে কি না।'

'পাঠাও,' অনুমতি দিল ইলেনা।

'সেটা অবৈধ...'

'ধরা খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে?'

'আমার প্রতিভাকে অপমান কোরো না,' গলায় কৃত্রিম রাগ ঢেলে বলল লু।

'তাহলে কাজটা করে ফেল,' হুকুম দিল ইলেনা। 'কর্তৃপক্ষের সাথেও যোগাযোগ করতে হবে। আমাদের হাতে যা আছে তা দেখালে ওরা হয়তো ওয়ারেন্ট জারি করতে পারবে।'

'আমাদের হাতে যা আছে সেসব ওদের দেখাতে পারব না, মনে নেই?'

'ওহ, আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো, লোকটার নাম জানতে পারলে তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। পরের টার্গেট সে-ই হতে পারে।'

'আরো থাকতে পারে।'

'মানে? আরো কী থাকবে?'

'ভাইবোন।'

'কী করে বুঝলে?' জানতে চাইল ইলেনা।

'কমসে কম তিনটা ডিএনএ সাইটে রেজিস্ট্রেশন করেছে হেনরি থর্প।'

'কেন?'

'অনেকেই এই কাজ করে। যত বেশি ডেটাবেজে তোমার ব্যাপারে তথ্য থাকবে, তোমার রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। আমার পয়েন্টটা খেয়াল করো–কেবল অ্যানস-স্টোরিতেই পাঁচজন সৎ ভাই/বোন পেয়েছে সে। অন্য কোনো সাইটে আরো কয়েকজনকে পেতে পারে, কে জানে।'

'এরা সবাই সৎ ভাই/বোন, ঠিক?'

'হ্যাঁ। বাপের দিক থেকে।'

ল্যাপটপের পর্দায় চোখ বোলাল ইলেনা। 'এই লিস্টের শেষ লোকটা, অর্থাৎ চতুর্থ সৎ ভাইয়ের কী খবর? তার নাম দেখা যাচ্ছে কেভিন গ্যানো, বোস্টন। এর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। এবার একটা ধাক্কার জন্য তৈরি?'

'লু!' অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল ইলেনা।

'গ্যানো মারা গেছে।'

উত্তরটা প্রত্যাশিত ছিল, তবু ধাক্কা খেল সে। 'খুন হয়েছে?'

'আত্মহত্যা,' জবাব দিল লু। 'স্থানীয় পুলিশের সাথে কথা বলেছি আমি। সন্দেহজনক কিছুই নেই কেসটায়। চাকরি হারিয়েছিল লোকটা, সে কারণে বোধহয় হতাশায় ভুগছিল। নিজের গ্যারেজে গিয়ে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে।'

'কিন্তু পুলিশ তো সন্দেহজনক কোনোকিছু খুঁজছিলও না,' ইলেনা বলল। 'লোকটা সম্ভবত...'

কথা শেষ করল না সে।

'ইলেনা?'

মুখ ফুটে কিছু বলল না ইলেনা, কিন্তু সহসা উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একটা আত্মহত্যা। দুটো খুন।

এবং একটা নিখোঁজ কেস।

হেনরি থর্প খুব সম্ভব আর বেঁচে নেই। হত্যাকারী যদি পুলিশকে একটা খুনের সাথে আরেকটার যোগসূত্র মেলাতে দেবে না বলে মনস্থির করে–সে যদি চায়, পুলিশ যেন একটা ডিএনএ সাইটে ভিক্টিমদের মধ্যে যোগসূত্র না খুঁজুক–তাহলে ভিক্টিমদের একজনকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যেন সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

দুত্তোর!

সে কি তাহলে একটা মরা মানুষকে খুঁজছে?

'ইলেনা?' সাড়া না পেয়ে ওপাশ থেকে ডাকল লু।

'হ্যাঁ, আছি। আরেকটা ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'আমরা তো জানি, পেইজ গ্রিনও অ্যানস-স্টোরিতে সাইন আপ করেছিল।'

'হ্যাঁ। তবে ও সৎ বোন না। পুরো লিস্ট তো দেখতেই পাচ্ছ। সবাই ভাই।'

'হয়তো অন্য কোনো সম্পর্ক আছে ওদের মধ্যে।'

'সার্চ ইঞ্জিন আছে একটা। ওটা ব্যবহার করো।'

(1,1) -122- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:48

'পেইজ গ্রিন' লিখে সার্চ করল ইলেনা। কিছু পেল না। গ্রিন লিখে সার্চ করল, তারপর আদ্যক্ষর লিখে কয়েকভাবে চেষ্টা করল, লাভ হলো না। আত্মীয়দের তালিকা পড়ে দেখল ইলেনা। একজন ফার্স্ট কাজিনের নাম পেল, এরাও পুরুষ। থার্ড কাজিন পেল কয়েকজন।

পেইজ নামের কাউকে পেল না। পেল পিজি আদ্যক্ষরের কাউকেও।

'পেইজ গ্রিন ওর আত্মীয় না,' বলল লু।

'তাহলে এসবের মধ্যে মেয়েটা এল কীভাবে?'

(2,1) -122- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:48

২৯

একটা কমিউটার অ্যাপ জানিয়ে দিল সাইমনকে, দক্ষিণগামী ১ নম্বর ট্রেনে চাপলে এগারো মিনিটের মধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যেতে পারবে। এতে নিজস্ব গাড়ি বা ট্যাক্সির চেয়েও তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। সাইমনের মোবাইলটা যখন বেজে উঠল ও তখন এলিভেটরের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

'হ্যালো?'

'দুই ঘণ্টার মধ্যে টেস্টের রেজাল্ট পেয়ে যাব।'

জেনেটিকস ল্যাবের র‍্যান্ডি স্প্র্যাট।

'দারুণ,' খুশি হয়ে উঠল সাইমন।

'শিশু বিভাগের পেছনের কোর্টইয়ার্ডে দেখা করব।'

'ঠিক আছে।'

'মি. গ্রিন, আপনি "পেমেন্ট অন ডেলিভারি" ব্যবস্থার সাথে পরিচিত?'

লোকটার টাকার খাঁই দেখে খুশিই হলো সাইমন। 'টাকা নিয়ে আসব আমি।'

খুশি হয়ে ফোন রেখে দিল স্প্র্যাট। ইভোনির নম্বরে ফোন করল সাইমন।

'হ্যালো,' অনিশ্চিত গলায় বলল ইভোনি।

'ভেবো না,' সাইমন বলল, 'ইনগ্রিডের গোপন জীবনের ব্যাপারে জানার জন্যে ফোন করিনি। একটা সাহায্য দরকার।'

'কী?'

'আমাদের হাসপাতালের কাছের ব্রাঞ্চ থেকে নয় হাজার নয়শো ডলার ক্যাশ তোলা দরকার।'

যত টাকাই ওঠাক, পরিমাণটা দশ হাজার ডলারের নিচে হতে হবে। দশ হাজারের বেশি ওঠালে ফিনসেন[৩]-এর সিটিআর–কারেন্সি ট্রানজেকশন

[৩] FinCEN

রিপোর্ট—পূরণ করতে হয়। মোদ্দা কথা, টাকা ওঠানোর ব্যাপারটা আইআরএস বা আইনরক্ষাবাহিনীর কাছে রিপোর্ট করা হবে। এখন ওসব ঝামেলা পোহাতে চায় না সাইমন।

'টাকাটা তোলার ব্যবস্থা করে দেবে, প্লিজ?'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল ইভোনি। তারপর জানতে চাইল, 'ক্যাশ টাকার দরকার পড়ল কেন?'

'তুমি আর ইনগ্রিড ছাড়াও অন্য কারো জীবনেও হয়তো গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।'

ছেলেমানুষি হয়ে গেল, তবু বলা যেহেতু হয়ে গেছে, কথা তো আর ফেরানোর উপায় নেই।

ফোন কাটতে-না-কাটতেই এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। নোংরা ও প্রায়ান্ধকার পাতাল ট্রেনে উঠে পড়ল সাইমন। বিপবিপ করে একটা অ্যালার্ম বাজার আগ পর্যন্ত যাত্রী উঠতে থাকল কমিউটারে।

পাতাল ট্রেনটা প্রায় ভরে গেছে। একটা স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল সাইমন। ও সাধারণত অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় এড়ানোর জন্যে পাতাল ট্রেনে উঠেই ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা পত্রিকায় ডুবে যায়। কিন্তু ইদানীং সহযাত্রীদের চেহারা দেখতে ভালো লাগে ওর। একটা সাবওয়ে যেন কার পৃথিবী নামক গ্রহটার ক্ষুদ্র নমুনা। সব লিঙ্গের, জাতীয়তার, ধর্মমতের এবং বিশ্বাসের মানুষের দেখা পাওয়া যায় এখানে। স্নেহ বিলানো মানুষ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় ঝগড়ায় ব্যস্ত মানুষও। সংগীতের, আড্ডা দেয়ার, হাসির, কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় এখানে। বিজনেস স্যুট পরা পয়সাঅলা লোক (যেমন, সাইমন) যেমন ওঠে এসব পাতাল ট্রেনে, তেমনি ওঠে ভিক্ষুকও। এই ট্রেনে সবাই সমান। সবাই সমান ভাড়া দেয়। সিটে বসার অধিকার সবার একরকম।

গত দু-এক বছরে কোনো-না-কোনো কারণে নিয়মিত সাবওয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে সাইমনকে।

ব্রডওয়ে ও ১১৬ নম্বর স্ট্রিটের মাঝখানের গেট দিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল সাইমন। হাই স্কুলে থাকতে বাবার সঙ্গে ঘুরতে এসে এই গেট দিয়েই প্রথম পা রেখেছিল এ ক্যাম্পাসে। ওর বাবা ছিলেন আইবিইডব্লিউ ইউনিয়নের ইলেক্ট্রিশিয়ান। জীবনে তার চেয়ে ভালোমানুষ আর একটাও দেখেনি সাইমন। বাবার সাথে থাকলে নিজেকে সবসময় নিরাপদ মনে হতো ওর। ভদ্রলোক কখনো ভাবতেও পারেননি তার কোনো এক সন্তান কখনো কোনো আইভি লিগ স্কুলে পড়াশোনা করবে।

সাইমন গ্র্যাজুয়েট করার দুই হপ্তা আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান বাবা। তিনি তখন নিউ জার্সির মিলবার্নে যাচ্ছিলেন কাজের জন্যে। বাবার মৃত্যুটা সাইমনের পরিবারের জন্যে প্রচণ্ড ধাক্কা ছিল। অনেক দিক থেকেই তার মৃত্যু

(2,1) -123- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:49

ছিল শেষের শুরু। নিজের সন্তান হওয়ার পর সাইমন মনে করার চেষ্টা করত ওর বাবা ওকে কীভাবে বড় করেছিলেন। শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্র যেভাবে শিখতে চেষ্টা করে আরকি, কিন্তু ওর সবসময়ই মনে হতো বাবার মতো পারছে না ও।

সাইমন তার বাবাকে যতটা ভালোবাসত, ওর সন্তানরাও কি ওকে ততটা ভালোবাসে?

ওরাও কি ওকে ততটাই শ্রদ্ধা করে?

সাইমন কি ওদেরকে ওর বাবার মতো নিরাপত্তার অনুভূতি দিতে পেরেছে?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হলো: সাইমনের বাবাও কি তার মেয়েকে নেশাখোরে পরিণত হতে দিতেন? তার স্ত্রী গুলি খেলে তিনিও কি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন?

চার বছর যে ক্যাম্পাসে কাটিয়েছে, সেখানে পা রাখার সময় প্রশ্নগুলো সাইমনের মাথার ভেতর কিলবিল করছিল।

ছাত্রছাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে ওকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, বেশিরভাগেরই মাথা নোয়ানো।

অ্যাথেনার ভাস্কর্য চোখে পড়ল সাইমনের। স্বমহিমায় সিংহাসনে বসে আছেন গ্রিক জ্ঞানের দেবী। ভালোমতো খেয়াল করলে, সাইমন জানে, দেবীর বাম পায়ের কাছে, আঙরাখায় একটা লুকানো পেঁচা দেখা যাবে। অ্যাথেনার বাম হাত প্রসারিত, দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাবার জন্যে। কিন্তু সাইমনের কেন যেন মনে হলো ভঙ্গিটা অনেকটা ওর দাদির কাঁধ ঝাঁকানোর মতো।

ওর মোবাইল বেজে উঠল আবারও। কলার আইডিতে নাম দেখাল ইলেনা রেমিরেজ।

'নতুন কিছু পেলেন?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, অনেক।'

সংক্ষেপে মেইনে যাওয়ার আসল কারণ জানাল ইলেনা। আর শুধু জানাল, দত্তকগুলো বেশ সন্দেহজনক। ডিএনএ জিনিয়ালোজির ব্যাপারে যা যা জানতে পেরেছে, সেসব জানাল সবিস্তারে। লো লাইব্রেরির ঠান্ডা মার্বেল পাথরের মেঝে ধপ করে বসে পড়ল সাইমন। তারপর সবিস্ময়ে শুনল ইলেনার নতুন আবিষ্কার–দত্তক, ওয়েবসাইটে পাওয়া সৎ ভাইয়ের দল, তাদের আকস্মিক মৃত্যু...সব।

'কেউ ওদেরকে খুন করছে,' এক পর্যায়ে বলে উঠল সাইমন।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

ইলেনার মুখ থেকে যখন শুনল পেইজও একই ডিএনএ জিনিয়ালোজি টেস্টের জন্যে সাইন আপ করেছিল, কিন্তু ও সেই লোকগুলোর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় নয়, তখনকার অনুভূতি ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সাইমন। স্বস্তি

পাওয়ার কথা ছিল ওর–তার মানে ও-ই তো পেইজের বাবা–কিন্তু তখনই একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়।

'আমরা নিশ্চিত না,' বলল সে।

'কী নিশ্চিত না, সাইমন?'

'পেইজও যে সৎ বোন না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

'কীভাবে?'

'ও হয়তো আসল নামে সাইন আপ করেনি। আমি পড়েছি, মাঝে মাঝে লোকে অন্যের ডিএনএ নমুনা পাঠায়, অথবা ভুয়া নাম দেয়। কাজেই ও হয়তো সেই বোন, যার নামের শুধু আদ্যক্ষর দেয়া আছে।'

'এনবি?'

'হ্যাঁ।'

'না, সাইমন, তা সম্ভব না।'

'কেন?'

'নামটা পুরুষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। পেইজ যদি এখানে নিজের ডিএনএ পাঠাত, তবে ভুয়া নাম দিলেও, ওরা ঠিক জেনে যেত ডিএনএ-র নমুনাটা পুরুষের নাকি নারীর। কাজেই পেইজ এনবি হতে পারে না।'

'তাহলে অন্য কোনো ছদ্মনাম ব্যবহার করেছে হয়তো।'

'হয়তো। কিন্তু এখন আমরা হেনরি থর্পের পেজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এই পেজে ওর সমস্ত আত্মীয়ের তালিকা আছে। থার্ড কাজিনের চেয়ে ঘনিষ্ঠ কোনো নারী আত্মীয় নেই ওর।'

'তাহলে তো কিছুই বুঝলাম না। এসবের সাথে ও জড়াল কীভাবে?'

'কোনোভাবে অ্যারনের মাধ্যমে। কিন্তু কীভাবে, তা জানি না। আমরা হয়তো ভুল পথে এগোচ্ছি।'

'যেমন?'

'আপনার মেয়ে হয়তো নিজের ডিএনএ না পাঠিয়ে অন্য কারোরটা পাঠিয়েছিল।'

'সম্ভাবনাটা নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু কেন?'

'জানি না। কোথায় কোথায় ওর চলাফেরা ছিল, কার কার সাথে মেলামেশা করত, এসব জানতে হবে আমাদের। পেইজ হয়তো কিছু জেনে ফেলেছিল। কোনো ধরনের অপরাধ হতে পারে। তার সূত্র ধরেই হয়তো অ্যারনের কাছে গিয়েছিল ও।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সাইমন। 'চলুন এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে ভেবে দেখি এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কী কী জানি আমরা।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'প্রথমেই, এই লোকগুলোর বায়োলজিক্যাল পিতা একজনই।'

'হ্যাঁ।'

'এদের সবাইকে খুব সম্ভব মেইনের একটা ছোট্ট এজেন্সির মাধ্যমে দত্তক নেয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ।'

'এবং কাজগুলো করা হয়েছে গোপনীয়তার সাথে, কিছু একটা ধামাচাপা দিয়ে। দত্তকের রেকর্ডে এদের বাপের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি।'

'যদ্দূর জানি, হ্যাঁ,' সায় দিল ইলেনা।

ফোনটা ডান কান থেকে সরিয়ে বাম কানে চেপে ধরল সাইমন। 'ইনফার্টিলিটি ডাক্তাররা–অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব নিয়ে কাজ করে যারা–যে রোগীদের গর্ভবতী করার জন্যে নিজের শুক্রাণু ব্যবহার করে, এমন ঘটনার কথা পত্রিকায় পড়েছেন? ইন্ডিয়ানায় এরকম একটা কেস পাওয়া গিয়েছিল। এক মহিলা আটজন ভাইবোনের খোঁজ পেয়েছিল এরকমই একটা ডিএনএ সাইটে। অথচ তারা কেউ কারো সম্পর্কে জানত না। এরপর তারা এক হয়ে ইনফার্টিলিটি ডাক্তারকে খুঁজে বের করে। লোকটা নিজের শুক্রাণু ব্যবহার করত, অথচ ভান করত ওগুলো যেন স্পার্ম ব্যাংক থেকে আনছে।'

'হ্যাঁ, পড়েছি,' ইলেনা বলল। 'এরকম আরো বেশ কিছু ঘটনা আছে। ইউটাহ আর কানাডাতেও ঘটেছে। কিন্তু সেসবের সাথে আমাদের কেসের কী সম্পর্ক? ওসব ঘটনায় মহিলারা দত্তকের জন্য বাচ্চা দিয়ে দিচ্ছিল না। তারা নিজের সন্তান চাইছিল।'

যুক্তি আছে ওর কথায়।

'কোথাও কিছু একটা মিস করে যাচ্ছি আমরা,' সাইমন বলল।

'হ্যাঁ। আরেকটা চেষ্টা নিয়ে দেখি অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের মুখ খোলানো যায় কি না। এই দত্তকগুলোর ব্যবস্থা সে-ই করেছিল। এবার ওকে জেলের ঘানি টানানোর হুমকি দেব। এফবিআইকেও আগ্রহী করে তোলা যায় কি না দেখব। ...সাইমন, একটু ধরুন, আরেকটা কল এসেছে।'

ক্যাম্পাসের ওপর চোখ বোলাতে লাগল সাইমন। নানান চিন্তা কিলবিল করছে মাথার মধ্যে। এই সৎ ভাই আর দত্তক রহস্যের সমাধান যদি হয়ও, তার সাহায্যে কি আর পেইজকে খুঁজে পাওয়া যাবে?

খানিক বাদে লাইনে ফিরে এল ইলেনা। 'সাইমন?'

একজন লোককে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে আসতে দেখল সাইমন আলমা ম্যাটার স্ট্যাচুর দিকে। লোকটাকে চিনতে পারল সে, ছবি দেখেছে–প্রফেসর ভ্যান ডি বিক। ফোন এখনো কানে ঠেকানো, উঠে দাঁড়াল সাইমন।

বলল, 'হ্যাঁ, বলুন?'

'এখন রাখছি। বেরোতে হবে। দেখা করতে চায় অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।'

৩০

বাড়ির পেছনে গাড়ি পার্ক করল অ্যাশ। রাস্তা থেকে চোখে পড়বে না গাড়িটা, তবু দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল ডিডি, বলা যায় না কেউ ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে আসতে পারে। গাড়ির পেছনটা চেক করে দেখল অ্যাশ। ব্যাগগুলো বহাল তবিয়তেই আছে। ওগুলো খুলে ভেতর থেকে অস্ত্রগুলো বের করে ব্যাকসিটে রাখল সে।

ঠিকমতোই আছে সব।

দরকারি অস্ত্রটা বেছে নিল অ্যাশ, বাকিগুলো ফের রেখে দিলে ব্যাগের মধ্যে। তারপর দুই আঙুল এক করে হুইসেল বাজাল। ডিডি ফিরে এলে একটা এফএন ৫.৭ ধরিয়ে দিল ওর হাতে।

'এখনো কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখতে পারো। সময় আছে,' বলল অ্যাশ।

'কোন্ ব্যাপার নিয়ে?'

'মাদার অ্যাডিওনার চিরকুটের ব্যাপারে। আচ্ছা, তার আগে বলো তো, কে এই মহিলা?'

'চেম্বারে কাজ করে। আর কোনো মেয়ে অত উঁচু পদে যেতে পারেনি।'

'তোমার কি মনে হয় মহিলা কাল্টের প্রতি অনুগত?'

'ওটাকে কাল্ট ডেকো না,' বিরক্ত গলায় বলল ডিডি। 'হ্যাঁ, খুব অনুগত। ট্রুথ হেইভেনে মাদার আর একজনই আছে, তার নাম মাদার অ্যাবিওনা। দুজনেই খাঁটি ট্রুথ। এতই খাঁটি যে, ভিজিটর আর ভলান্টিয়ারকে সৃষ্টির জন্যে তাদেরকে বেছে নিয়েছিল ট্রুথ।'

'ভারটেজের ছেলেরা তাহলে সৎ ভাই?' মন্তব্য করল অ্যাশ।

'হ্যাঁ।'

'মাদার অ্যাডিওনার ছেলে কোন্টা?'

'ভলান্টিয়ার।'

'আচ্ছা। তাহলে ভিজিটরের মা হচ্ছে মাদার অ্যাবিওনা।'

'হ্যাঁ।' বাড়ির পেছন দিকে হাঁটা ধরল ওরা। 'এসব নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন, অ্যাশ?'

'মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমার পক্ষেরই কেউ আমার বিরুদ্ধে কাজ করুক, তা আমি চাই না। তুমি চাও?'

'ওরকম কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না আমার।'

'আমরা কী করেছি, তা জানার জন্যে কাউকে দিয়ে আমার ওপর অত্যাচার করিয়েছে মাদার অ্যাডিওনা। তারপর হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে কাজটা করতে মানা করেছে। ব্যাপারটা নিয়ে তোমার চিন্তা হয়নি?'

'হ্যাঁ, হয়েছে তো,' ডিডি বলল।

চারপাশে নজর বোলাল অ্যাশ। 'ডিডি?'

'হুঁ।'

'সব খুলে বলছ না তুমি–এরকম মনে হচ্ছে কেন আমার বলো তো?'

মুচকি হেসে অ্যাশের মুখোমুখি হলো মেয়েটা। 'ওর সঙ্গে যখন ছিলে, তখন ব্যাপারটা অনুভব করেছ তুমি, তাই না?'

'ভারটেজ গুণী লোক, কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি ওর মধ্যে আছে–এ কথা মেনে নিচ্ছি।'

'আর ট্রুথ হেইভেন?'

'জায়গাটা শান্ত, নির্জন।'

'তার চেয়েও বেশি। জায়গাটা স্বর্গীয়।'

'তো?'

'আমি আগে কেমন ছিলাম মনে আছে তোমার?'

খুব মনে আছে অ্যাশের। ভীষণ অগোছালো, এলোমেলো স্বভাবের মেয়ে ছিল ডিডি। কিন্তু সেটা ওর দোষ ছিল না। বহু ফস্টার ফাদার, শিক্ষক, কাউন্সেলর, আধ্যাত্মিক উপদেশদাতা তাদের নোংরা হাতে ছুঁয়েছে ওকে।

'মনে আছে,' জবাব দিল যুবক।

'তার চেয়ে অনেক ভালো দেখাচ্ছে না আমাকে?'

'হ্যাঁ।' কড়া রোদের জন্যে কিছু দেখতে পাচ্ছে না সামনে, তাই এক হাত কপালে রেখে ডিডির দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু আমরা তো এসব ছেড়ে পালাতে পারি,' মরিয়া আকুতির সুরে বলল। ব্যাপারটা তার কাছে একেবারেই নতুন। 'নিজেদের একটা জায়গা খুঁজে নেব আমরা। তোমার হেইভেনের মতো শান্ত। নির্জন। স্বর্গীয়।'

'তা পারব,' বলল ডিডি। 'কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারব না।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল অ্যাশ, কিন্তু ওর ঠোঁটে আঙুল রেখে থামিয়ে দিল মেয়েটা। 'বাস্তব দুনিয়ায় আমার জন্যে হাজার রকমের লোভ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অ্যাশ। এমনকি তোমার সাথে যে বেরিয়েছি, এখানেও

আমাকে কাজের ওপর মনোযোগ রাখতে হবে, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। নইলে আবার আটকা পড়ব।'

'অন্ধভাবে এই সত্য বিশ্বাস করে কী পাও বলো তো?'

'বিশ্বাস করি না?'

'অ্যাঁ, কী বললে?'

'বেশিরভাগ ধার্মিক লোকই ধর্মমতে বিশ্বাস রাখে না, অ্যাশ। ধর্মটা থেকে যা দরকার আমরা কেবল সেইটুকু গ্রহণ করি, যা দরকার নেই সেইটুকু ফেলে দিই।'

'তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনে খুব অবাক লাগছে,' বলল অ্যাশ।

'সত্যি?'

পেছনের জানালা দিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল যুবক। খালি। বাতি নেভানো। কিচেন টেবিলটা লম্বা সাদা কাপড়ে মোড়ানো। অনেকদিনের জন্যে ঘরদোর বন্ধ করে দিলে এরকম কাপড় দিয়ে আসবাবপত্র মুড়ে দেয়া হয়।

ডিডি বলল, 'ট্রুথ যখন মরুভূমিতে লুকানো চিহ্নটা খুঁজে বের করার জন্য অ্যারিজোনা গিয়েছিল–একমাত্র যে চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে এক সত্যের ওপর আমাদের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে–ওটা তখন কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল জানো?'

জানালা থেকে সরে এল অ্যাশ।

'বর্তমান ট্রুথ মারা গিয়ে দ্বিতীয় স্তরে উঠে যাবার পর, একজন লোক তার স্থলাভিষিক্ত হবে না, সমগ্র মানবতার প্রতিনিধিত্ব করা দুজন মানুষ এক হয়ে ট্রুথের শক্তি বাড়াবে। একজন পুরুষ। তার সঙ্গে যোগ দেবে একজন নারী। বিশেষ এক নারী।'

দাঁত বের করে হাসল ডিডি।

ওর দিকে তাকাল অ্যাশ। 'তুমি।'

মাথা দুলিয়ে ওর কথায় সায় জানাল মেয়েটা।

'চিহ্নটা কি সত্যিই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল?'

'আর নাহ, প্রশ্নই ওঠে না, অ্যাশ।'

চোখেমুখে বিভ্রান্তি ফুটে উঠল যুবকের–কিছুই বুঝতে পারেনি।

'এটা একটা সাম্প্রতিক "ব্যাখ্যা",' ডিডি বলল।

'তার মানে, তুমি জানো,' বলল অ্যাশ।

'কী জানি?'

'জানো যে এসব গাঁজাখুরি কথাবার্তা।'

'উঁহু, ব্যাপারটা তুমি বোঝোনি, অ্যাশ। আর সবার মতোই এই ধর্ম থেকে আমার যতটুকু দরকার, ততটুকু নিই আমি।' সময় দেখল ডিডি। 'চলো, সময় হয়ে গেছে।'

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। ওর পিছু নিল অ্যাশ।

'আমাদের এই কাজগুলো ট্রুথকে তার এই নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে, তাই না?' বলল সে।

হাঁটতে হাঁটতে ডিডি বলল, 'একমাত্র ঈশ্বরই রহস্যময় উপায়ে কাজ করেন না।'

***

সাইমন বলল, 'প্রফেসর ভ্যান ডি বিক?'

'প্লিজ লুইস ডাকবেন আমাকে।'

ছবিতে যেমন দেখাচ্ছিল, ভ্যান ডি বিক বাস্তবেও তেমনই দেখতে। অল্পবয়সি, বালকসুলভ চেহারা, মোমের মতো গায়ের ত্বক, মার্জিত কথার ধরন। অনলাইন ফটোগ্রাফে দেখা সেই কালো টি-শার্টটা পরনে। হাত মেলাল দুজনে। মৃদু হাসল প্রফেসর। মানুষ পটানোর মতো সুন্দর হাসি।

'পেইজের জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত,' ভ্যান ডি বিক বলল।

'কেন?'

'মানে?'

'বললেন, আপনি ওর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কেন?'

'ফোনে বললেন না, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'এ কারণেই আপনি দুঃখিত, লুইস?'

বিব্রত হয়ে পড়ল লোকটা। হুট করে এতটা আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ার জন্যে মনে মনে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করে ছাড়ল সাইমন। গলার সুর নরম করে বলল, 'দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আসলে...আমার স্ত্রী গুলি খেয়েছে তো, তাই মেজাজ ঠিক রাখতে পারছি না। পেইজের মা।'

'কী? উফ! ভয়ানক ব্যাপার। উনি...?'

'কোমায় আছে।'

রং সরে গেল প্রফেসরের চেহারা থেকে।

'হাই, লুইস!'

দুজন ছাত্র বিল্ডিঙের ভেতরে যাচ্ছিল, শিক্ষককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, কিন্তু কিছু বলছে না ওদের শিক্ষক।

'লুইস?' দ্বিতীয় ছাত্র ডাকল আবার।

শিক্ষককে নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকাটা–বিশেষ করে কাজটা যখন ছাত্ররা করে–সাইমনের পছন্দ না।

দ্বিতীয় ছাত্রের ডাকে ঘোর ভাঙল ভ্যান ডি বিকের। 'ওহ! হাই, জেরেমি, হাই, ড্যারিল।'

ওদের উদ্দেশে হাসল সে, কিন্তু হাসিটা বড্ড নিস্তেজ। আর কিছু না বলে নিজেদের পথে চলে গেল ছাত্ররা।

'আপনি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন?' প্রশ্ন করল সাইমন।

'কী? ওহ, না। আপনি মেসেজ দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। কল ব্যাক করার পর, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা বলতে চান আপনি।'

নিচের ঠোঁট কামড়াতে শুরু করল ভ্যান ডি বিক।

'পেইজের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন আপনি,' যোগ করল সাইমন। 'আপনাকে ও বিশ্বাস করত।'

তথ্যটা সাইমনের কাছে দুই হাত ঘুরে এলেও, খুব সম্ভব, সত্যি। তাছাড়া প্রফেসর অন্তত খুশি হবে কথাটা শুনে।

'দারুণ ছাত্রী ছিল পেইজ,' ভ্যান ডি বিক বলল। 'পড়ানোর জন্য যেরকম ছাত্রছাত্রী চাই আমরা, ঠিক সেই ধরনের।'

কথাটা অতীতে আরো অনেকবার বলেছে লোকটা–তবে শুনে মনে হলো, যা বলেছে মন থেকেই বলেছে।

'কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হলো?' জানতে চাইল সাইমন।

'জানি না।'

'মেধাবী, উৎসাহী একটা মেয়েকে পাঠিয়েছিলাম আমি। এই প্রথম বাড়ি থেকে দূরে, একা একা থাকতে এসেছিল ও।' সাইমন টের পেল পিতৃসুলভ রাগ, দুঃখ, অনুতাপ আর ভালোবাসার মিশ্র এ আবেগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ওর বুকের ভেতর। 'আমার বিশ্বাস ছিল ওকে আপনারা দেখে রাখবেন।'

'আমরা চেষ্টা করি, মি. গ্রিন।'

'কিন্তু আমার মেয়ের বেলায় ব্যর্থ হয়েছেন।'

'আপনি যদি এখানে দোষ চাপাতে আসেন...'

'উঁহু, তা করতে আসিনি আমি। এখানে এসেছি, কারণ ওকে খুঁজে বের করা দরকার। প্লিজ।'

'ও কোথায় আছে জানি না আমি।'

'আপনার যা যা মনে আছে সব বলুন আমাকে।'

'চলুন হাঁটি,' ভ্যান ডি বিক বলল। 'সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে অস্বস্তি লাগছে।' সাইমনকে পাশে নিয়ে হাঁটতে লাগল সে। 'একটু আগেই তো বললাম, খুব ভালো ছাত্রী ছিল পেইজ। খুব মনোযোগী। ওর মতো আরো অনেক ছাত্রছাত্রী অবশ্য আছে। সারাক্ষণ তেতে থাকে। প্রতিটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায় ওরা। মোমবাতির দুদিক থেকেই পোড়াতে আরম্ভ করে। আপনার নিজের স্নাতকজীবনের কথা মনে আছে?'

মাথা দোলাল সাইমন। 'হ্যাঁ।'

'যদি কিছু মনে না করেন, কোত্থেকে গ্র্যাজুয়েট করেছিলেন বলা যাবে?'

'এখান থেকে।'

'কলম্বিয়া?' বাটলার লাইব্রেরির দিকে এগোচ্ছে দুজনে। 'এখানে যখন পা রাখলেন, তখন কি জানতেন জীবনে আপনি কী হতে চান?'

'কোনো ধারণাই ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে শুরু করেছিলাম।'

'লোকে বলে, কলেজ আপনার সামনে দুনিয়া খুলে দেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই উল্টোটা ঘটে। এখানে যখন আসেন, তখন ভাবেন, কলেজ থেকে বেরোনোর পর আপনি যেকোনো কিছু করতে পারবেন। অজস্র সুযোগ থাকে আপনার হাতে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, এখানে যত দিন কাটাবেন সুযোগগুলো ততই কমতে থাকে। গ্র্যাজুয়েট শেষ করতে করতে বাস্তবতা আপনাকে কঠিন ছবক শিখিয়ে ছাড়বে।'

'এসবের সাথে পেইজের কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল সাইমন।

হাসি ফুটে উঠল প্রফেসরের ঠোঁটে। 'কিন্তু কলেজে আসার পর পেইজ খুব শিগগিরই বুঝে গিয়েছিল ও কী হতে চায়। নিজের পছন্দের বিষয় খুঁজে পেয়েছিল। জেনেটিকস। ডাক্তার হতে চেয়েছিল ও। মায়ের মতো। কয়েক সপ্তার মধ্যে ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল ও। প্রায় সময়ই আমার অফিসে আসত। আমার টিএ হওয়ার জন্যে কীভাবে কী করতে হবে জানতে চাইত। ভেবেছিলাম, সত্যিই পড়াশোনায় খুব ভালো করছে ও। আর তারপরই কিছু একটা বদলে গেল।'

'কী?'

হাঁটা থামাল না ভ্যান ডি বিক। বলল, 'আমাদের কিছু নিয়মনীতি আছে, মি. গ্রিন। সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মাকে কতটুকু জানাতে পারব, তার একটা সীমারেখা আছে। একজন শিক্ষার্থী যদি গোপনীয়তা বজায় রাখতে চায়, সেটা তাদেরকে দিতে আমরা বাধ্য–নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত। টাইটেল নাইন-এর ক্যাম্পাস নীতিগুলো সম্পর্কে জানেন?'

রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল সাইমনের। ল্যানফোর্ডে আইলিন ভনের সঙ্গে দেখা করার সময় একটা কথা বলেছিল ও। ওদের দুজনের বন্ধু জুডি জিস্কাইন্ড সন্দেহ করছিল কোনো একটা পার্টিতে গিয়ে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিল পেইজ। কথাটা সাইমন জোর করে ভুলে গিয়েছিল দুটো কারণে। এক, চিন্তাটা ভয়াবহ; দুই, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, জুডি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পেইজ নিজেই অস্বীকার করেছিল। সাইমনের মনে হয়েছিল, জুডি জোর করে চিন্তাটা চাপিয়ে দিয়েছিল পেইজের ওপর। আর আইলিনের মতে, পেইজ শক্তভাবে কথাটা অস্বীকার করেছিল। বলেছিল, বাড়িতে নাকি সমস্যা চলছে।

সাইমনকে নিয়ে লারনার হল-এ ঢুকল ভ্যান ডি বিক। নিচতলায় একটা ক্যাফে আছে। ক্যাফের দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল প্রফেসর, কিন্তু তার কনুই আঁকড়ে ধরল সাইমন।

'আমার মেয়ে কি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছিল?' জানতে চাইল সে।

'আমার তা-ই ধারণা।'

'ধারণা?'

'পেইজ আমার সাথে গোপনে দেখা করতে এসেছিল। প্রায় উন্মাদ অবস্থায়। ক্যাম্পাসের এক পার্টিতে একটা ঘটনা ঘটেছিল।'

দুই হাত মুঠো পাকিয়ে ফেলল সাইমন। 'আপনাকে বলেছিল ঘটনাটা সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ, বলতে শুরু করেছিল।'

'"বলতে শুরু করেছিল" মানে কী?'

'বিস্তারিত শোনার আগে ওকে বলে নিয়েছিলাম যে আমাকে টাইটেল নাইনের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।'

'কী নির্দেশনা?'

'বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং,' জবাব দিল ভ্যান ডি বিক।

'মানে?'

'কোনো শিক্ষার্থী যদি আমাকে কোনো যৌন নিপীড়নের ঘটনা সম্পর্কে জানায়, তাহলে সে যা-ই চাক না কেন, ঘটনাটা টাইটেল নাইন-এর কোঅর্ডিনেটরের কাছে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। কাজটা বাধ্যতামূলক।'

'ভিক্টিম যদি না চায়, তবু?'

'হ্যাঁ। সে যদি না-ও চায়, তারপরও রিপোর্ট করতে হবে। সত্যি বলতে কী, নিয়মটা আমার পছন্দ না। এই নিয়মের যৌক্তিকতা আমি বুঝি, কিন্তু এতে করে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের কাছে ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলতে দ্বিধা করে, তেমন একটা আগ্রহী হয় না। কেননা ওরা জানে, মত থাকুক বা না থাকুক, ঘটনাটা রিপোর্ট করতেই হবে সেই শিক্ষককে। কাজেই ওরা মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। পেইজের বেলায়ও তা-ই ঘটেছে।'

'আপনার সাথে কথা বলেনি ও?'

'হড়বড় করে ঝড়ের বেগে, সংক্ষেপে বলেছে। আমি বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তার আগেই দৌড়ে আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যায় ও। ওকে কল করেছিলাম, মেসেজ করেছিলাম। ইমেইলও করেছি। একবার ওর রুমে পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু কথা বলেনি ও।'

সাইমন টের পেল, মুঠির ওপর আঙুলগুলো আরো শক্ত করে চেপে বসেছে। 'ব্যাপারটা ওর বাবা-মাকে জানানোর দরকার মনে করলেন না?'

'মনে করেছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারেও নিয়ম আছে। টাইটেল নাইনের কোঅর্ডিনেটরের সাথেও কথা বলেছিলাম।'

'কী বলেছিল মহিলা?'

'মহিলা না, পুরুষ।'

সত্যি? ফাজলামো নাকি! 'কী বলেছিলেন ভদ্রলোক?'

'পেইজের সাথে কথা বলেছিলেন উনি। ও তাকে মুখের ওপর বলে দেয়, কিছু হয়নি।'

'তারপরও ওর বাবা-মাকে জানানোর কথা ভাবেননি?'

'না, মি. গ্রিন।'

'তার ফলে আমার মেয়ে, যে হয়তো ধর্ষিতা হয়েছে, একা একা ভোগান্তি সইল পুরোটা সময়।'

'আমাদের কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ইচ্ছা না থাকলেও সেগুলো মেনে চলতে হয়।'

ফালতু কথা। এই নিয়মগুলো স্রেফ জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। এসব ঝামেলা যদি কখনো চুকে যায়, এর একটা হেস্তনেস্ত করবে সাইমন। এখন ওকে হাতের কাজের দিকে মন দিতে হবে। কিন্তু কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করছে না ওর। স্রেফ গড়াগড়ি খেয়ে মেয়ের জন্য কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

'তখন থেকেই বদলে যেতে শুরু করে ও?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল ভ্যান ডি বিক। তার উত্তর অবাক করে দিল সাইমনকে। 'না, ঠিক তখন থেকে না। জানি একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাটা। কিন্তু পরেরবার যখন ওকে দেখি...'

'কখন?'

'কয়েকদিন বাদে। নিয়মিত ক্লাস করতে আরম্ভ করেছিল পেইজ। আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছিল ওকে। একটু অবাকই হয়েছিলাম ওকে দেখে। আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা দুলিয়েছিল, যেন বলতে চাইছিল, "আমি ঠিক আছি, ভাববেন না।" এর কয়েকদিন পর আবার অফিসে আমার সাথে দেখা করতে শুরু করে। ওকে দেখে কতটা খুশি হয়েছিলাম বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। বিষয়টা নিয়ে আবার আলাপ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল ব্যাপারটা তেমন বড় কিছু না, ও-ই নাকি একটু বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলেছিল। ও একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তা বলছি না। বুঝতে পারছিলাম, নিজেকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ওকে অনুরোধ করেছিলাম সাহায্য করার সুযোগ দিতে। পরামর্শ দিয়েছিলাম, কারো সঙ্গে যেন কথা বলে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হলো, মেয়েরা যে ক্যাম্পাসে আছে, ওদেরকে নিপীড়নকারীও সেই একই ক্যাম্পাসে আছে।'

'ধর্ষক।'

'কী?'

'নিপীড়নকারী না, ধর্ষক বলুন ওকে।'

'লোকটা ঠিক কী করেছিল তা তো আমি জানি না।'

'কিন্তু সে কে, তা আপনি জানেন। ঠিক বলেছি না?'

দাঁড়িয়ে পড়ল প্রফেসর।

'তাকে আপনি চেনেন, না?' আবার বলল সাইমন।

'ও আমাকে বলেনি।'

'কিন্তু ছেলেটার নাম আপনি জানেন।'

দৃষ্টি সরিয়ে নিল ভ্যান ডি বিক। 'আন্দাজ করতে পারি। অন্তত এখন।'

'মানে কী?'

ঘন চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিল প্রফেসর। লম্বা দম নিয়ে বলল, 'ঠিক এই জায়গায় এসে কাহিনি অদ্ভুত এক বাঁক নিয়েছে, মি. গ্রিন।'

অদ্ভুত বাঁক যেন এখন আর নেয়নি? তিক্ত মনে ভাবল সাইমন।

'কোন্‌টা আগে হয়েছিল জানি না,' বলে চলেছে ভ্যান ডি বিক। 'পেইজের বদলে যাওয়া, নাকি...' থেমে গেল সে।

'নাকি কী?'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল প্রফেসর। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আরেকটা...ঘটনা ঘটেছিল ক্যাম্পাসে।'

'ঘটনা ঘটেছিল,' তার কথার পুনরাবৃত্তি করল সাইমন।

'হ্যাঁ।'

'আরেকজন ধর্ষিতা হয়েছিল বলছেন?'

এক পা পিছিয়ে গেল ভ্যান ডি বিক। 'পেইজ কিন্তু "ধর্ষণ" শব্দটা ব্যবহার করেনি। কক্ষনো না।'

এখন এসব নিয়ে তর্ক করার সময় না, জানে সাইমন। তাই আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'আরেকটা নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'একই ছেলে করেছিল কাজটা?'

মাথা ঝাঁকাল প্রফেসর। 'ঘটনা একেবারেই উল্টোটা।'

'মানে?'

'যে ছেলেটা পেইজকে হয়রানি করেছিল বলে আমার ধারণা, এবার সে-ই ছিল ভিক্টিম,' মেপে মেপে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করল ভ্যান ডি বিক।

সাইমনের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে সে। সাইমনও নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে।

'ওর নাম ডগ মালযার। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এসেছিল পিটসবার্গ থেকে। অর্থনীতিতে মেজর করছিল। ক্যাম্পাসের একটা পার্টির পর বেজবল ব্যাট দিয়ে পেটানো হয়েছিল ওকে। পা ভেঙে দিয়েছিল। তারপর ব্যাটের ছোট প্রান্তটা...ওর...' তোতলাতে শুরু করল প্রফেসর। 'হামলার ওই অংশটা কখনো প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। ওর পরিবার চায়নি ব্যাপারটা লোক জানাজানি হোক। কিন্তু ক্যাম্পাসে ঝড়ের বেগে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ও এখনো পিটসবার্গে বিশ্রাম নিচ্ছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি।'

ভয়ের শীতল শিহরণ প্রবাহিত হয়ে গেল সাইমনের শিরদাঁড়া বেয়ে। 'আপনার ধারণা, ঘটনাটার সাথে পেইজ কোনোভাবে জড়িত?'

(2,1) -129- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:50

মুখ খুলল ভ্যান ডি বিক, পরক্ষণেই বন্ধ করে ফেলল। আবারও সতর্কতার সাথে শব্দ বাছাই করে বলল, 'নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।'

'তবে একটা "কিন্তু" আছে। কিন্তুটা কী?'

'কিন্তু পরদিন সারাক্ষণ হাসি লেগে ছিল পেইজের মুখে। ঘটনাটা নিয়ে বিচলিত হয়ে ছিল সবাই। কিন্তু পেইজ আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসেই যাচ্ছিল, যেন কোনো একটা ফন্দি আঁটছে মনে মনে। যেন নেশা করে হুঁশ-জ্ঞান সব হারিয়েছে।'

'তাহলে আপনার অনুমানের সপক্ষে একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, ওর নেশা করে হাসাটা?' সাইমন জিজ্ঞেস করল। 'হয়তো যন্ত্রণা ভোলার জন্যে নেশা করেছিল ও।'

কিছু বলল না ভ্যান ডি বিক।

'ও কী ফন্দি আঁটছিল-না-আঁটছিল তাতে আমার কিচ্ছু আসে-যায় না,' ভোঁতা গলায় বলল সাইমন। 'পেইজ ওরকম কিছু করবে না।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস।' সায় দিল প্রফেসর। 'ওরকম কিছু করবে না ও। অন্তত নিজে তো কিছু করবে না-ই।'

জায়গায় জমে গেল সাইমন।

'কিন্তু পেইজ সেদিন যখন ক্লাস থেকে বেরোচ্ছিল তখন খেয়াল করেছিলাম, একটা লোক অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। অল্পবয়েসি ছেলে না। ছাত্র না। ওর চেয়ে বছর দশেকের বড় হবে লোকটা।'

অ্যারন, ভাবল সাইমন। লোকটা অ্যারন কর্ভাল।

(1,1) -130- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:50

৩১

‘আপনাকে যেসব তথ্য দিলাম, কাউকে জানাতে পারবেন না,’ ইলেনা বলছিল। ‘কারণ যে-কেউ দাবি করে বসতে পারে যে, তথ্যগুলো বেআইনি পথে জোগাড় করেছি। তাছাড়া পুলিশ বা এফবিআইয়ের কাছে গেলেও ব্যাপারটা অত গুরুত্ব পাবে না। স্রেফ কেসটার দায়িত্ব কারো কাঁধে দিতেই কয়েক দিন, বলা যায় না কয়েক হপ্তাও লেগে যেতে পারে। আমাদের হাতে এত সময় নেই...’

বিপ করে একটা শব্দ হলো ইলেনার ফোনে। আরেকটা কল এসেছে। কলার আইডি দেখা যাচ্ছে না–ব্লক করা। বেশিরভাগ লোকেরই ধারণা, এ ধরনের কলগুলো স্প্যাম কল। কিন্তু ওর ফোনে যেন এসব কল আসতে না পারে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে লু। তাই ইলেনা সাধারণত দরকারি কলই পেয়ে থাকে।

সর্বশেষ যাকে ও নিজের কার্ড দিয়েছিল সে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।

‘সাইমন, একটু ধরুন, আরেকটা কল এসেছে।’

কলটা রিসিভ করল সে। ‘হ্যালো?’

‘আহ, হাই,’ একটা নারীকণ্ঠ বলে উঠল ফিসফিসিয়ে। অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার নয়। এই মহিলার বয়েস কম–বিশের কোঠায়, বড়জোর ত্রিশ। ‘মিস রেমিরেজ বলছেন?’

‘হ্যাঁ। আপনি কে?’

‘ওহ, আমার নাম গুরুত্বপূর্ণ না।’

‘একটু জোরে কথা বলতে পারবেন?’

‘দুঃখিত, আমি একটু নার্ভাস। আমার...আমার এক বন্ধুর জন্যে ফোন করেছি। আজ একটা ক্যাফেতে তার সাথে দেখা হয়েছে আপনার।’

'আচ্ছা।'

'আপনার সাথে দেখা করা দরকার ওর–কিন্তু ও ভয় পাচ্ছে।'

অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার, ইলেনার মনে পড়ল, স্টেফানি মার্স নামে আরেক মহিলার সঙ্গে থাকে। সে-ই হয়তো ফোন করেছে।

'বুঝতে পেরেছি,' গলার স্বর যথাসম্ভব কোমল করে বলল ইলেনা। 'সেক্ষেত্রে উনি যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেখানে দেখা করতে পারি।'

'হ্যাঁ, অ্যালিসন তা-ই চায়।'

'এক সেকেন্ড ধরতে পারেন?'

'আচ্ছা।'

সাইমনকে লাইনে ধরল ইলেনা। 'সাইমন?'

'হ্যাঁ, বলুন?'

'এখন রাখছি। বেরোতে হবে। দেখা করতে চায় অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার।'

সাইমনের লাইন কেটে দিল সে। 'আপনারা কোথায় থাকেন জানি আমি। ওখানে আসতে...'

'না!' আতঙ্কিত গলায় আর্তনাদ করে উঠল মহিলা। 'ওরা আপনার পিছু নেবে! বুঝতে পারছেন না?'

'আচ্ছা, তাহলে ওটা বাদ।'

'আপনার ওপর নজর রাখছে ওরা। আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

আতঙ্কে মনে হলো প্রায়োন্মাদ হয়ে গেছে মহিলা।

'ভাববেন না,' শান্ত গলায় বলল ইলেনা। 'তাহলে একটা প্ল্যান করা যাক। এমন প্ল্যান করব, যাতে আপনাদের দুজনেরই সুবিধা হয়।'

মহিলাকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত করার জন্যে মিনিট দশেক আলাপ করতে হলো। ঠিক হলো, একটা উবার ডেকে রুট ৯৫-এর ক্র্যাকার ব্যারেল ওল্ড কান্ট্রি স্টোরের কাছে চলে যাবে ইলেনা। স্টোরের সামনে দাঁড়াবে সে। স্টেফানি–অবশেষে নিজের নাম বলেছে মহিলা–দুবার লাইট জ্বেলে গাড়ি নিয়ে আসবে ওর সামনে।

'কী ধরনের গাড়ি নিয়ে আসবেন আপনি?' জানতে চাইল ইলেনা।

'বলতে চাইছি না। বলা তো যায় না, ওরা শুনে ফেলতে পারে।'

স্টেফানি গাড়ি নিয়ে আসার পর ওতে উঠে বসবে ইলেনা। ওখান থেকে 'গোপন জায়গায়' নিয়ে যাওয়া হবে ওকে অ্যালিসনের সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে।

'একা আসবেন,' কথা শেষ করে বলল স্টেফানি।

'আচ্ছা।'

'কাউকে যদি আপনার পিছু পিছু আসতে দেখি, তাহলে ওখান থেকেই কেটে পড়ব।'

ফোন কেটে দিয়ে বিছানায় বসে স্টেফানি মার্সের নাম গুগল করল ইলেনা। তেমন কিছু পেল না। কাপড় একটু ঢিলেঢালা ব্লেজার পরে নিল ও, হোলস্টার আর পিস্তল রাখবার জন্যে। সাইমনকে আরেকবার কল করবে কি না ভাবল, কিন্তু শেষতক ওকে অ্যালিসনের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা জানিয়ে মেসেজ করে দেবে বলে স্থির করল। ফোন চার্জে দিল। লু-কে জানাল যে, একজনের সঙ্গে দেখা করতে বেরোচ্ছে। ওর ফোনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্র্যাকার বসিয়ে দিয়েছে লু। কাজেই অফিসে বসেও চব্বিশ ঘণ্টা ওর অবস্থান জানতে পারবে ওখানকার লোকেরা।

এক ঘণ্টা পর ফের কল এল সেই ব্লকড নম্বর থেকে। রিসিভ না করে বসে রইল ইলেনা। ফোন বাজতে বাজতে কেটে গেল। এটাই ঠিক হয়েছিল, এই কল আসার পর রওনা দেবে ইলেনা। রাইড-শেয়ার অ্যাপে গাড়ি খুঁজতে লাগল সে। একটা গাড়ি পেল। অ্যাপে দেখিয়েছিল আট মিনিট লাগবে আসতে, কিন্তু লাগিয়ে দিল পনেরো মিনিট।

সাউথ পোর্টল্যান্ডের জরাজীর্ণ একটা বিল্ডিঙ ক্র্যাকার ব্যারেল স্টোর। পোর্চের সামনে কয়েকটা রকিং চেয়ার পাতা, সবকটা খালি। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ইলেনা। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল ওর দিকে। ঝটপট গাড়িটার ছবি তুলে নিল ইলেনা। লাইসেন্স প্লেটটা পড়তে যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখল। তারপর লু-র কাছে পাঠিয়ে দিল ছবিটা।

বলা তো যায় না, যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বের করে ফেলতে পারে লু।

গাড়িটা কাছে এসে থামতেই প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে ভেতরে তাকাল ইলেনা। আকর্ষণীয় চেহারার এক যুবতী বসে রয়েছে চালকের আসনে, মাথায় রেড সক্স বেজবল ক্যাপ।

'স্টেফানি?'

'উঠুন। জলদি করুন, প্লিজ।'

খোঁড়া পায়ের জন্যে আর সবার মতো ত্বরিত চলাফেরা করতে পারে না ইলেনা, তাই একটু সময় লাগল। গাড়িতে উঠে বসতেই–দরজা পুরোটা লাগানোর আগেই–অ্যাকসেলারেটর দাবাল স্টেফানি মার্স।

'ফোন আছে সাথে?' জানতে চাইল স্টেফানি।

'হ্যাঁ।'

'গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিন।'

'কেন?'

(2,1) -131- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:51

‘যা কথা হবে, সব আপনার-অ্যালিসনের মধ্যে রাখবেন। কোনো রেকর্ডিং, ফোন কল কিংবা মেসেজ পাঠানো চলবে না।’

‘ফোন ফেলে কথা বলতে পারব না।’

ব্রেক কষল স্টেফানি। ‘তাহলে আর আগানোর দরকার নেই। আপনার সাথে তো পিস্তল আছে, তাই না?’

জবাব দিল না ইলেনা।

‘ওটাও গ্লাভ কমার্টমেন্টে রাখুন। আপনি ওদের হয়ে কাজ করছেন কি না তা-ও তো জানি না।’

‘এই “ওরা”টা কারা?’

‘জলদি করুন, প্লিজ।’

‘দত্তক নেয়া ছেলেগুলোর একজন নিখোঁজ হয়ে গেছে। ওর বাবার হয়ে কাজ করছি আমি।’

‘আপনার মুখের কথা এমনি এমনি বিশ্বাস করে নেব বলে আশা করছেন?’ অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ল যুবতী। ‘প্লিজ আপনার ফোন আর পিস্তল গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিন। অ্যালিসনের সাথে কথা শেষ হয়ে গেলে ওগুলো আবার নিয়ে নেবেন।’

আর কোনো উপায় নেই। ফোন আর পিস্তল বের করল ইলেনা। ওর সামনের গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খুলে ওতে রেখে দিল জিনিস দুটো, তারপর আবার বন্ধ করে দিল। জরুরি অবস্থার দেখা দিলে ওগুলো বের করতে সময় লাগবে না।

স্টেফানি মার্সের দিকে নজর দিল ও এবার। মেয়েটার মাথায় পিঙ্গল চুল, ছোট করে ছাঁটা বোধহয়–বেজবল ক্যাপের কারণে বোঝা মুশকিল–এবং, এক কথায়, দুর্দান্ত রূপসী। উন্নত চোয়াল। নিখুঁত ত্বক। দুই হাত স্টিয়ারিং হুইলে। একদৃষ্টে, অখণ্ড মনোযোগে চেয়ে আছে রাস্তার দিকে, যেন নতুন গাড়ি চালানো শিখেছে।

‘অ্যালিসনের সাথে দেখা করতে নিয়ে যাওয়ার আগে, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা দরকার।’

‘ঠিক আছে, করে ফেলুন,’ সায় জানাল ইলেনা।

‘আপনাকে আসলে কে কাজে লাগিয়েছে?’

নাম জানানোর অনুমতি নেই বলবে নাকি ভাবল ইলেনা। কিন্তু ওর মক্কেল বলে দিয়েছে, নাম জানালে কোনো অসুবিধে নেই। তাই আর ঝামেলা বাড়াল না ও। ‘সেবাস্টিয়ান থর্প। হেনরি নামের এক ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন উনি।’

‘এই হেনরিই নিখোঁজ?’

'হ্যাঁ।'

'সে কোথায় গেছে, এ ব্যাপারে সূত্র পেয়েছেন কোনো?'

'ওটা নিয়েই কাজ করছি।'

'বুঝলাম না।'

'কী বুঝলেন না?'

'হেনরি থর্পের বয়স কত?'

'চব্বিশ।'

'ছেলেটার এখনকার জীবনের সাথে তাকে দত্তক নেয়ার কী সম্পর্ক?'

'হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই।'

'অ্যালিসন খুব ভালোমানুষ। কখনো কারো কোনো ক্ষতি করেনি।'

'আমিও তার কোনো ক্ষতি করতে চাই না,' ইলেনা বলল। 'স্রেফ আমার ক্লায়েন্টের ছেলেকে খুঁজে বের করতে চাই। কিন্তু ব্যাপারটা একটু জট পাকিয়ে গেছে। অ্যালিসন যদি অতীতে কোনো অবৈধ কাজ করে থাকেন...'

'কক্ষনো ওরকম কিছু করেনি ও।'

'জানি। কিন্তু ওই দত্তকগুলো যদি শতভাগ আইন মেনে না হয়ে থাকে, আর উনি যদি সাহায্য না করেন, তাহলে সেই দায়ভার ওনার। সব তাকে একলাই সামলাতে হবে।'

'হুমকির মতো শোনাল আপনার কথাটা।'

'হুমকি দিইনি। পরিস্থিতি কতটা গুরুতর, তা বোঝাতে চেয়েছি। ঠিক কাজটা করার জন্যে–এবং আইনি ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যে–আমার চেয়ে ভালো কাউকে পাবেন না অ্যালিসন।'

সর্বশক্তিতে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল স্টেফানি মার্স, দুই হাত কাঁপছে থরথর করে। 'কোন্‌টা করলে ভালো হবে, বুঝতে পারছি না।'

'আপনাদের কারো কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই আমার।'

'কথা দিচ্ছেন তো, কারো কাছে এ ব্যাপারে কিচ্ছু বলবেন না?'

'কথা দিলাম।'

তবে কথাটা রাখতে পারবে কি না, নিশ্চিত নয় ইলেনা। প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারটা নির্ভর করে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার কী বলে, তার ওপর। আপাতত স্টেফানিকের ঠান্ডা রাখল আরকি।

ডানে মোড় নিল গাড়ি।

'উনি কোথায়?' জানতে চাইল ইলেনা।

'আমার খালা স্যালির একটা সামার কেবিন আছে।' এতক্ষণে হাসি ফুটেছে যুবতীর মুখে। 'ওখানেই অ্যালিসনের সাথে প্রথম দেখা হয় আমার। খালা আর অ্যালিসন বন্ধু। প্রতি বছরই বারবিকিউ পার্টি দেয় খালা। ছয় বছর

আগে ওই পার্টিতে দাওয়াত পেয়েছিলাম অ্যালিসন আর আমি। ও আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও, অনেক দিক থেকেই আমার চাইতে কমবয়েসি। ব্যাকইয়ার্ডে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে...তারপর কথা বলতে বলতে ভাব জমে গেল। ...চলে এসেছি।'

একটা ড্রাইভওয়েতে প্রবেশ করল গাড়ি। পথের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের কেবিন।

'আপনার খালার রুচি ভালো,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল ইলেনা।

'হ্যাঁ।'

'উনি আছেন এখানে?'

'কে, স্যালি খালা? না। খালা এখনো ফিলি-তে, আরো কয়েক মাস থাকবে। আমি হপ্তায় একবার এখানে আসি, কেয়ারটেকারের মতো আরকি। জায়গাটার কথা কেউ জানে না। এদিকে গাড়িঘোড়া এলে মাইলখানেক দূর থেকেও দেখা যায়, তাই অ্যালিসনের কাছে এই জায়গাটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়েছে।' গাড়ি পার্কিং লটে রেখে ইলেনার চোখে চোখ রাখল স্টেফানি। 'আপনার ওপর বিশ্বাস রাখছি আমরা। আসুন।'

গাড়ি থেকে নেমে এল দুজনে। নির্জন, সবুজ প্রকৃতি। বুক ভরে তাজা বাতাস টেনে নিল ইলেনা। চমৎকার। ওর পা ব্যথা করছে। পুরনো ক্ষতটা, ওর সবসময়ের সঙ্গী, নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

মন্টানার বিলিংস-এ শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের ওপর একটা রেইড চালানোর সময় পায়ে গুলি খায় ইলেনা। গুলি খাওয়ার সময় তেমন ব্যথা লাগেনি, তবে খুব বিব্রত লেগেছিল ওর।

হাসপাতালে যখন ধীরে ধীরে সেরে উঠছিল, তখনই স্পেশাল এজেন্ট জোয়েল মার্কাস প্রথম এসে ঢোকে ওর রুমে–এবং জীবনে।

সেই স্মৃতি মনে পড়তে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটে উঠল ইলেনার। স্টেফানি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে হাঁক ছাড়ল: 'অ্যালিসন? হানি?'

জবাব নেই।

সচেতন চিন্তা ছাড়াই, ব্লেজারের ভেতর হাত চালান করে দিল ইলেনা। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেল, গাড়িতে রেখে এসেছে পিস্তল আর মোবাইল ফোন। হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকল স্টেফানি মার্স। ওর ঠিক পেছনেই রইল ইলেনা। বাঁয়ে ঘুরল স্টেফানি, নড়াচড়া আগের চেয়েও দ্রুততর হয়ে গেছে। ইলেনাও ঘুরল বাঁয়ে, স্টেফানির পিছু নিতে গেল।

কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যুবতী। ধীরে ধীরে ইলেনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে।

হাসি ছড়িয়ে পড়ল যুবতীর সুন্দর মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তে ইলেনা টের পেল, ঠান্ডা একটা কিছু চেপে বসেছে ওর খুলির পেছনের অংশে।

চোখাচোখি হলো দুজনের–ইলেনার বিষণ্ন বাদামি চোখজোড়া মিলিত হলো যুবতীর গাঢ় সবুজ চোখের সঙ্গে।

সেই মুহূর্তে সব বুঝে ফেলল ইলেনা রেমিরেজ।

'খুট' শব্দটা কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জোয়েলের কথা ভাবল ও। পিস্তলটা বিস্ফোরিত হওয়ার মুহূর্তে আশায় ভরে উঠল ওর মন–আবার জোয়েলের সাথে মিলিত হবে পারবে ও।

৩২

ইলেনার মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে রয়েছে অ্যাশ।

মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে আছে ও–মাথা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, অস্বাভাবিক কোণে–দুই চোখ খোলা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে মাথার পেছন থেকে। অ্যাশ অবশ্য আগেই তারপুলিন বিছিয়ে রেখেছিল, যাতে সহজে পরিষ্কার করতে পারে। ডিডি ওর বাহুতে হাত রেখে চাপ দিল। চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল অ্যাশ, মুখে দেখতে পেল সেই হাসি। একজন সত্যিকারের প্রেমিক পুরুষ তার প্রিয়সীর সব ধরনের হাসির অর্থ বোঝে। অ্যাশও এই হাসির মানে বুঝতে পারে। মেয়েটার খুশির হাসি, কিংবা ওর অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসা হাসির অর্থ সে বোঝে।

এই হাসির মানেও অ্যাশ জানে–চূড়ান্ত সহিংসতার জন্যে জমিয়ে রাখা হাসি এটা। এবং হাসিটা সে পছন্দ করে না।

‘পুরুষের বদলে মহিলা খুন করলে,’ ডিডি বলল। ‘স্বাদ অন্য রকম লাগল নাকি?’

মস্করা করার মেজাজে নেই অ্যাশ। জিজ্ঞেস করল, ‘এর ফোন কই?’

‘গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে।’

গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে একটা ব্যাটারি চালিত জ্যামিং ডিভাইস রেখে দিয়েছিল অ্যাশ, যাতে মহিলাকে কেউ ট্র্যাক করলে কোনো সিগন্যাল না পায়। ‘গাড়ি ঘোরাও, আর ফোনটা নিয়ে এসো।’

ওর মুখে হাত রাখল ডিডি। ‘তুমি ঠিক আছ, অ্যাশ?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু এখান থেকে জলদি কেটে পড়তে হবে আমাদেরকে।’

চট করে ওর গালে একটা চুমো খেল মেয়েটা, তারপর তড়িঘড়ি করে বাইরে বেরিয়ে গেল। মৃতদেহটা তারপুলিন দিয়ে মোড়াতে আরম্ভ করল অ্যাশ। আগেই একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে ওরা, যাতে লাশটা লুকিয়ে ফেলতে

পারে। ডিডি ইলেনার ফোন নিয়ে এল, মহিলাকে যে-ই খোঁজে তাকেই 'আমি ঠিক আছি' লিখে মেসেজ পাঠিয়ে দেবে। ইলেনা রেমিরেজের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কেউ গুরুত্বের সাথে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করার আগে নিদেনপক্ষে কয়েকটা দিন সময় পাবে ওরা। কে জানে, এরচেয়ে বেশিও পেতে পারে।

ততদিনে অ্যাশ আর ডিডির সমস্ত কাজ সারা হয়ে যাবে। ওদেরকে ধরার মতো কোনো সূত্রই পাবে না পুলিশ।

'নিয়তির কী নির্মম পরিহাস!' অ্যাশ যখন পুরো প্ল্যানটা ওকে বিস্তারিত শুনিয়েছিল, চেহারায় মেকি দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটিয়ে তুলে বলেছিল ডিডি। নির্মম পরিহাসই বটে! 'নিখোঁজ' হেনরি থর্পকে খুঁজতে এসে নিজেই 'নিখোঁজ' হয়ে গেল ইলেনা রেমিরেজ। অথচ থর্প মরে গেছে অনেকদিন আগেই। এতদিন একটা মরা মানুষকে খুঁজেছে ইলেনা। আজ সে নিজেও পরিণত হলো মরা মানুষে।

ফোন আর জ্যামার নিয়ে কেবিনে ফিরে এল ডিডি। 'এই নাও।'

'লাশটা জলদি মুড়তে হবে। হাত লাগাও।'

সহাস্যে ওকে স্যালুট করল মেয়েটা। 'ঠিক হ্যায়, জাঁহাপনা।'

মৃতদেহের পাশে বসে ইলেনার হাত ধরল অ্যাশ। দেহটা এখনো গরম আছে, তাই বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে এখনো ফোনটা আনলক করতে পারার কথা। মৃত ইলেনার বুড়ো আঙুল চেপে ধরল সে ফোনের সাথে।

খুলে গেল লক।

ওয়ালপেপারে দৈত্যের মতো লম্বা এক লোকের সঙ্গে ইলেনার ছবি। ইলেনার মুখে চওড়া হাসি, দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে লোকটাকে।

অ্যাশের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল ডিডি। 'এই ব্যাটাই ওর জোয়েল নাকি?' গাড়িতে আসার সময় জোয়েলের কথা বলেছিল ইলেনা ওকে।

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' জবাব দিল অ্যাশ। ডিডি ওকে ফোনে রেখেছিল, তাই দুজনের সব কথা শুনতে পেয়েছিল সে। 'তোমার কি আসলেই কোনো খালা-টালা আছে?'

'নাহ।' মাথা নাড়ল ডিডি।

বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাশ। 'দারুণ অভিনয় করেছ।'

'কেন, তোমার মনে নেই স্কুলে দারুণ অভিনয় করতাম আমি?'

মনে পড়ে গেল অ্যাশের, আসলেই খুব ভালো অভিনয় করত মেয়েটা। স্কুলের নাটকে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত সে অভিনয় দিয়ে। চেষ্টা করলে হয়তো বড় অভিনেত্রী হতে পারত ও।

ইলেনার ফোনের সেটিং অপশন থেকে প্রাইভেসি আইকন খুঁজে বের করল অ্যাশ। ওখান থকে লোকেশন সার্ভিস ক্লিক করল, তারপর গেল সিস্টেম সার্ভিসে। স্ক্রল করে সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস বার করল। ওতে

(2,1) -134- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:51

চাপ দিতেই আবারও আঙুলের ছাপ চাওয়া হলো। ইলেনার হাত ধরে ছাপ দিল সে। তারপর পাসওয়ার্ড বদলে ফেলল, যাতে এরপর থেকে আর ছাপ দেয়ার দরকার না হয়।

লোকে বুঝতেই পারে না নিজের গোপনীয়তার কতখানি তারা অন্যের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। যেকোনো আইফোনে যেকোনো সময় অ্যাশ এখন যা করছে, ঠিক তা-ই করা যায়। চাইলেই ফোনের মালিকের সাম্প্রতিক কাজকর্মের গোটা ইতিহাস দেখে নেয়া যায়। এখন যেমন ইলেনা রেমিরেজেরটা দেখে নিচ্ছে অ্যাশ।

'ধুর!' সখেদে বলে উঠল সে।

'কী হলো?'

'ট্যাটু পার্লারে গেছিল বেটি।'

'যেতে যে পারে, তা তো আরো আগেই ধারণা করেছিলাম। সেজন্যেই তো আমরা এত দ্রুত কাজে নামলাম।'

ফোনের লোকেশনগুলোর লিস্ট চেক করল অ্যাশ। নিউ ইয়র্ক শহরের কয়েকটা জায়গা দেখতে পেল। সম্প্রতি ওয়ান সিক্সটি এইটথ স্ট্রিটের কাছে কলম্বিয়া মেডিক্যাল সেন্টারে গিয়েছিল ইলেনা রেমিরেজ। ওখানে গিয়েছিল কেন, ভাবছে অ্যাশ। পরক্ষণেই আরেকটা জায়গার নাম দেখে আরো বিচলিত হয়ে পড়ল সে।

'ব্রঙ্কসে গেছে।'

তারপুলিন বাঁধা শেষ করল ডিডি। 'একই জায়গায়?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল অ্যাশ।

'ব্যাপার ভালো না,' গম্ভীর গলায় বলল ডিডি।

'জলদি করতে হবে।'

দ্রুত একবার ইলেনার ফোন লগ আর মেসেজ ঘাঁটল সে। সর্বশেষ মেসেজটা এসেছে আট মিনিট আগে। ওতে লেখা:

এখনো দেখা হয়নি অ্যালিসনের সঙ্গে? যত জলদি পারেন, আমাকে জানান, প্লিজ।

ওর চেহারা দেখে ডিডি বুঝতে পারল, কোথাও একটা ঘাপলা হয়ে গেছে। 'ব্যাপার কী?'

'আরো একজন কাছিয়ে আসছে।'

'কে?'

ফোনটা ডিডির দিকে ঘুরিয়ে ধরল অ্যাশ, যাতে নামটা পড়তে পারে। 'লোকটা নাম সাইমন গ্রিন। এরও একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।'

৩৩

একটা সিট ফাঁকা পেয়ে বসে পড়েছে সাইমন। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এইমাত্র পাওয়া খবরগুলোর মর্মার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। কোনোকিছুরই মানে বুঝতে পারছে না। ধাঁধার আরেকটা টুকরোর সন্ধান পেয়েছে সে। খুব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো। সম্ভবত তার মেয়ের নেশায় আসক্ত হওয়ার কারণ লুকিয়ে রয়েছে এই টুকরোটিতে। কিন্তু যতই তথ্য পাচ্ছে, রহস্য যেন ক্রমেই তত জটিল হয়ে উঠছে।

পাতাল রেল থেকে নেমে আবার রাস্তায় উঠতেই ইভোনির কাছ থেকে একটা মেসেজ পেল সে।

টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সই করে টাকাটা নিতে হবে তোমাকে। টড রাইসখের খোঁজ কোরো।

একটা ওয়েন্ডি'স ও হাই-এন্ড বেকারির মাঝখানে অবস্থিত ব্যাংকটা। ভেতরে কোনো ভিড়ভাট্টা নেই। নিজের নাম জানিয়ে টড রাইসখের সাথে কথা বলতে চাইল সাইমন। পুরোদস্তুর পেশাদার লোক রাইসখ। পেছনের একটা রুমে সাইমনকে নিয়ে গেল সে।

'একশো ডলারের নোট হলে চলবে?' জানতে চাইল লোকটা।

'চলবে,' জবাব দিল সাইমন।

টাকা গুনতে শুরু করল রাইসখ। 'ব্যাগে ভরে দেব?'

'লাগবে না।'

ব্যাগ নিয়েই এসেছে সাইমন। প্লাস্টিকের ব্যাগটা কদিন আগে জাবার-এ ঘুরতে গিয়ে কিনে এনেছিল ইনগ্রিড। টাকাগুলো ওতে ভরে ব্যাগটা ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে রাখল সে। রাইসখকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে।

হাসপাতালে যাবার পথে জেনেটিকস টেকনিশিয়ান র‍্যান্ডি স্প্র্যাটকে ফোন করল সে। লোকটা কল রিসিভ করতে বলল, 'টাকা নিয়ে এসেছি।'

(2,1) -135- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:52

'দশ মিনিট।'

ফোন কেটে দিল সে।

ইলেনা রেমিরেজের কাছ থেকে কোনো মেসেজ এসেছে কি না দেখল সাইমন। আসেনি। খুব তাড়াহুড়ো হয়ে গেল বোধহয়, তবু একটা মেসেজ পাঠিয়ে রাখল সে:

এখনো দেখা হয়নি অ্যালিসনের সঙ্গে? যত জলদি পারেন, আমাকে জানান, প্লিজ।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না।

ফোনের দিকে চোখ রেখেই দ্রুত পায়ে হাঁটছে সাইমন। পিতৃত্ব পরীক্ষার ব্যাপারটা খোঁচাচ্ছে ওকে।

ধরা যাক, ও পেইজের আসল বাবা নয়।

ধরা যাক, স্যাম বা আনিয়ার আসল বাবাও ও নয়।

তাহলে কী হবে?

নাহ, তা অসম্ভব। ইনগ্রিড কখনো ওর সাথে ওরকম কিছু করবে না। তবু খুঁতখুঁত করছে ওর মনের মাঝে। কোথায় যেন একটা পরিসংখ্যানে পড়েছিল, ১০ শতাংশ পিতাই নিজের অজান্তে অন্য লোকের সন্তানকে লালনপালন করছে। নাকি ২ শতাংশের কথা লিখেছিল? নাকি পুরোটাই ফালতু বাকোয়াজ?

হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক উইঙের পেছনে পৌঁছে দেখে, কোনার দিকের একটা বেঞ্চে বসে আছে র‍্যান্ডি স্প্র্যাট। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসে রয়েছে স্প্র্যাট, ভীত বীবরের মতো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে তার চোখ দুটো।

লোকটার পাশে গিয়ে বসে পড়ল সাইমন। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে দুজনে।

'টাকা এনেছেন?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল স্প্র্যাট।

'এভাবে কথা বলছেন কেন? চোরাচালানের কাজে আসিনি আমরা।'

'টাকা এনেছেন নাকি আনেননি?'

ব্যাকপ্যাক খুলে প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করে আনল সাইমন। টাকাটা দেয়ার আগে ইতস্তত করতে লাগল সে। আসলেই কি কোনো দরকার আছে এই প্যান্ডোরার বাক্স খোলার? কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো অজ্ঞতাই আশীর্বাদস্বরূপ, তাই না? ইনগ্রিডের 'গোপন অতীত' সম্পর্কে কিছু না জেনেই তো সুখে-শান্তিতে বাস করছিল সে এতদিন।

কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে।

দ্বিধা কাটিয়ে টাকাটা দিয়ে দিল সাইমন। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ওখানে বসেই টাকা গুনতে শুরু করবে স্প্র্যাট। কিন্তু তাকে ঝটপট প্লাস্টিকের ব্যাগটা কোটের ভেতর চালান করে দিতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সাইমন।

'তো? রেজাল্ট কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

(1,1) -136- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:52

'যেটার ফলাফল জানা বেশি জরুরি বলেছিলেন, সেটা নিয়েই আগে কাজ করেছি। তাই ওটার ব্যাপারেই শতভাগ নিশ্চিত করে বলার মতো ফলাফলে আসতে পেরেছি।'

'ফলাফলটা কী?' জানতে চাইল সাইমন।

'ইতিবাচক।'

'তার মানে...?'

'আপনিই বায়োলজিক্যাল পিতা।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সাইমন।

'আর সবগুলো টেস্টেই–প্রাথমিক ফলাফল হলেও–প্রমাণ হয়েছে যে, আপনিই বায়োলজিক্যাল পিতা।'

আরেকটা কথাও বলল না র‍্যান্ডি স্প্র্যাট। উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে গেল। স্থির বসে থাকল সাইমন, নড়াচড়ার শক্তি পাচ্ছে না।

এবার পেইজকে খুঁজে বের করতে হবে।

ফোন দেখল সাইমন। কোনো মেসেজ আসেনি ইলেনা রেমিরেজের কাছ থেকে। আরেকটা মেসেজ টাইপ করল সে:

ডিএনএ টেস্টে প্রমাণ হয়েছে আমি পেইজের বাবা। অ্যারনের সাথে ওর সম্পর্ক কী করে হলো, এখনো জানি না। তবে আমার ধারণা, রহস্যের চাবি লুকিয়ে আছে বেআইনি দত্তকগুলোতে। অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের সঙ্গে কথা শেষ করে আমাকে ফোন করবেন।

ইনগ্রিডের কাছে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। লম্বা একটা দম নিল, তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত বাতাস বের করে দিল ফুসফুস থেকে।

সহসা টের পেল, কেঁপে উঠেছে ওর ফোন। জবাব দিয়েছে ইলেনা:

কানাডা সীমান্তে যাচ্ছি দেখা করতে। তাই কয়েকদিন হয়তো যোগাযোগ করতে পারব না। আপনি কোথায় থাকবেন?

কানাডা? ব্যাপার কী? এত দূরে কেন?

উত্তর দিল সাইমন:

আপাতত হাসপাতালে আছি, তবে অন্য কোথাও-ও থাকতে পারি।

মেসেজ পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কয়েকটা ফোঁটা নাচছে–অর্থাৎ উত্তর টাইপ করছে ইলেনা:

নতুন কিছু জানতে পারলে জানাবেন। আমি জবাব দিতে না পারলেও জানাবেন। সব ব্যাপার জানা থাকা দরকার আমার।

জানাবে বলে উত্তর দিল সাইমন। তারপর হাসপাতালে ঢুকে আইসিইউয়ের সামনে চলে এল। কানাডা সীমান্তে যাবার দরকার হলো কেন ইলেনার, অথবা জবাব দিতে পারবে না কেন, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। তবে অভদ্রতা হতে পারে ভেবে ইচ্ছেটা দমাল। ইলেনার চিন্তা চলে

যেতেই ভ্যান ডি বিকের বলা কথাগুলো হুড়মুড় করে বানের জলের মতো ঢুকে পড়ল মাথার মধ্যে।

ক্যাম্পাসে কী হয়েছিল পেইজের সাথে?

নার্সরা ইনগ্রিডকে গোসল করিয়ে ওর কাপড় বদলে দিচ্ছে। তাই করিডরে পায়চারি করছিল স্যাম। বাপকে দেখে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'স্যরি, কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি,' বলল ও।

'জানি। কোনো সমস্যা নেই।'

বাপের দিকে চেয়ে ক্লান্ত হাসি দিল স্যাম। 'কোথায় গিয়েছিলে?'

ছেলেকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে চায় সাইমন। তাই বলে ননীর পুতুলও বানিয়ে রাখতে চায় না ওকে। সেজন্যে সত্যি কথাটাই বলল, 'পেইজের এক প্রফেসরের সাথে কথা বলে এলাম।'

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল স্যাম।

যতটা সম্ভব ভদ্র ভাষায়, রেখেঢেকে স্যামকে যৌন নিপীড়নের ঘটনাটা জানাল সাইমন। নিঃশব্দে ওর কথা শুনল ছেলেটা। প্রাণপণে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু সাইমন লক্ষ করল তিরতির করে কাঁপছে ওর অধর।

'ঘটনাটা কবে ঘটেছিল?' বাপের কথা শেষ হলে জানতে চাইল সে।

'ঠিক জানি না। প্রথম সেমিস্টারের শেষ দিকে।'

'এক রাতে আমাকে ফোন করেছিল ও। পেইজ। একদম আচমকা। আসলে টুকটাক মেসেজ চালাচালি ছাড়া আর কোনো ধরনের যোগাযোগ হতো না আমাদের। কেউ কাউকে কখনো ফোন করতাম না।'

'কী বলেছিল ও?'

'শুধু বলেছিল কথা বলতে চায়।'

'কী নিয়ে?'

'জানি না।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। 'এক শুক্রবারে গভীর রাতে করেছিল ফোনটা। মার্টিন'স-এ একটা পার্টিতে ছিলাম আমি। আসলে মন দিয়ে ওর কথা শুনিইনি। আমি তখন কোনোমতে ফোন কেটে দিতে পারলেই বাঁচি। তা-ই করেছিলাম।'

ছেলের কাঁধে হাত রাখল সাইমন। 'ঘটনাটা হয়তো ওই রাতের না, স্যাম।'

'হ্যাঁ, হয়তো ওই রাতের না,' বলল স্যাম। তবে বলার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল বাপের কথায় মোটেও প্রবোধ দিতে পারেনি নিজেকে।

আরো কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল সাইমন, কিন্তু কাউকে গলা খাঁকারি দিতে শুনে থেমে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল সে–ইনগ্রিডের জীবন বাঁচানো লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে।

'কর্নেলিয়াস?'

লোকটার পরনে ছেঁড়াখোঁড়া জিন্স, গালে উষ্কখুষ্ক ধূসর-সাদা দাড়ি।

'ইনগ্রিড কেমন আছে?' জানতে চাইল কর্নেলিয়াস।

'বলা কঠিন।' স্যামের দিকে ফিরল সাইমন। 'স্যাম, ও কর্নেলিয়াস। ও...' পরক্ষণেই থেমে গেল সে। কর্নেলিয়াসই যে লুথারকে গুলি করে শুধু ইনগ্রিডের নয়, ওর জীবনও বাঁচিয়েছে তা তো আর ওকে জানানো যায় না। 'ব্রঙ্কসের যে বিল্ডিঙে পেইজ থাকত, ওটার মালিক কর্নেলিয়াস। আমাদের অনেক উপকার করেছে ও।'

হাত বাড়িয়ে দিল স্যাম। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমিও, বাছা।' সংক্ষেপে পরিচয়পর্ব সেরে সাইমনের দিকে ফিরল কর্নেলিয়াস। 'তোমার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে একটু বাথরুমে যেতে হবে,' দুজনকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে চলে গেল স্যাম।

'কী ব্যাপার?' কর্নেলিয়াসের দিকে ফিরে জানতে চাইল সাইমন।

'আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে তোমাকে,' কর্নেলিয়াস বলল।

'কোথায়?'

'আমার অ্যাপার্টমেন্টে। রোকোও আসছে ওখানে। লুথারকে নিয়ে। কী যেন বলবে ওরা–তোমার শোনা দরকার।'

(2,1) -137- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:52

৩৪

অ্যাশ আর ডিডি তৈরিই ছিল, তাই দ্রুত কাজ সারতে পারছে।

মাল বওয়ার একচাকার ঠেলাগাড়িতে করে পেছনের দরজা দিয়ে ইলেনার দেহ বের করল ওরা। অ্যাশ ঠেলা নিয়ে বনে ঢুকল–ডিডি থেকে গেল কেবিনে, জায়গাটা পরিষ্কার করতে।

গর্ত খুঁড়তে সময় লাগে, তবে ভরতে সময়ের দরকার নেই। তাই বেশিক্ষণ লাগল না অ্যাশের।

কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। দক্ষিণে রওনা দিল দুজনে। ইলেনার ফোন ঘাঁটতে লাগল ডিডি।

'তেমন কিছু পেলাম না,' ঘাঁটাঘাঁটি শেষ করে অ্যাশকে জানাল ও। 'ভিএমবি ইভেস্টিগেশনসের রাঘব বোয়াল ইলেনা রেমিরেজ। সেটা তো আগেই জানতাম আমরা। তার ক্লায়েন্ট হেনরি থর্পের বাপ। সেটাও জানতাম।' মুখ তুলে তাকাল সে। 'ভালো কথা, কাজটার অনুমতি পেয়ে গেছি।'

'কোন্ কাজের অনুমতি?'

'সাইমন গ্রিন। বাকিদের সমান টাকাই পাবে।'

'গুগল করে দেখ তো লোকটার ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি না,' অ্যাশ বলল। 'শিকার সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিতে চাই।'

টাইপ করতে আরম্ভ করল ডিডি। বেশিক্ষণ লাগল না। পিপিজি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের ওয়েবসাইট পেয়ে গেল শিগগিরই। সাইমন গ্রিনের জীবনবৃত্তান্তও পেয়ে গেল। দুটো ছবি পেল ওর–একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, আরেকটা পুরো পিপিজি টিমের সাথে গ্রুপ ফটো।

'বারো পারসেন্ট ব্যাটারি আছে,' ডিডি বলল। 'এই ফোনের চার্জার আছে আমাদের কাছে?'

‘আমার সিটের পেছনের পকেটে দেখ।’

ডিডি সবে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় কেঁপে উঠল ইলেনার ফোন। নতুন একটা মেসেজ এসেছে সাইমন গ্রিনের কাছ থেকে। জোরে জোরে মেসেজটা পড়ে শোনাল সে অ্যাশকে:

ডিএনএ টেস্টে প্রমাণ হয়েছে আমি পেইজের বাবা। অ্যারনের সাথে ওর সম্পর্ক কী করে হলো, এখনো জানি না। তবে আমার ধারণা, রহস্যের চাবি লুকিয়ে আছে বেআইনি দত্তকগুলোতে। অ্যালিসন মেফ্লাওয়ারের সঙ্গে কথা শেষ করে আমাকে ফোন করবেন।

আবারও মেসেজটা পড়তে বলল সে ডিডিকে। পড়া শেষ হলে বলল, ‘উত্তর না দিলে লোকটা দুশ্চিন্তা শুরু করতে পারে। তখন হয়তো ফোনই করে বসবে।’

কথাটা শুনে জবাব লিখল ডিডি:

কানাডা সীমান্তে যাচ্ছি দেখা করতে। তাই কয়েকদিন হয়তো যোগাযোগ করতে পারব না। আপনি কোথায় থাকবেন?

‘ঠিক আছে...?’ জবাবটা অ্যাশকে দেখিয়ে জানতে চাইল সে।

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল অ্যাশ। অ্যাকসেলারেটর দাবাল অ্যাশ।

ফোনের পর্দায় কয়েকটা ডট নাচছে দেখে ডিডি জানাল, ‘উত্তর টাইপ করছে।’

‘এই আলাপটা শেষ হলে মেসেজিং অ্যাপটা বোধহয় আনইনস্টল করে দেয়া উচিত।’

‘কেন?’

‘ওটা হয়তো কোনোভাবে ট্রেস করে ফেলতে পারবে।’

আবার কেঁপে উঠল ফোনটা:

আপাতত হাসপাতালে আছি, তবে অন্য কোথাও-ও থাকতে পারি।

‘হাসপাতালে আছে,’ অস্ফুটে বলল ডিডি। ‘নাম জিজ্ঞেস করব?’

‘না, সন্দেহ করে বসবে। তাছাড়া, নামটা তো আমরা জানিই। ইলেনার ফোনের হিস্ট্রিতেই আছে, সম্প্রতি আপার ম্যানহাটনের এক হাসপাতালে গিয়েছিল সে।’

‘ভালো বলেছ। তাহলে এটা লিখলে কেমন হয়...’

লেখাটা টাইপ করে অ্যাশকে জোরে পড়ে শোনাল সে: ‘নতুন কিছু জানতে পারলে জানাবেন। আমি জবাব দিতে না পারলেও জানাবেন। সব ব্যাপার জানা থাকা দরকার আমার।’

মাথা দুলিয়ে মেসেজটা পাঠিয়ে দিতে বলল অ্যাশ। পাঠাল ডিডি।

‘এবার ফোনটা বন্ধ করো।’

কয়েক মিনিট নীরবে কেটে যাওয়ার পর ডিডি মুখ খুলল, ‘কী হয়েছে?’

'কী হয়েছে তুমি জানো।'

'সত্যি বলছি, জানি না।'

'সাইমন গ্রিনের মেসেজটা,' বলল অ্যাশ।

'ওটাতে কী সমস্যা?'

'ধারণা করছি, অ্যারন হচ্ছে অ্যারন কর্ভাল। কি বলো?'

'আমিও তা-ই ধারণা করছি।'

'তাহলে পেইজ কে?'

'অ্যারনের গার্লফ্রেন্ড।'

'এসবের সাথে ওর বাবা জড়িয়ে পড়েছে কেন?'

'জানি না।' অ্যাশের দিকে ঘুরে বসল ডিডি। 'এতদিন ভাবতাম, কারণ নিয়ে কখনো মাথা ঘামাও না তুমি, অ্যাশ।'

'সাধারণত ঘামাই না।'

'ওই মহিলাকে খুন করতে ভালো লাগেনি তোমার,' ডিডি বলল। 'পুরুষ খুন করতে তোমার কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু মহিলা?'

'তুমি থামবে? ব্যাপারটা তা না।'

'তাহলে কী?'

'কেউ একজন রহস্যের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে ফেলেছে। সেজন্যেই এখন আমার কাজ মোটিভ আর বিস্তারিত জানা।'

ঘুরে জানালার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ডিডি।

'অবশ্য তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো আরকি,' বলল অ্যাশ।

'তুমি জানো, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। দুনিয়ার আর সবার চাইতে বেশি বিশ্বাস করি তোমাকে।'

বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল অ্যাশের। 'তো?'

'চিহ্নের লেখা অনুসারে, ট্রুথের প্রথম দুই পুত্রসন্তান ভিজিটর আর ভলান্টিয়ারকেই হতে হবে,' বলতে শুরু করল মেয়েটা। 'পুরুষ মানেই শ্রেষ্ঠ। মেয়েরা–ট্রুথ কমপক্ষে বিশ কন্যার বাপ–নেতৃত্বের প্রশ্নে কোনো কাজে আসে না। কিন্তু পুরুষ উত্তরাধিকারীই সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন, কেননা একমাত্র পুরুষই রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় হয়ে থাকে। স্ত্রী বা স্বামী তোমার নিজের রক্তের মানুষ না। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথেও রক্তের সম্পর্ক থাকে না। কাজেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে...'

'ডি?'

'হুঁ?'

'এসব কঠিন কঠিন শব্দ বাদ দাও। ব্যাপার মোটামুটি বুঝে নিয়েছি আমি। ভারটেজের দুই ছেলে নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী।'

'সবকিছুরই উত্তরাধিকারী ওরা। এই হলোগে আসল ব্যাপার। সে কারণেই প্রতীকগুলোতে লেখা: "দুই পুত্র উত্থিত হবে।"'

'তাহলে তার সাথে এসবের কী সম্পর্ক?'

'আরো একটা কথা লেখা আছে,' বলল ডিডি, 'ট্রুথ হেইভেন এবং ট্রুথের সমস্ত সয়-সম্পত্তি তার পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেয়া হবে।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম। তো?'

'ওতে নির্দিষ্ট করে লেখা নেই যে, "সবার বড়" দুই উত্তরসূরিই পাবে সবকিছু। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

এবার সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠছে অ্যাশের কাছে। 'এই দুজন ছাড়াও আরো পুত্রসন্তান আছে ভারটেজের?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য ছেলেগুলো...'

'...হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, দত্তক দিয়ে দেয়া হয়েছিল,' ডিডি বলল। 'আসলে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। মেয়েদেরকে রেখে দিয়েছিল, কারণ ওদেরকে কাজে লাগানো যেত। কিন্তু ছেলেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বনে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী নষ্ট করে দিতে পারত। এসবই বহু বছর আগের কথা–আমার জন্মেরও আগের।'

'তার মানে, ভারটেজ তার ছেলেদের বেচে দিয়েছিল?'

'কাজটা দুই পক্ষের জন্যই লাভজনক ছিল, অ্যাশ। দুই-পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক রাখি আমরা–আর হেইভেনের জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা কামাই।'

'দারুণ।'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেগুলোর মায়েরা রাজি হতো এতে?'

'কেউ কেউ হতো,' ডিডি বলল, 'কেউ কেউ হতো না।'

'তো কাজটা হতো কীভাবে?'

'অনেক মেয়ের সঙ্গে শুতো ট্রুথ। স্বাভাবিকভাবেই কারো কারো পেট বেঁধে যেত। তাদেরকে বলা হতো, ছেলেবাচ্চা হলে ওদের জন্যে ভালো ব্যবস্থা করা হবে। তার মানে ছিল, আরকানসাসে গ্রেটার হেইভেনে পাঠানো হবে ওদের। ছেলেবাচ্চাদের জন্যে ওটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা ছিল।'

'আরো হেইভেন আছে...?'

'না, অ্যাশ।'

মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'মায়েরা বিশ্বাস করত এই কথা?'

'কেউ কেউ করত, কেউ কেউ করত না। ট্রুথের নিয়ম আর এই মায়েদের মাতৃত্বের প্রবৃত্তির মধ্যে এ এক অন্তহীন টানাপড়েন ছিল। শেষতক সাধারণত ট্রুথই জিতত।'

'আর মায়েরা যখন জিতত, তখন?'

'তাদের বলা হতো, জন্ম নেয়ার সময় তাদের বাচ্চা মারা গেছে।'

অ্যাশ সাধারণত স্তম্ভিত হয় না। এ কথা শুনে হলো। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ। বড়সড় করে শেষকৃত্যের আয়োজন করা হতো। কোনো কোনো মা বিশ্বাস করত, নিজের দোষেই মৃত সন্তান প্রসব করেছে তারা। ভাবত, তারা যদি বাচ্চাকে গ্রেটার হেইভেনে পাঠাতে রাজি হয়ে যেত...'

'ঈশ্বর!'

মাথা দোলাল ডিডি। 'ছেলে বাচ্চাগুলোকে বিক্রি করে দেয়া হতো। একটা স্বাস্থ্যবান সাদা ছেলেবাচ্চার দাম কত হতে পারে, ধারণা আছে তোমার? লক্ষ লক্ষ ডলার। অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার—যে এখনো ট্রুথের প্রতি অনুগত—কাজ করত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে।'

'কতগুলো বাচ্চা বিক্রি করেছে ট্রুথ?'

'সবগুলো ছেলে।'

'বুঝেছি। কতগুলো?'

'চোদ্দটা।'

'ট্রুথের মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে এখন,' মন্তব্য করল অ্যাশ।

'হ্যাঁ।'

'আর ভারটেজের ছেলেরা—ভিজিটর আর ভলান্টিয়ার—ভয় পাচ্ছে যে, এসব ছেলেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করতে আসবে।'

'এত বছর ট্রুথ, ভলান্টিয়ার আর ভিজিটরের—বলতে কী, আমাদের কারোরই ভয়ের কিছু ছিল না। দত্তক নেয়া ছেলেগুলোকে ট্রুথ হেইভেনের সাথে জড়ানোর কোনো উপায় ছিল না। সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তারা। আর নিরাপদ থাকার জন্যে অ্যালিসন মেফ্লাওয়ার সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করে দিয়েছিল। কাজেই, ছেলেদেরকে খুঁজে বের করার কোনো উপায় ছিল না ট্রুথের। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেরাও কখনো খুঁজে বের করতে পারত না তাকে।'

'তাহলে ঘাপলাটা বাধল কোথায়?' জানতে চাইল অ্যাশ।

'২৩অ্যান্ডমি অথবা অ্যানস-স্টোরির মতো ওয়েবসাইটগুলোর নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ।'

(1,1) -140- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:53

'দত্তক সন্তান হিসেবে বড় অসংখ্য লোক ডিএনএর নমুনা এসব কোম্পানিতে পাঠিয়ে নিজের আসল পরিচয় এবং আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে জানতে শুরু করেছে,' বলল ডিডি।

'তার মানে, ট্রুথের কয়েকজন ছেলেও বোধহয়...'

'পরস্পরের সম্পর্কে জেনে যায়। পরিচয়ও হয় ওদের।'

'তারপর কোনোভাবে ভারটেজের খোঁজ বের করে ফেলে ওরা?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ঘটনাটা দাঁড়াল এরকম: ভারটেজের যেকোনো দুই ছেলে একই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করল। তারপর জানতে পারল, ওরা দুজন সৎ ভাই।'

'তারপর তৃতীয়জন উদয় হলো। তারপর চতুর্থজন। সবই ইদানীংকার ঘটনা।'

'আর তারপরই তোমার কাল্টের কেউ একজন সিদ্ধান্ত নিল, এই সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, সমস্যাটাকেই ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করে দেয়া।' ডিডির দিকে তাকাল অ্যাশ। আবারও হাসল মেয়েটা। 'নেতৃস্থানীয় পদের বিনিময়ে করছ কাজটা?'

'অনেকটা ওরকমই।'

বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'ট্রুথ হেইভেনের সয়-সম্পত্তির পরিমাণ কত, ডি?'

'হিসেব করে বলা কঠিন,' জবাব দিল মেয়েটা। 'তবে চল্লিশ মিলিয়ন ডলারের আশপাশে হবে।'

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল অ্যাশের। 'বাপ রে!'

'কিন্তু ব্যাপারটা শুধু টাকার নয়।'

'ওহ, আচ্ছা।'

'তোমার নাক সিটকানো কিছুক্ষণের জন্য থামাও তো। আরো চোদ্দজন ছেলে যদি নিজেদের দাবি নিয়ে হাজির হয়, ট্রুথ হেইভেনের কী হবে, একবার ভেবে দেখ তো। একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'ওহ, ডি!'

'কী হলো?'

'ট্রুথ নিয়ে বকবকানি থামাবে? তুমিও জানো, পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন। নিজেই স্বীকার করেছ আমার কাছে।'

মাথা নাড়ল ডিডি। 'তুমি একেবারেই অন্ধ, অ্যাশ। ট্রুথকে আমি ভালোবাসি।'

'আর তুমি যা চাও, সেটা পাওয়ার জন্যে ওটাকে ব্যবহার করছ।'

‘হ্যাঁ। সেটাই তো স্বাভাবিক। কেউই একটা পবিত্র গ্রন্থের প্রতিটা বাক্য বিশ্বাস করে না। নিজেদের সুবিধামতো অনুচ্ছেদ বেছে নিয়ে কাজে লাগায় তারা। এটাই জীবন, সোনা।’

মেয়েটার যুক্তি উন্মাদের মতো শোনালেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরচেয়ে সত্যি কথা আর হয় না। তাই আর তর্কে গেল না অ্যাশ।

গাড়ির ভেতরটা গরম হয়ে উঠছে। এসি চালিয়ে দিল সে। ‘তাহলে আর মাত্র দুজন ছেলেকে খতম করা বাকি আমাদের।’

‘হ্যাঁ। একজন ব্রঙ্কসে, আরেকজন ট্যালাহাসিতে,’ জবাব দিল ডিডি। তারপর যোগ করল: ‘ওহ, ভালো কথা, সাইমন গ্রিনকেও তো কতল করতে হবে।’

(1,1) -141- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:53

৩৫

ঘণ্টা কয়েক আগে সাইমন যে ব্যাংক থেকে ডিএনএ টেস্টের জন্যে টাকা তুলেছিল, সেই একই ব্যাংকের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে সে কর্নেলিয়াসের সাথে। কর্নেলিয়াসকে পাঠিয়ে রোকো বুঝিয়ে দিয়েছে, তথ্যটা বিনে পয়সায় দিতে নারাজ সে। কাজেই ফের ব্যাংকে এসেছে সাইমন টাকা তুলতে।

ইতিমধ্যেই বের বড় অঙ্কের টাকা তুলে ফেলেছে সাইমন। আরো টাকা তুলে কারো মনোযোগ টানতে চায় না–তাই ইভোনিকে ডেকেছে সাহায্যের জন্যে। তাকেই হেঁটে আসতে দেখল এদিকে।

'কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল সাইমন।

'না।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে কর্নেলিয়াসকে দেখল ইভোনি। 'ও কে?'

'কর্নেলিয়াস,' জবাব দিল সাইমন।

তার দিকে ফিরল ইভোনি। 'তুমি কে, কর্নেলিয়াস?'

'বন্ধু,' উত্তর দিল কর্নেলিয়াস।

লোকটাকে আপাদমস্তক জরিপ করল ইভোনি। তারপর জানতে চাইল, 'টাকা লাগবে কেন তোমার?'

'ওর জন্যে না,' সাইমনের তরফ থেকে এল উত্তরটা। 'ও আমাকে সাহায্য করছে।'

'কী করতে সাহায্য করছে?'

অল্প কথায় রোকো আর লুথারের ব্যাপারটা জানাল ওকে সাইমন। স্বাভাবিকভাবেই কর্নেলিয়াস যে ওর আর ইনগ্রিডের জীবন বাঁচিয়েছে সেই অংশটুকু চেপে গেল।

'কারো চোখে পোড়ো না,' ওর কথা শেষ হওয়ার পর বলল ইভোনি। 'আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে আনছি।'

সাইমন ওকে বলতে চাইল, টাকাটা পরে দিয়ে দেবে। কিন্তু ইভোনি ইনগ্রিডের বোন, টাকা ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাবটা শুনলে খুব বিরক্ত হবে।

(2,1) -141- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:53

কাজেই কিছু না বলল না সাইমন, মাথা দুলিয়ে সায় দিল শুধু। ব্যাংকে ঢুকে গেল ইভোনি। সেই ফাঁকে এখন পর্যন্ত যা যা জানতে পেরেছে, সব কর্নেলিয়াসকে জানাল সাইমন।

'সব তো দেখছি জট পাকিয়ে গেছে ভীষণ,' সাইমনের কথা শেষ হতে মন্তব্য করল সে।

'হ্যাঁ। আচ্ছা, আমাদেরকে তুমি সাহায্য করেছিলে কেন, কর্নেলিয়াস?'

'সাহায্য করব না কেন?'

'আমি ইয়ার্কি করছি না।'

'আমিও করছি না। বাস্তবজীবনে হরহামেশা নায়ক হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই এই সুযোগটা পায়ে হেঁটে হাজির হলে লুফে নিতে হয়।' খুব মামুলি কথা বলেছে যেন, এমন ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেলিয়াস।

'ধন্যবাদ।'

'তাছাড়া, ইনগ্রিড আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছিল।'

'ও জ্ঞান ফিরে পেলে তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ, তা ওকে জানাব। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

'কোনো আপত্তি নেই,' খুশি খুশি গলায় বলল কর্নেলিয়াস। 'তোমাকে যে পিস্তলটা দিয়েছিলাম, ওটা এখনো আছে সাথে?'

'আছে। কেন, দরকার হতে পারে নাকি?'

'কখন কী ঘটে কে জানে! তবে দরকার হবে বলে মনে হয় না। তবু, সাবধানের মার নেই।'

'মানে?'

'মানে, সঙ্গে হাজার ডলার থাকলে নিরস্ত্র হয়ে চলাফেরা করা যাবে না।'

'বুঝলাম।'

'আরেকটা ব্যাপার,' কর্নেলিয়াস বলল।

'কী?'

'সিনেমায় যেমন দেখায়, নায়কের কালো বন্ধুটা শেষতক পটল তোলে, আমাকেও ওভাবে মরতে দিয়ো না। ব্যাপারটা আমার পছন্দ না।'

খলখল করে হেসে উঠল সাইমন। মনে হলো, গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম হেসেছে যেন।

কর্নেলিয়াসের ফোন বেজে উঠল, তাই একপাশে সরে গেল সে। এই সময় ইভোনি বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে, হাতে টাকা। 'নয় হাজার ছয়শো পাঁচ ডলার তুলেছি।'

'এত হিসাবনিকাশ করে তুললে কেন?'

'যাতে টাকার পরিমাণটা একেবারে তোমার সমান না হয়। আরো একটা কারণ আছে। ছয়শো আর পাঁচ। ছয়, পাঁচ। জুনের পাঁচ। তারিখটা মনে আছে তোমার?'

মনে আছে সাইমনের। ওর ধর্মপুত্র ড্রু-ইভোনির বড় ছেলে-জন্মেছিল এই দিনে।

'ভাবলাম এতে হয়তো ভাগ্যের সাহায্য পেতে পারি,' বলল ইভোনি।

কর্নেলিয়াস ফিরে এল। 'রোকো ফোন করেছিল।'

'কী খবর?' জানতে চাইল সাইমন।

'ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে আমার বাসায় হাজির হবে ও। লুথারকে খুঁজে বের করতে হবে ওকে।'

কর্নেলিয়াস হাসপাতালের বাইরে দাঁড়াল। সাইমন আর ইভোনি গেল ইনগ্রিডের রুমে। স্যামকে নিয়ে তিনজনে এক ঘণ্টারও ওপরে বসে রইল বিছানার পাশে। অপেক্ষা করছে, কখন খবর আসে রোকোর কাছ থেকে। নার্সদের শিফট বদলালে নতুন একজন নার্স এসে ঢুকল রুমে। এসেই সে বলল, 'একসাথে শুধু দুজন লোক থাকতে দেয়ার নিয়ম আছে রুমে। আপনারা একটু অদলবদল করে থাকলে হয় না? একজন ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করলেন নাহয়?'

স্যাম উঠে দাঁড়াল। 'আমিই যাই, একটু পড়াশোনা করা দরকার।'

'তোমার আসলে কলেজে ফিরে যাওয়া উচিত,' সাইমন বলল। 'তোমার মা-ও তা-ই চাইত।'

'হয়তো,' সায় দিল স্যাম। 'কিন্তু আমি তা চাই না। এখানে থাকতে চাই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ইভোনি বলল, 'ছেলেটা আর সবার মতো না।'

'হ্যাঁ।' খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল সাইমন, তারপর বলল, 'পেইজের এক প্রফেসরের সাথে কথা হলো আজ।'

'তা-ই নাকি?'

'তার ধারণা, পেইজ ক্যাম্পাসে ধর্ষিত হয়ে থাকতে পারে।'

কিছু বলল না ইভোনি। নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল বোনের বিছানার দিকে।

'আমার কথা শুনেছ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি, সাইমন।'

কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সাইমন। 'দাঁড়াও, তুমি জানতে?'

'আমি ওর ধর্ম-মা। ও...ও আমাকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলত।'

সাইমন টের পেল, লালচে হয়ে গেছে ওর চেহারা। 'আর তুমি আমাকে জানানোরও দরকার মনে করোনি?'

'ও আমাকে কিরে কাটিয়ে নিয়েছিল, যাতে না বলি।'

'ড্রু যদি খুব বড় কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আমার কাছে আসে, আর বলে দেয় তোমাকে না জানাতে...'

'আমি আশা করব, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখবে,' ইভোনি বলল। 'আমার বিশ্বাস থাকবে যে, তোমাকে ড্রু-র ধর্মবাপ হিসেবে বেছে নিয়েছি যাতে আমার বা রবার্টের সাথে যেসব কথা বলতে পারবে না, সেসব যেন তোমার সাথে বলতে পারে।'

এই মুহূর্তে এসব নিয়ে তর্ক করার মানে হয় না। তাই সে চেষ্টা করল না সাইমন। জানতে চাইল, 'তো কী ঘটেছিল?'

'প্রাইভেট কাউন্সেলিঙের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম পেইজকে।'

'না, মানে, ধর্ষকের ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম আরকি।'

'অনেক লম্বা কাহিনি।'

'এখনো এসব বলছ, ইভোনি!'

'সব খুঁটিনাটি মনে করতে অসুবিধে হচ্ছিল পেইজের। ছেলেটা হয়তো ওকে কিছু খাইয়েছিল, ঠিক জানি না। ঘটনাটা অনেকদিন রিপোর্ট করেনি ও। সেজন্যে রেপ কিট ব্যবহার করেও কাজ হয়নি। থেরাপিতে ওর উপকার হচ্ছিল বোধহয়। ধীরে ধীরে পুরো ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করছিল ও।'

'বেজন্মাটার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলে কেমন হয়?'

'বুদ্ধিটা আমিও দিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু ও প্রস্তুত ছিল না। ঘটনাটার কোনো স্মৃতি ছিল না পেইজের। ওর সম্মতি নিয়েছিল কি নেয়নি, তা-ও বলতে পারছিল না।' সাইমনের পরবর্তী প্রশ্ন থামিয়ে দেবার জন্যে হাত তুলল ইভোনি। 'ব্যাপারটা বড় গোলমেলে, সাইমন।'

মাথা নাড়ল সাইমন। 'আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার।'

'পেইজকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম তোমাকে জানানোর জন্যে। সত্যিই অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিলাম। কিন্তু এক পর্যায়ে আমার সাথেও কথা বলা বন্ধ করে দেয় ও। বলেছিল, ও নাকি ঠিক হয়ে গেছে, ব্যাপারটার ফয়সালা হয়েছে। আমার ফোন ধরা বন্ধ করে দেয় পেইজ। ওই অ্যারন লোকটার সাথে মেলামেশা আরম্ভ করে...'

'আর ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন রাখলে তুমি? এভাবে বদলে যাচ্ছিল ও, তবু আমাকে কিচ্ছু জানাওনি।'

'আমি কক্ষনো কিছু বলিনি...তোমাকে।'

ইভোনির কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। 'ইনগ্রিড?'

ওদের পেছনে, দরজায় টোকা পড়ল। সেদিকে ঘুরল সাইমন। দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কর্নেলিয়াস।

'চলো,' বলল সে, 'রোকো অপেক্ষা করছে।'

৩৬

ক্রস ব্রঙ্কসগামী মেজর ডিগ্যান এক্সপ্রেসওয়ে ধরে গাড়ি ছুটিয়েছে অ্যাশ।

'ধরে নিতে হবে, চোদ্দ ছেলেই নিজেদের ডিএনএ পাঠাতে যাচ্ছে ওই জিনিয়ালোজি সাইটগুলোতে,' বলল সে।

ফোন দেখতে দেখতে মাথা দুলিয়ে সায় জানাল ডিডি।

'বেশ, তারপর কী?'

'ট্রুথ এই সপ্তাটাও টিকবে না। আইনি ব্যাপারস্যাপার ভালো বুঝি না আমি, কিন্তু তার বিষয়-সম্পত্তি একবার উইলে ঢুকে পড়লে পরে সেসবের ওপর দাবি-দাওয়া খাটানো খুব কঠিন কাজ।'

'তবু,' অ্যাশ বলল, 'কেউ-না-কেউ ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবেই।'

'কীভাবে?'

'ট্রুথের আরেক ছেলে সাইটে নিজের ডিএনএ দিল।'

'বেশ।'

'সে দেখল তার আরো তিন-চারজন সৎ ভাই আছে–এবং তারা সবাই মারা গেছে।'

'ঠিক। একজন ডাকাতির সময় গুলি খেয়ে মরেছে। আত্মহত্যা করেছে আরেকজন। একজন নিখোঁজ, বাড়ি থেকে পালিয়েছে খুব সম্ভব। একজন বোধহয় কোনো নেশাখোর ভবঘুরের ছুরি খেয়ে মরবে। সবগুলোই কাকতালীয় ঘটনা। অবশ্য সে যদি মৃত্যুগুলোর খোঁজ পেয়ে যায়, তবেই ওগুলো কাকতালীয় মনে হবে তার কাছে। অত সহজে কিছু বুঝবে না। মৃত্যুর পরও ওদের অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ থাকে। কাজেই যেকোনো নতুন ছেলে উদয় হলে সে তার মরা সৎ ভাইদের ইমেইল করবে। ওরা জবাব দেবে না। সে সম্ভবত ওখানেই হাল ছেড়ে দেবে। আর সে যদি কোনোভাবে সবাইকে খুঁজে বেরও করে ফেলে এবং যোগসূত্রটা টেরও পেয়ে যায়, তারপর নানান স্টেট থেকে পুলিশকে কাজে লাগায়, কী পাবে তারা?'

‘কিছু না,’ জবাব দিল অ্যাশ।

‘ঠিক। কাজেই...ওহ, একটু দাঁড়াও।’

‘কী হয়েছে?’

‘টেক্সট এসেছে, সাইমন গ্রিনের কাছ থেকে।’ তারপর গলা চড়িয়ে মেসেজটা পড়ে শোনাল সে:

প্রথম যেখানে আমাদের দেখা হয়েছিল, সেখানে, কর্নেলিয়াসের অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছি। নতুন সূত্র পেতে পারি। আপনার কাজ কেমন চলছে?

‘এই কর্নেলিয়াসটা কে হতে পারো বলো তো?’ জানতে চাইল অ্যাশ।

‘জানি না।’

‘ব্যাপার ভালো ঠেকছে না।’

‘কোনো সমস্যা হবে না।’

‘মাদার অ্যাডিওনার ব্যাপারটা কী?’ জিজ্ঞেস করল অ্যাশ।

‘জানি না।’

‘তোমাকে বিশ্বাস করতে মানা করেছে সে।’

‘কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, অ্যাশ।’

‘হ্যাঁ, করি।’

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। ‘তার ব্যাপারে আমরা পরে চিন্তা করতে পারব, কেমন?’

ব্রঙ্কসের মট হেইভেন অংশে কয়েকটা কংক্রিটের ব্যারিয়ারের সামনে একটা জায়গা পেল ওরা। দুজনের সঙ্গেই পিস্তল আছে। ছুরিও আছে। এবারের ঘটনাটাকে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু দেখাতে হবে, ভাবল অ্যাশ। এরকম ঘটনা এসব রাস্তায় নেশাখোরদের মাঝে প্রচুর ঘটে।

দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় মেয়েটা ডাকল, ‘অ্যাশ?’

গলার স্বর শুনে থমকে গেল সে। মেয়েটার দিকে ফিরে চাইল। চিবুক উঁচিয়ে সামনের দিকে ইশারা করল ডিডি। ফোন বের করে, পিপিজি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া ছবিটার স্ক্রিনশট দেখাল সঙ্গীকে।

‘এই লোকটাই তো, তাই না?’ নিচু গলায় বলল সে।

তীক্ষ্ণ চোখে দেখল অ্যাশ। কোনো সন্দেহ নেই। বিল্ডিংটায় ঢুকছে সাইমন গ্রিন।

‘সঙ্গে ওটা কে?’

‘অনুমান করব? কর্নেলিয়াস।’

মাথা দোলাল ডিডি। ‘ছুরি মেরে কাজ সারা যাবে না বোধহয়, অ্যাশ।’

‘হুঁ।’

ব্যাকসিটে রাখা অস্ত্রগুলোর দেখল মেয়েটা। ‘গুলি করে গণহত্যার করার চেয়েও বেশি কিছু হতে যাচ্ছে বোধহয় ব্যাপারটা।’

***

রোকোকে যতবার দেখে ততবারই অভিভূত হয়ে পড়ে সবাই, এমনই দৈত্যাকার লোক সে। কর্নেলিয়াসের অ্যাপার্টমেন্টের বইয়ের শেল্ফগুলোর ওপর নজর বোলাচ্ছে সে। 'তুমি এসব পড়, কর্নেলিয়াস?'

'হ্যাঁ, পড়েছি। তোমারও পড়ে দেখা উচিত। বই পড়লে কোমল অনুভূতি বাড়ে।'

'সত্যি?' একটা বই বের করে কয়েক পাতা উল্টাল রোকো। 'তোমার কাছে পঞ্চাশ হাজার ডলার হবে, মি. গ্রিন?'

'আমার মেয়ে আছে তোমার কাছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সাইমন।

'না।'

'তাহলে পঞ্চাশ হাজার ডলার নেই আমার কাছে।'

'লুথার কোথায়?' কর্নেলিয়াস প্রশ্ন করল এবার।

'মাথা ঠান্ডা করো, কর্নেলিয়াস। কাছেপিঠেই আছে।' ফোন হাতে নিল রোকো। 'লুথার?'

একটা কণ্ঠ ভেসে এল ফোনের ছোট্ট স্পিকার থেকে। 'এই তো চলে এসেছি, রোকো।'

'এসো না,' রোকো বলল। 'আমাদের বন্ধুর কাছে টাকা নেই।'

'আছে,' সাইমন বলল। 'পঞ্চাশ হাজার ডলার আনিনি, তবে আমার মেয়েকে খুঁজে বের করার মতো দরকারি তথ্য দিতে পারলে পঞ্চাশই পাবে। কথা দিলাম।'

'কথা দিলে?' ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল রোকো। 'তোমাকে বিশ্বাস করব কেন বলো তো? সাদা লোকেরা আমাদের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে?'

'না,' জবাব দিল সাইমন।

'তাহলে কেন?'

'কারণ আমি ওর বাপ।'

'ও,' সুর করে বলল রোকো। 'তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে তোমার?'

সাইমন কিছু বলল না।

'এখন কেবল একটা জিনিসই আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে। টাকা। নগদ টাকা।'

ব্যাংক থেকে তুলে আনা টাকাটা কফি টেবিলের ওপর ফেলে দিল সাইমন। 'প্রায় দশ হাজার আছে এখানে।'

'এত কমে চলবে না।'

'এত অল্প সময়ে এর বেশি জোগাড় করতে পারিনি।'

'তাহলে বিদায়।'

কর্নেলিয়াস নাক গলাল এবার। 'গোঁ ধরে বসে থেকো না, রোকো।'

'আরো চাই আমার।'

'পাবে,' বলল সাইমন।

গাঁইগুঁই করতে লাগল রোকো, অথচ কফি টেবিলে ফেলে রাখা টাকাটাও হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে, সুন্দরী নারীর মতো। 'তাহলে ব্যাপারটা হলো: তোমাকে একটা তথ্য দেব আমি। তথ্যটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এরপর আমার ছেলে লুথারকে...লুথার, লাইনে আছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব এল ফোন থেকে।

'ঠিক আছে, ওখানেই থাকো।' দাঁত বের করে হাসল রোকো। 'যাকগে, আমার কথা শেষ হলে লুথারকে এখানে আসতে বলব। খুব দামি একটা তথ্য দেবে ও।'

'বলে ফেলো, শুনছি আমরা,' কর্নেলিয়াস বলল।

টাকার বান্ডিলটা তুলে নিল রোকো। 'নিশ্চিত খবর পেয়েছি, পেইজকে দেখা গেছে।'

বুকটা ধড়াস করে উঠল সাইমনের। 'কখন?'

টাকা গুনতে আরম্ভ করেছে রোকো। 'ওর বয়ফ্রেন্ড দামড়াটা খুন হওয়ার দুদিন পর। তোমার মেয়ে বোধহয় কিছুক্ষণ আশেপাশেই ছিল। লুকিয়ে ছিল হয়তো, জানি না। তারপর ও ছয় নম্বরে ওঠে।' ছয় নম্বর, ভাবল সাইমন, সবচেয়ে কাছের সাবওয়ে স্টপেজ।

'একজন বেশ নিশ্চিত এ ব্যাপারে,' বলল রোকো, এখনো টাকা গুনছে। 'একশোভাগ নিশ্চিত হতে পারেনি। তবে প্রায় নিশ্চিত। আমার অন্য ছেলেটা অবশ্য নিশ্চিত, তোমার মেয়েকে দেখেছে ও। কোনো সন্দেহ নেই।'

'কোথায়?' জানতে চাইল সাইমন।

গোনা শেষ করল রোকো, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'দশ হাজারের কম আছে।'

'কাল আরো দশ দেব। পেইজকে কোথায় দেখেছে ও?'

কর্নেলিয়াসের দিকে তাকাল রোকো। মাথা দোলাল সে।

'পোর্ট অথরিটি।'

'বাস টার্মিনালে?'

'হ্যাঁ।'

'ও কোথায় যাচ্ছিল, সে ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে?'

'বলব, মি. গ্রিন। লুথার...লুথার বলবে বাকিটা। তৈরি হও, কেমন? পঞ্চাশ হাজার। এক পয়সাও কম না। কেন, জানো? কারণ লুথারের কথা শোনার পর টাকাটা তুমি নিজে থেকেই দেবে, আমাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল সাইমন আর রোকো। স্পষ্ট বুঝতে পারছে সাইমন, সত্যি কথাই বলছে দৈত্য। লুথারের কাছে যে তথ্যই থাকুক না কেন, সেটা মহামূল্যবান।

'তবে তার আগে, তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিই। বাফেলো। তোমার মেয়ে–বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি–বাফেলো যাওয়ার বাসে উঠেছিল।'

বাফেলোতে ওর মেয়ের পরিচিত কেউ আছে কি না ভাবতে লাগল সাইমন। ওরকম কারো কথা মনে পড়ছে না। অবশ্য বাফেলো পৌঁছার আগে যেকোনো জায়গায় নেমে পড়তে পারে পেইজ। তবু ওই পথে পরিচিত কারো কথা মনে করতে পারল না সাইমন।

'লুথার?'

'বলো, রোকো।'

'চলে এসো।'

ফোন কেটে দিল রোকো। তারপর কর্নেলিয়াসের দিকে ফিরে হাসল। 'তুমিই, তাই না, কর্নেলিয়াস?'

কর্নেলিয়াস কিছু বলল না।

'তুমিই গুলি করেছিলে লুথারকে।'

কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল কর্নেলিয়াস। হেসে উঠে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল রোকো। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। ওকে বলতে যাচ্ছি না আমি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো–অকারণে গুলি করেনি ও।'

'কারণটা কী?' জানতে চাইল সাইমন।

দরজার দিকে হাঁটা ধরল রোকো। 'আত্মরক্ষা।'

'কী সব ফালতু বকছ? আমি ওকে গুলি করতে যাচ্ছিলাম না...'

'তুমি না।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল সাইমন।

'মাথা খাটাও। লুথার তোমাকে গুলি করেনি, করেছিল তোমার বউকে।'

মিষ্টি হেসে দরজার নবে হাত রাখল রোকো।

পরক্ষণেই কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল একসঙ্গে।

করিডর থেকে চেঁচিয়ে উঠল লুথার: 'রোকো, সাবধান!'

প্রবৃত্তির বশে দড়াম করে দরজা খুলে ফেলল রোকো।

ঠিক পরমহূর্তেই শুরু হলো বুলেট-বৃষ্টি।

(2,1) -145- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:54

৩৭

পাঁচ মিনিট আগের কথা। গ্রাফিতি আঁকা দরজাটা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল অ্যাশ।

ক্ষীণভাবে আলোকিত হলঘরে প্রথমে সে ঢুকল, ওর পিছু নিয়ে ঢুকল ডিডি। অস্ত্রগুলো এখনো হাতে নেয়নি। তবে হাতের কাছেই রেখেছে ওগুলো, যাতে দরকারে মুহূর্তের নোটিসে বের করে আনতে পারে।

'সাইমন গ্রিন এখানে আসবে কেন?' ফিসফিসিয়ে বলল অ্যাশ।

'মেয়েকে দেখতে বোধহয়।'

'তাহলে ইলেনা রেমিরেজকে পাঠানো টেক্সটে সে কথা জানায়নি কেন? আর এই কর্নেলিয়াস ব্যাটার সাথেই বা এত কথা কীসের?'

দুর্বল সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল ডি। 'কানি না।'

'ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের,' অ্যাশ বলল। 'আরো খোঁজখবর নিয়ে তারপর আসব।'

'তুমি তাহলে ফিরে যাও।'

'ডি।'

'না, অ্যাশ, আমার কথা শোনো। ইলেনা রেমিরেজ আর সাইমন গ্রিন হলো ক্যান্সার। ক্যান্সারটাকে এখুনি কেটে ফেলতে হবে, নইলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তুমি আরো সতর্ক হয়ে আসতে চাও? বেশ, গাড়িতে ফিরে যাও। এদেরকে সামলানোর মতো যথেষ্ট অস্ত্র আছে আমার কাছে।'

'তা হবে না,' অ্যাশ বলল। 'তুমিও জানো। তুমি হলে আমাকে একা ফেলে চলে যেতে? যেতে না।'

'তা ঠিক।'

'এই জায়গাটা আমাকে কীসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে জানো?' নাক কুঁচকে বলল অ্যাশ।

(1,1) -146- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:54

মাথা ঝাঁকাল ডিডি। 'মি. মার্শালের চোলাইখানার কথা। বাতাসে বাসি বিয়ারের গন্ধ।'

চোলাইঘরটার কথা ওর মনে আছে দেখে আমোদ পেল অ্যাশ। জোজো মার্শাল ছিল অ্যাশের পালক বাপদের একজন। অ্যাশকে চোলাইঘরে কাজ করাত সে। ডিডি ওখানে কয়েকবার গিয়েছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। ওখানকার মদের দুর্গন্ধ দেখা যাচ্ছে আজও ভোলেনি ও।

সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল মেয়েটা। তাড়াহুড়ো করে এককেবারে দুটো করে টপকাতে লাগল অ্যাশ, যাতে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটা শরীর দিয়ে পথ আটকে দিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হানল ওর দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কারো দেখা পেল না ওরা। দূরে কে যেন চড়া ভলিউমে টিভি চালাচ্ছে, তার গুঞ্জন এসে ঢুকছে কানে।

এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও।

ওপরে উঠতে উঠতে দোতলার করিডরে চোখ বোলাল অ্যাশ।

কেউ নেই। খুব ভালো।

তিনতলায় উঠে ওর দিকে ফিরে তাকাল ডিডি। মাথা দোলাল অ্যাশ। বন্দুক বেরিয়ে এল দুজনের হাতে। অস্ত্রগুলো শরীরের পাশে ধরে রেখেছে, কেউ এই মুহূর্তে দরজা খুললেও ওদের হাতের এফএন ৫.৭৫ দেখতে পাবে না।

অ্যাপার্টমেন্ট বি-এর সামনে হাজির হলো ওরা। ভারী ধাতব দরজায় টোকা দিল অ্যাশ।

প্রস্তুত ওরা।

কোনো সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল সে। সাড়া নেই।

'কারো-না-কারো তো বাড়িতে থাকার কথা,' ফিসফিস করল ডিডি। 'গ্রিনকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছি আমরা।'

ভারী ধাতব দরজাটা একবার দেখল অ্যাশ। কোনো সন্দেহ নেই, জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্যেই লাগানো হয়েছে দরজাটা। কিন্তু কাজটা করেছে বোকার মতো। দরজাটা ইস্পাতের তৈরি, কিন্তু ওটার ফ্রেম কাঠের।

কাঠটাও খুব শক্ত নয়।

বন্দুক বাগিয়ে ধরে, ডিডির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাশ। পা তুলে দরজার খিলটা যেখানে কাঠের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেখানে লাথি হাঁকাল।

এক লাথিতেই মট করে পাটকাঠির মতো ভেঙে গেল কাঠ।

হাট হয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল অ্যাশ আর ডিডি।

কেউ নেই।

দুটো মাদুর বিছানো মেঝের দুপাশে। মেঝেতে শুকনো রক্তের দাগ। চকিতে একবার পুরো ঘরটার ওপর চোখ বোলাল অ্যাশ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল কোথাও একটা গুরুতর ভজকট পাকিয়ে গেছে। মেঝের দিকে তাকাল সে আবার। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

'কী হয়েছে?' ফিসফিসিয়ে বলল ডিডি।

'হলুদ টেপ।'

'কী?'

'এটা ক্রাইম সিন ছিল।'

'মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।'

অনতিদূরে একটা দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

ঝড়ের বেগে নড়ল ডিডি। হাতের অস্ত্র মেঝেতে ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, তারপর দরজা বন্ধ করে দিল পেছনে। একটা লোক বের হয়েছে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। লোকটার কানে ইয়ারবাড লাগানো, এত জোরে গান বাজছে যে পনেরো ফুট দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছে ডিডি।

সিঁড়ির কাছে চলে গেছে লোকটা, মাথা নুইয়ে নিচে নামতে শুরু করবে, এখনো মেয়েটাকে দেখতে পায়নি। জায়গায় জমে গেছে ডিডি। মনে আশা, লোকটা পিছু ফিরে তাকাবে না।

কিন্তু তাকাল।

ওকে দেখেই কান থেকে ইয়ারবাড খুলে ফেলল লোকটা।

তার উদ্দেশে ওর সেই ভুবন-ভোলানো হাসিটা দিল ডিডি।

'হ্যালো,' মুখে হাসি ধরে রেখেই বলল ও, 'কর্নেলিয়াসকে খুঁজছি আমি।'

'ভুল ফ্লোরে এসেছেন।'

'ওহ, তা-ই বুঝি?'

'কর্নেলিয়াস দোতলায় থাকে। অ্যাপার্টমেন্ট বি।'

'ওহ, কী বোকা আমি!'

লোকটার ভাব দেখে মনে হলো, ডিডির দিকে হাঁটা ধরবে। প্যান্টের পেছনের পকেটে হাট গলিয়ে দিল মেয়েটা। সুইচব্লেডটার স্পর্শ পেল ওর আঙুল। লোকটার গলা ফাঁক করে দিতে হবে ওকে। জলদি, নিঃশব্দে।

শেষ একটা চেষ্টা করল ডিডি। লোকটার উদ্দেশে হাত নেড়ে বলল: 'ধন্যবাদ।'

লোকটার ভাব দেখে মনে হলো চলেই আসবে বুঝি মেয়েটার কাছে। কিন্তু পরমুহূর্তে কী ভেবে যেন মুচকি হেসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। কান পেতে শুনতে লাগল ডিডি, দোতলার কোথাও ব্যাটা থেমে যায় কি না কর্নেলিয়াসকে সতর্ক করে দিতে। কিন্তু তেমন কিছু হলো না, টানা সিঁড়ি ভেঙে নিচতলায় নেমে, গ্রাফিতি আঁকা দরজা টেনে লোকটার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল সে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওর।

লোকটা চলে যেতেই অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে বেরিয়ে এল অ্যাশ, ডিডির হাতে ওর বন্দুকটা গুঁজে দিল। দরজার আড়াল থেকে পুরো কথোপকথন শুনেছে সে। নীরবে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় নেমে, অ্যাপার্টমেন্ট বি-র সামনে হাজির হলো দুজনে। দরজায় কান পাতল অ্যাশ।

কণ্ঠস্বর। কয়েকটা।

ইশারা করল অ্যাশ। বন্দুক হাতে তৈরি হলো ওরা। সহজ প্ল্যান। বন্দুক হাতে ছিটকে ভেতরে ঢুকে গুলি-বৃষ্টি শুরু করবে। ভেতরে যাকে পাবে, তাকেই খুন করবে।

দরজার তালার দিকে বন্দুক ধরল সে গুলি মেরে উড়িয়ে দেবার জন্যে। চোর-পুলিশ খেলার কোনো দরকার নেই। কিন্তু আচমকা দুটো ব্যাপার ঘটে গেল একসঙ্গে।

ঘুরতে শুরু করল দরজার নব।

এবং সেই একই মুহূর্তে করিডর থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা লোক: ‘রোকো, সাবধান!’

***

‘রোকো, সাবধান!’

রোকো দরজা খোলার সাথে সাথে গুলির আওয়াজ ঢুকল সাইমনের কানে।

মহাবিপদের সময় নাকি সময় খুব ধীরে চলে। সিনেমায় তো নায়ক বুলেটেকে ধীরগতিতে আসতে দেখে ওটাকে ফাঁকিই দিয়ে ফেলে। কিন্তু এসবই মিছে।

গুলির আওয়াজের পিছু পিছু আরেকটা চিৎকার শুনতে পেল সাইমন। লুথারের গলা।

হাট করে দরজা খুলে ফেলেছে রোকো।

ওর কয়েক ফুট পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সাইমন। দৈত্যের মতো বিশাল লোকটার চওড়া কাঁধ ওর দৃষ্টি আটকে দিয়েছে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু বুলেটের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে।

ভীষণভাবে কেঁপে উঠল রোকোর বিশাল দেহ। ঝাঁকি খেয়ে টলে উঠল সে, কোনো ভয়ঙ্কর নাচের মুদ্রা দেখাচ্ছে যেন। টলতে টলতে কয়েক কদম পিছিয়ে এল লোকটা।

আরো বুলেট ঢুকল ওর দেহে।

দৈত্যের মতো লোকটা শেষতক যখন চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল, কেঁপে উঠল গোটা বিল্ডিং। সিলিঙের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে রোকো নিষ্প্রাণ, খোলা দুই চোখ। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওর বুক থেকে।

এবার দরজা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সাইমন, সামনে কোনো বাধা নেই।

দুজন মানুষ।

তিরিশ বছর বয়েসি এক লোক ঘুরে আছে বাম দিকে, করিডরের দিকে গুলি ওগরাচ্ছে তার অস্ত্র। খুব সম্ভব লুথারকে গুলি করছে লোকটা। লুথারের গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না আর। আরেকটা লালচুলো মেয়ে–বয়েস বোধহয় লোকটার চেয়ে কয়েক বছর কম–গুলি করছিল রোকোকে। মাথার চুলগুলো খাটো করে ছাঁটা। আরো দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিল সে রোকোর মাথায়।

তারপর বন্দুক ঘোরাল কর্নেলিয়াসের দিকে।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সাইমন: ‘না!’

কর্নেলিয়াস ততক্ষণে নড়তে শুরু করেছে, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত নয় ওর নড়াচড়া। মেয়েটা বড্ড কাছে, বড় বেশি সহজ লক্ষ্য পেয়ে গেছে।

কিছুতেই গুলি ফস্কাবে না তার।

মেয়েটার দিকে দৌড় দিল সাইমন। চেষ্টা করছে গুলি করার আগেই তার কাছে পৌঁছতে। চেঁচাচ্ছে সে গলা ফাটিয়ে। মনে আশা, মেয়েটার মনোযোগ সরাতে পারবে, মূল্যবান একটা সেকেন্ড সময় পাইয়ে দিতে পারবে কর্নেলিয়াসকে।

মেয়েটার আঙুল যখন ট্রিগারে চেপে বসছে, সেই মুহূর্তে দরজার কাছে পৌঁছল সাইমন। গায়ের জোরে দরজায় ধাক্কা মারল ও। দরজার প্রান্ত গিয়ে বাড়ি মারল মেয়েটার কব্জির কাছে। নিশানা ফস্কানোর জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

ইতস্তত করার মতো সময় নেই হাতে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সাইমন। সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই দরজার দিকে হাত বাড়াল সে মেয়েটার কব্জি চেপে ধরবে বলে। আততায়ীর চামড়ার ছোঁয়া পেল ওর আঙুল–হাতের একটা অংশ বোধহয়। হাতের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসতে লাগল সাইমনের আঙুল। প্রায় ধরে ফেলেছিল মেয়েটাকে, কিন্তু তখনই কেউ একজন–মেয়েটার সঙ্গী বোধহয়–এসে ধাক্কা মারল দরজার অপর প্রান্তে।

দরজাটা সজোরে এসে বাড়ি মারল সাইমনের মুখে। বাড়ি খেয়ে একপাক ঘুরে গেল সে।

টলতে টলতে রোকোর মৃতদেহের ওপর গিয়ে পড়ল সাইমন।

ঘরের ভেতর পা রাখল যুবতী। বন্দুক তাক করল কর্নেলিয়াসের দিকে। ফায়ার এস্কেপের জানালার দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে পকেট থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করছিল কর্নেলিয়াস।

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে ওর।

কোনো সুযোগই পাবে না সে।

নিয়তিকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সাইমন। বাঁচার কোনো আশা নেই ওর আর কর্নেলিয়াসের।

কোনো উপায় নেই।

নিরুপায় হয়ে পড়েছে সাইমন।

শুয়ে থেকেই দরজায় লাথি হাঁকাল সে, যাতে যুবতীর মুখের ওপর বন্ধ হয় ওটা। অনায়াসে পা দিয়ে দরজাটা ঠেকিয়ে দিল মেয়েটা। তাকে থামানোর পক্ষে চেষ্টাটা বড় বেশি দুর্বল।

তবে এতে খানিকটা সময় পেল সাইমন।

হত্যাকাণ্ড থামাবার মতো সময়টা যথেষ্ট নয়।

কিন্তু কর্নেলিয়াসের দিকে ঝাঁপ দেয়ার মতো সময় পেল সাইমন।

ওর কাজে অবাক হয়ে গেল যুবতী। সে আশা করেছিল, তার দিকে আসবে সাইমন। কিন্তু তার হিসেব উল্টে দিয়ে লোকটা গেছে অন্যদিকে। এতে তো ও বাঁচবে না। সত্যি বলতে কী, সম্পূর্ণ উল্টোদিকে গেছে সাইমন। ফলে ওকে একেবারে বন্দুকের নিশানার মধ্যে পাবে মেয়েটা।

যুবতীর বুলেট আর কর্নেলিয়াসের মাঝখানে একমাত্র বাধা সাইমনের শরীর।

সেই বাধাকে থোড়াই কেয়ার করে গুলি করল যুবতী।

শরীরে বাম পাশে বুলেট ঢোকার অসহ্য ব্যথা অনুভব করল সাইমন। ওর মনে হলো, শরীরের ওই অংশে কেউ যেন গরম লোহা দিয়ে ছ্যাঁক দিয়েছে।

তবু থামল না সাইমন।

আরেকটা বুলেট ঢুকে গেল ওর ডান কাঁধে।

প্রায় উড়ে গিয়ে বন্ধুর ওপর পড়ল সাইমন। কর্নেলিয়াসের কোমর জড়িয়ে ধরল দু-হাতে। তাকে জড়িয়ে ধরেই ছুটল জানালার দিকে।

কর্নেলিয়াসের জন্যেও বোধহয় সময় ধীর হয়ে গেছে। স্বাভাবিক গতিজড়তা থামানোর চেষ্টা করল না সে। সাইমনের সাথে ছুটল সে-ও, কাছে পৌঁছে পিঠ ঘুরিয়ে দিল জানালার দিকে। এই ফাঁকে পিস্তলটা বের করে এনেছে পকেট থেকে।

পিঠ দিয়ে জানালায় ধাক্কা মারল ওরা। দুজনের মিলিত ধাক্কায় ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল জানালা।

পিস্তলটা হাতে উঠে এসেছে কর্নেলিয়াসের। ওদের পতন শুরু হতেই সাইমনের কাঁধের ওপর হাত রেখে গুলি করল সে।

গোলাগুলির কানফাটানো শব্দের মধ্যেই একটা লোকের গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ শুনতে পেল সাইমন, পরক্ষণেই একটা নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার: ‘অ্যাশ!’

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেই ধপাস করে ফায়ার এস্কেপের ঝাঁঝরির ওপর পড়ল কর্নেলিয়াস আর সাইমন। কর্নেলিয়াস পড়ল চিত হয়ে, সাইমন ওর ওপর।

পতনের ধাক্কায় পিস্তলটা ছুটে গেছে কর্নেলিয়াসের হাত থেকে। নিচের পিচের দিকে সবেগে ধেয়ে যেতে দেখল সাইমন অস্ত্রটাকে।

ফের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা: 'অ্যাশ! না!'

এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল সাইমনের চোখ। তামাটে স্বাদের কিছুতে ভরে গেছে মুখ। বুঝতে পারল, রক্ত। প্রাণপণ চেষ্টায় সরে গেল সে কর্নেলিয়াসের ওপর থেকে। কথা বলার চেষ্টা করল ও। বন্ধুকে উঠে দৌড়াতে বলতে চাইছে। বলতে চাইছে, লালচুলো মেয়েটা গুলি খায়নি, অক্ষতই আছে, যেকোনো মুহূর্তে এসে পড়বে।

কিন্তু রা বেরোচ্ছে না ওর গলা থেকে।

কর্নেলিয়াসের দিকে তাকাল সে। মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

যাবে না সে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে–রোকোর দরজার নব ঘোরানো থেকে এই পর্যন্ত–সময় লেগেছে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম।

ঘরের ভেতরে, আদিম গর্জন বেরোল যুবতীর গলা চিড়ে।

বুঝতে পারল সাইমন, ওদের জন্যে আসছে মেয়েটা।

'যাও,' কর্নেলিয়াসকে বলার চেষ্টা করল সে।

যেতে রাজি না কর্নেলিয়াস।

জানলায় পৌঁছতে দেখল সাইমন লালচুলো মেয়েটাকে। হাতে পিস্তল।

এবারও নিরুপায় সে।

যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল শরীরে, সেটুকু ব্যবহার করে ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিল সে কর্নেলিয়াসকে।

সিঁড়ি বেয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নামতে লাগল লোকটা। দেখে মনে হচ্ছে ডিগবাজি খাচ্ছে যেন।

লোকটা ব্যথা পেতে পারে, ভাবল সাইমন। কয়েকটা হাড়ও ভেঙে যাবে বোধহয়।

কিন্তু প্রাণটাও বেঁচে যেতে পারে।

এখন আর কিছু বাকি নেই, জানে সাইমন। শুনতে পাচ্ছে, এগিয়ে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। কিন্তু ওরা আসতে আসতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। চিত হয়ে শুয়ে যুবতীর সবুজ চোখে চোখ রাখল সে। মনের গভীরে হয়তো আশা ছিল, সামান্য হলেও করুণা বা দ্বিধা দেখতে পাবে ওই সবুজ চোখে। কিন্তু তার সাথে চোখাচোখি হতেই জেনে গেল সাইমন, যতটুকু আশাও বা ছিল, সেটুকুও এখন আর নেই।

ওকে খুন করবে মেয়েটা। এবং কাজটা করে সে আনন্দ পাবে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে।

জানলার বাইরে শরীরের অর্ধেকটা বের করে দিল যুবতী। পিস্তল উঁচু করল শিকারের মাথা নিশানা করে।

এবং পরমুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল সে।

পেছন থেকে এসে কেউ একজন টেনে জানালা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মেয়েটাকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল সাইমন। পরক্ষণেই মেয়েটার মেঝেতে পতনের শব্দ। মাথার খুলি ফেটেছে বিশ্রী শব্দ করে। গা রি-রি করে উঠল আওয়াজটা শুনে।

আরেকজন মহিলার চেহারা দেখল সাইমন জানালায়। বয়স্ক, পরনে বেখাপ্পা ধূসর ইউনিফর্ম, তাতে লাল ডোরাকাটা। চোখে উদ্বেগ আর মমতা নিয়ে ওর দিকে তাকাতে দেখল সে মহিলাকে। পরমুহূর্তে তড়িঘড়ি করে ফায়ার এস্কেপে বেরিয়ে এল সে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সাইমনের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে।

'শেষ, সব শেষ,' ওকে বলল মহিলা।

তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে চাইল সাইমন। জিজ্ঞেস করতে চাইল পেইজ তার পরিচিত কি না। কিন্তু মুখভর্তি রক্ত ওর, কথা বলতে পারছে না সেজন্যে। টের পেল, ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে ওর শরীর, তন্দ্রায় ঢলে পড়ছে সে। ক্রমশ আঁধার ঘনিয়ে আসছে ওর দুচোখে, তার মাঝেই এখনো শুনতে পাচ্ছে সাইরেনের আওয়াজ।

'আজ থেকে নিরাপদ আমাদের বাচ্চারা।'

তারপর শূন্যতা–স্রেফ শূন্যতা।

৩৮

এক মাস পর।

অপারেশন রুমে নিতে হয়েছিল সাইমনকে। ইনগ্রিড যে হাসপাতালে ছিল, ওখানেই আঠারো দিন কাটাতে হয়েছে ওকে। মরফিন আর থেরাপি দিতে হয়েছে দুই হপ্তা ধরে। ব্যথা আছে এখনো। বাকি জীবনটা হয়তো, ইলেনা রেমিরেজের মতো, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে ওকে। তা যদি না-ও হয়, অন্তত হাঁটার ছড়ি তো ব্যবহার করতেই হবে।

গোড়ালি মচকে যাওয়া এবং ছোটখাটো কিছু জখম ছাড়া আর কিছু হয়নি কর্নেলিয়াসের। গুলিবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছে রোকো আর লুথার। গুলি খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে এক ভাড়াটে খুনিও–নাম 'অ্যাশ' ডেভিস। মেঝেতে পিছলে পড়ে, খুলি ফেটে কোমায় চলে গেছে 'ডিডি' ল্যাহয় নামে এক যুবতী কাল্ট-সদস্য। এখনো তার জ্ঞান ফেরেনি, আর কখনো না ফেরার সম্ভাবনাই বেশি।

ডিটেকটিভ আইজ্যাক ফ্যাগবেনলে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছে সাইমনকে। যদিও কেসটাকে গুছিয়ে আনতে কিছুটা সময় লাগছে বিভিন্ন আইনরক্ষাবাহিনীর। ট্রুথ হেইভেন নামের একটা কাল্ট আর গোপন দত্তক এবং ভাড়াটে খুনির ব্যাপারস্যাপার জড়িত কেসটায়।

কিন্তু বিস্তারিত এখনো জানতে পারেনি।

পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে দিয়ে মারা গেছে ট্রুথ হেইভেনের পাণ্ডা, ক্যাস্পার ভারটেজও। স্বাভাবিক মৃত্যুই অবশ্য হয়েছে। তার দুই ছেলে নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেছে। কেস লড়ার জন্যে প্রথম সারির উকিল নিয়োগ করেছে তারা। উকিলরা দাবি করেছে, ক্যাস্পার ভারটেজ হয়তো কোনো বেআইনি কাজ করেছিল–সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নয়–কিন্তু লোকটা তো মরেই গেছে। তারা ছেলেরা বাপের অপকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না।

'ওদেরকে বড়শিতে গাঁথব আমরা,' সাইমনকে বলেছিল ফ্যাগবেনলে।

কিন্তু সাইমন এত নিশ্চিত হতে পারেনি। ভারটেজ তনয়দের সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে পারত দুই খুনি। কিন্তু তাদের কাছ থেকেও কিছু জানা সম্ভব নয়। পুলিশের হাতের তুরুপের তাস এখন সাইমনের জীবন বাঁচিয়েছিল যে মহিলা, সে। মহিলা নিজের পরিচয় দিয়েছে মাদার অ্যাডিওনা বলে। এত দীর্ঘ সময় ধরে কাল্টটায় ছিল সে যে, তার আসল নামই জানা যায়নি। আর পুলিশও তাকে আটকে রাখতে পারেনি। সাইমনের জীবন বাঁচানো ছাড়া আর কোনো অপরাধ(!) করেনি সে।

অন্যান্য প্রমাণাদিও রয়েছে অবশ্য। অবৈধ দত্তকের ব্যাপারে জানার পরপরই, পুলিশের বিশ্বাস, ইলেনা রেমিরেজকে হত্যা করেছে অ্যাশ আর ডিডি। একটা সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ। ওতে দেখা যায়, ক্র্যাকার ব্যারেল কান্ট্রি স্টোরের সামনে থেকে একটা গাড়িতে উঠছে ইলেনা–গাড়িটা চালাচ্ছিল ডিডি ল্যাহয়। ধারণা করা হচ্ছে, ওখান থেকে নির্জন কোনো কেবিনে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয় ওকে। কিন্তু ওর লাশটা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুনিরা ইলেনার মোবাইলে স্যাইমনের মেসেজ দেখার পর বুঝে ফেলে, ওকেও খতম করে দিতে হবে। আরো আছে। অ্যারন কর্ভালসহ অন্যান্য সৎ ভাইয়েরা ডিএনএ সাইটে একে অপরের খোঁজ পায়। সেই সূত্র ধরে যোগাযোগ হয় তাদের মাঝে। এরপর তারা প্রতিজ্ঞা করে, তাদের পিতাকে খুঁজে বের করার আগ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক বাইরের দুনিয়ার কাছ থেকে অজ্ঞাত রাখবে। এদিকে হেনরি থর্প আবার তার মাকেও খুঁজে বের করে ফেলে। জেনে ফেলে, কাল্টের প্রাক্তন সদস্য ছিল তার মা। কাল্টের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে হেনরি। ভারটেজদের হুমকি-ধমকি দিতে থাকে সে।

কিন্তু পেইজের ব্যাপারে নতুন কোনো খবর নেই।

হাসপাতালে পঞ্চম রাত। ব্যথা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, মরফিন দিয়ে রাখা হয়েছে সাইমনকে। সহসা আধোঘুমের মাঝে জেগে উঠল সে। ঢুলুঢুলু চোখে দেখল, ওর বিছানার পাশে বসে আছে মাদার অ্যাডিওনা।

'সবগুলো ছেলেকে খুন করছিল ওরা,' ওকে চোখ খুলতে দেখে বলল মহিলা।

এ কথা সাইমন জানে, যদিও খুন করার কারণটা ওর অজানা। কাল্ট হয়তো বাচ্চা বিক্রি করার অতীত অপরাধের ইতিহাস মুছে ফেলতে চাইছিল। কিংবা কোনো উদ্ভট আচার বা ভবিষ্যদ্বাণীর অংশ হিসেবে হয়তো খুন করা হয়েছে লোকগুলোকে।

'আমি সত্যে বিশ্বাস করি, মি. গ্রিন। এই বিশ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রায় সারাটা জীবন আমি সত্যের সেবা করেছি। এক ছেলের জন্ম দিয়েছিলাম আমি। ট্রুথ তখন বলেছিল, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের

(2,1) -150- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:55

একজন হবে ও। সেভাবেই বড় করি ওকে। তারপর আরেক ছেলের জন্ম দিই আমি। ট্রুথ তখন বলে এই ছেলেটিকে আমাদের সাথে রাখা চলবে না। তখন নির্দ্বিধায় ওকে ছেড়ে দিই। অথচ জানতাম, ছেড়ে দেয়ার মানে হচ্ছে আমার নাড়িছেঁড়া ধনকে জীবনে আর কখনো দেখতে পাব না।'

ঝাপসা চোখে দেখছে সাইমন মাদার অ্যাডিওনাকে।

'কিন্তু গত বছর আমি একটা ডিএনএ সাইটে সাইন আপ করি, আমার ছেলের কী হলো জানার জন্যে। নির্দোষ ইচ্ছা। স্রেফ একটু খোঁজখবর নেয়া। সামান্য একটু...সত্যি জানা,' বিষণ্ন একটুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল মহিলার ঠোঁটের কোণে। 'খোঁজ নিতে গিয়ে কী দেখলাম জানেন?'

মাথা নাড়ল সাইমন।

'আমার ছেলের নাম নাথান ব্র্যানন। ফ্লোরিডার ট্যালাহাসির দুই স্কুলশিক্ষক, হিউ ব্র্যানন আর মারিয়া ব্র্যাননের ঘরে বড় হয়েছে ও। ফ্লোরিডা স্টেট থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। বিয়ে করেছে হাই স্কুলের প্রেমিকাকে। এখন ওরা তিন ছেলের বাবা-মা। সবচেয়ে বড়টার বয়স দশ; তার পরের দুটো যমজ, বয়স ছয়। নাথানও এখন স্কুলশিক্ষক–ফিফথ গ্রেডের বাচ্চাদের পড়ায়। আপাদমস্তক ভালোমানুষ।'

উঠে বসতে চেষ্টা করল সাইমন, কিন্তু ওষুধের প্রভাবে বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে।

'আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিল ও। আমার ছেলে। কিন্তু আমি মানা করে দিই ওকে। কাজটা করতে কেমন কষ্ট হয়েছিল কল্পনা করতে পারেন, মি. গ্রিন?'

মাথা নাড়ল সাইমন, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করে বলল, 'না, পারি না।'

'কিন্তু আমার ছেলে ভালো আছে, সুখে আছে–এটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল আমার জন্যে। সুখে তো থাকবেই, ট্রুথ তা-ই চাইত।'

মাদার অ্যাডিওনার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সাইমন। হাতটা ধরল মহিলা। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল তারা। অন্ধকার ঘর, দূর থেকে ভেসে আসছে হাসপাতালের মৃদু আওয়াজ।

'কিন্তু তারপর জানতে পারলাম, আমার ছেলেকে খুন করতে চায় ওরা।' অবশেষে সাইমনের চোখে চোখ রাখল মাদার অ্যাডিওনা। 'আজীবন নিজের বিশ্বাসের জন্য মাথা নিচু করে চলেছি আমি। কিন্তু বেশি নিচু করতে গেলে একসময় মাটিতে পড়ে যেতে হয়। বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

'হ্যাঁ।'

'কাজেই ওদেরকে থামাতে হতো আমাকে। কাউকে আঘাত করতে চাইনি আমি। কিন্তু আর কোনো উপায়ও ছিল না।'

'ধন্যবাদ,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল সাইমন।

'আমাকে এবার ফিরতে হবে।'

'কোথায়?'

'ট্রুথ হেইভেনে। ওটা এখনো আমার বাড়ি।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে রওনা দিল মাদার অ্যাডিওনা।

'প্লিজ,' ঢোক গিলে বলল সাইমন। 'আমার মেয়ে। এই ছেলেদের একজনের সাথে ডেট করছিল ও।'

'ওরকমই শুনেছি।'

'ওকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তা-ও শুনেছি।'

'আমাকে সাহায্য করুন, প্লিজ,' কাতর কণ্ঠে বলল সাইমন। 'আপনি মা। আপনি বুঝবেন।'

'আমি বুঝি।' দরজা খুলল মাদার অ্যাডিওনা। 'কিন্তু আর কিছু জানি না আমি।'

চলে গেল মহিলা।

এক হপ্তা পর, কেসের ফাইলগুলো পড়তে দেয়ার অনুরোধ করল ও ফ্যাগবেনলেকে। সাইমনের ওপর করুণা হয়েছিল বোধহয় ফ্যাগবেনলের, তাই ফাইলগুলো পড়তে দিল ওকে।

ইনগ্রিডের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বোধহয়। তাই খানিকটা আশাবাদী হয়ে উঠেছে সবাই। টিভিতে যেমন দেখায়, বাস্তব জীবনে অমন হুট করে কেউ কোমা থেকে বেরিয়ে আসে না কেউ। প্রক্রিয়াটা অনেকটা দুই পা এগিয়ে এক পা পেছানোর মতো। দুবার সামান্য সময়ের জন্যে জ্ঞান ফিরে এসেছিল ইনগ্রিডের, দুবারই স্বামীর সঙ্গে কয়েকটা টুকরো কথা বলেছে ও। প্রতিবারই পূর্ণ সচেতন ছিল সে। কিন্তু সর্বশেষ জ্ঞান ফিরেছে তা-ও এক হপ্তার বেশি হয়ে গেল। এরপর থেকে আর কোনো উন্নতি নেই।

যেদিন গুলি খেয়েছে সাইমন, সেদিন থেকেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটার জবাব খুঁজছে সে।

পেইজ কোথায়?

দিনের-পর-দিন কেটে গেল, জবাব পেল না সে। তারপর হপ্তা গড়িয়ে মাস কাটল, তবু মিলল না জবাব।

***

গুলি খাওয়ার এক মাস পর প্রায় সেরে উঠল সাইমন। সেদিনই পোর্ট অথরিটিতে গিয়ে বাফেলোর বাস ধরল। সাত ঘণ্টার বাসভ্রমণের পুরোটা সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে। মনে আশা, এমন কোনো জায়গা চোখে পড়বে যা দেখে ওর স্মৃতিতে দোলা লাগবে।

কিচ্ছু হলো না।

বাফেলো পৌঁছে পাক্কা দুই ঘণ্টা বাস টার্মিনালের চারপাশে চরকির মতো ঘুরে বেড়াল সাইমন। ও নিশ্চিত, ব্লকটায় কয়েক চক্কর মারলেই একটা সূত্র পেয়ে যাবে।

কিন্তু পেল না।

শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ফিরতি বাসে উঠল সাইমন। তারপর আবার সাত ঘণ্টার ভ্রমণ ।

আসার সময়ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সারাক্ষণ।

এবারও লাভ হলো না কোনো।

রাত প্রায় দুটোর দিকে বাস এসে থামল পোর্ট অথরিটিতে। ওখান থেকে একটা ট্রেন ধরে চলে গেল হাসপাতালে। ইনগ্রিডকে আইসিইউ থেকে সরিয়ে প্রাইভেট রুমে রাখা হয়েছে। অবশ্য এখনো জ্ঞান ফেরেনি। স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমানোর জন্যে রুমটায় একটা খাটের ব্যবস্থা করেছে সাইমন। মাঝে মাঝে রাতের বেলায় সাইমনের মনে হয় বাড়িতে ওর সান্নিধ্য দরকার স্যাম আর আনিয়ার। কিন্তু বেশিরভাগ রাতেই, আজকের মতো, হাসপাতালে এসে স্ত্রীর কপালে চুমো খেয়ে তার পাশের খাটে ঘুমায় সে।

কিন্তু আজ রাতে–গুলি খাওয়ার এক মাস পর–সাইমন এসে দেখে অন্য একজন বসে আছে ইনগ্রিডের রুমে।

বাতি নেভানো ছিল বলে সে কেবল ইনগ্রিডের বিছানার পাশে বসা মানুষটার অবয়ব দেখতে পাচ্ছে।

দরজায় জমে গেল সাইমন। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল দুই চোখ। মুখে হাতচাপা দিল তড়িঘড়ি করে, তবু চাপা চাপা চিৎকার ঠেকাতে পারল না। সাইমন অনুভব করল, হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে এদিকে ফিরল পেইজ। মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাবা?'

ডাকটা শুনেই হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল সাইমন।

৩৯

বাপকে ধরে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল পেইজ।

'আমি থাকতে পারব না,' বলল ও। 'কিন্তু এক মাস হয়ে গেছে।'

এখনো সম্পূর্ণ ধাতস্থ হয়নি সাইমন। অবাক হয়ে বলল, 'এক মাস?'

'ছুঁইনি।'

সত্যি কথা বলেছে পেইজ। স্পষ্ট বুঝতে পারছে সাইমন। আনন্দে বুক ধড়াস করে উঠল ওর। ক্লান্ত, পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওর মেয়েকে। কিন্তু পেইজের চোখ দুটো ঝকঝকে পরিষ্কার–শান্ত, সংযত দেখাচ্ছে ওকে। সাইমন টের পেল, আবার পানি চলে আসছে ওর চোখে, এবারের কান্নাটা আনন্দের। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় চোখের জল সামলাল সে।

'এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি,' ওকে সাবধান করল পেইজ। 'হয়তো কখনো হতেও পারব না। কিন্তু এখন আগের চেয়ে ভালো আছি।'

'এতদিন তাহলে...'

'এসবের কিছুই জানতাম না আমি। কোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার অনুমতি নেই আমাদের। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব বা বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ করাও নিষেধ। কড়া নিয়ম। পুরো এক মাস বাইরের সাথে কোনো যোগাযোগ চলবে না। এটাই আমার সেরা সুযোগ ছিল, বাবা। সত্যি বলতে, একমাত্র সুযোগ ছিল।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে সাইমন, মুখে কথা জোগাচ্ছে না।

'চিকিৎসার জন্য ফিরে যেতে হবে আমাকে। ব্যাপারটা তোমাকে বুঝতে হবে। এখনো বাস্তব দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত না আমি। একটা চব্বিশ ঘণ্টার পাস দেয়া হয়েছে আমাকে–তা-ও কেবল এই জরুরি অবস্থার জন্য। ফিরতে হবে আমাকে। এখানে এসেছি অল্পক্ষণ, এর মাঝেই ইচ্ছেটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে...'

'ফিরে যাবি তুই,' সাইমন বলল। 'আমি দিয়ে আসব।'

মায়ের বিছানার দিকে ফিরল পেইজ। 'আমার জন্য হয়েছে এসব।'

'না, খবরদার,' হিসিয়ে উঠল সাইমন। 'এভাবে ভাববি না।'

মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল সাইমন। এখনো নাজুক দেখাচ্ছে ওকে–বড্ড নাজুক, আর অসহায়। নতুন দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল সাইমনকে–পেইজ যদি নিজেকে দোষী ভাবে, অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকে, তাহলে হয়তো আবার সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যাবে ও।

'তোর দোষে হয়নি এসব,' দরদমাখা গলায় বলল সে। 'কেউ তোকে দোষ দিচ্ছে না, অন্তত আমি আর তোর মা তো না-ই। ঠিক আছে?'

অনিশ্চিত চেহারায় মাথা দোলাল মেয়েটা।

'পেইজ?'

'বলো, বাবা।'

'কী হয়েছিল, বলতে চাস আমাকে?'

'সেদিন ঘরে ফিরে দেখি অ্যারন মরে গেছে। ...তখন আমি লুকিয়ে পড়ি। ভেবেছিলাম...ভেবেছিলাম পুলিশ ধরেই নেবে যে আমি খুন করেছি ওকে। ওর সাথে যা করা হয়েছিল সেটা ভয়াবহ। বীভৎস। অ্যারন মারা গেল। অবশেষে আমার জীবন থেকে বিদায় নিল ও। আমার একটা অংশ স্বাধীনতার স্বাদ পেল। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো?'

মাথা দোলাল সাইমন।

'তারপরই চিকিৎসা নিতে চলে গেলাম আমি।'

'জায়গাটার খোঁজ পেলি কীভাবে?' জানতে চাইল সাইমন।

চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ওর মেয়ে।

'পেইজ?'

'আগেও ওখানে গিয়েছিলাম,' জবাব দিল ও।

'কবে?'

'আমাকে সেন্ট্রাল পার্কে যেদিন দেখেছিলে, সেদিনের কথা মনে আছে?'

'অবশ্যই।'

'তার আগে ওখানে গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য।'

'দাঁড়া...কবে?'

'এর কদিন আগেই। কাজও হচ্ছিল চিকিৎসায়। আমার তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু তখনই আমাকে খুঁজে বের করে ফেলে অ্যারন। এক রাতে ঢুকে পড়ে আমার ঘরে। ঘুমের মধ্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ দেয় আমাকে। পরদিনই পালাই ওর সাথে।'

বনবন করে মাথা ঘুরছে সাইমনের। 'এক মিনিট। তোকে পার্কে দেখার ঠিক আগেই রিহ্যাবে ছিলি তুই?'

'হ্যাঁ।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। রিহ্যাবটার খোঁজ পেলি কী করে?'

বিছানার দিকে তাকাল পেইজ।

বিশ্বাস হচ্ছে না সাইমনের। 'তোর মা?'

'হ্যাঁ, মা নিয়ে গিয়েছিল।'

ইনগ্রিডের দিকে তাকাল সাইমন, যেন এক্ষুনি কোমা থেকে উঠে বসে সব ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে ও।

'মার কাছে এসেছিলাম আমি,' পেইজ বলল। 'শেষ একটা আশা নিয়ে। জায়গাটা মার চেনা ছিল। আগে–বহু বছর আগে–ওখানে ছিল মা। তার কাছ থেকেই জেনেছি, ওরা অন্যভাবে কাজ করে। সেজন্য একবার চেষ্টা করে দেখলাম। কাজও হচ্ছিল। কিংবা কে জানে হয়তো হচ্ছিল না। অন্যকে দোষ দেওয়া সহজ, কিন্তু হয়তো...'

নতুন তথ্যগুলো হজম করার চেষ্টা করছে সাইমন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটার ওপর মনোযোগ দিতে চেষ্টা করছে।

ওর মেয়ে ফিরে এসেছে, সুস্থ হয়ে, নেশা ছেড়ে দিয়ে।

যতটা সম্ভব কোমল গলায় পরে প্রশ্নটা করল সে। 'তোর মা যে তোকে সাহায্য করছে, এ কথা আমাকে বলেনি কেন ও?'

'আমি মানা করেছিলাম। এই শর্তের বিনিময়ে রাজি হয়েছিলাম চিকিৎসা নিতে।'

'কেন, আমাকে জানাতে চাসনি কেন?'

ওর দিকে ফিরল পেইজ। ওর যন্ত্রণাদগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে সাইমন ভাবল, কতদিন হলো ভালো করে মেয়েকে দেখে না ও। 'তোমার চেহারা,' বলল পেইজ।

'কী?'

'আগে যখন আমি ব্যর্থ হতাম, তোমাকে হতাশ করতাম, ভীষণ হতাশা ফুটে উঠত তোমার চেহারায়। ভীষণ কষ্ট হতো...' থেমে গেল মেয়েটা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আরেকবার যদি ব্যর্থ হয়ে তোমার মুখের দিকে তাকাই, তখন বোধহয় আত্মহত্যাই করে বসব।'

আবারও মুখে হাত চলে গেল সাইমনে। 'ওহ, সোনা!'

'আমি দুঃখিত, বাবা।'

'ওভাবে ভাবিস না, প্লিজ। আমার আচার-আচরণে যদি কখনো ওরকম কষ্ট পাস, তাহলে আমাকে মাফ করে দিস।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাতে আঁচড় কাটতে আরম্ভ করল পেইজ। সূচের দাগগুলো দেখতে পেল সাইমন, যদিও ওগুলো ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছে।

'বাবা?'

'হুঁ?'

'এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

'আমি নামিয়ে দিয়ে আসব।'

***

রিহ্যাবে ফেরার আগে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুঁ মারল ওরা। ভাইবোনকে জাগাল পেইজ। তিন সন্তানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু উষ্ণ অশ্রুপূর্ণ পুনর্মিলন নিজের আইফোনে ভিডিয়ো করে রাখল সাইমন। ভিডিয়োটা চালিয়ে ইনগ্রিডকে শোনাবে। কোমার মধ্যে ও কিছু শুনবে কি না তার পরোয়া করে না। বারবার ভিডিয়োটা চালাবে সে।

রিহ্যাবটা বেশ দূরের পথ। অত দূরের রাস্তা গাড়ি চালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে নেই সাইমনের। প্রথম কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটাল পেইজ।

এই ফাঁকে, নিজের চিন্তায় ডুবে গেল সাইমন।

অনেকগুলো অনুভূতি জট পাকিয়ে গেছে ওর ভেতরে। পেইজকে–সুস্থ পেইজকে–আবার দেখতে পেরে সে যেমন খুশি হয়েছে, তেমনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এই অনুভূতি অতুলনীয়। আপাতত এই আবেগকেই আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল। এরপরের দুশ্চিন্তা, নিজের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পেইজকে অমন নিদারুণ অনুশোচনার মধ্যে ফেলে দেয়ার দুঃখবোধ, ইনগ্রিড কেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা ওর কাছ থেকে গোপন রাখল–এসব চিন্তা জোর করে দূরে ঠেলে দিতে চাইল সে।

কাজটা কীভাবে করতে পারল ইনগ্রিড?

পেইজকে রিহ্যাবে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে ওর কাছে চেপে গেল সে? সাইমন মেয়েকে পার্কে দেখার পর, অ্যারনের সাথে সংঘাতের পরও কেন মুখ খুলল না ইনগ্রিড? সন্তানকে দেয়া কথা রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ, তা সাইমন জানে। কিন্তু দম্পতি হিসেবে তো এভাবে সংসার চালায় না ওরা।

ওরা একজন আরেকজনকে সব কথা বলে। কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লুকায় না।

সাইমন অন্তত তা-ই ভাবত।

লুথারের ইনগ্রিডকে গুলি করার ব্যাপারে রোকো কী বলেছিল মনে পড়ে গেল সাইমনের। এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল পেইজের। পানির বোতলের জন্যে হাত বাড়াল সে।

'কেমন লাগছে?' ওর কাছে জানতে চাইল সাইমন।

'ভালো। অনেক দূরের রাস্তা, বাবা। বাসে করেই ফিরতে পারতাম।'

'তা হতো না।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসি দিল সাইমন। হাসিটা ফেরত এল না।

'রিহ্যাবে তুমি আমার সাথে দেখা করতে পারবে না,' পেইজ বলল। 'আরো এক মাস সব বন্ধ। কোনো দর্শনার্থী আসার অনুমতি নেই।'

'ঠিক আছে।'

'আমি তোমাকে দুশ্চিন্তায় রাখতে চাইনি বলে আমাকে আসতে দিয়েছে ওরা।'

'ধন্যবাদ।'

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাল সাইমন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কাজ করে কীভাবে?'

'কারা?'

'প্রথম মাস শেষ হওয়ার পর, রিহ্যাব থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দিল তোকে?'

'হ্যাঁ।'

'যা যা ঘটেছে, পত্রিকায় পড়ে জেনেছিস?'

মাথা দোলাল পেইজ। 'ক্লিনিকে আমার কাউন্সেলর ছিলেন যিনি, উনি একটা রিপোর্ট দেখেছিলেন। উনিই আমাকে জানিয়েছেন সব।'

'কবে?'

'কাল রাতে।'

'তার মানে, তোর কাউন্সেলর সব জেনে ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল তোর কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ। এটাই আমার শেষ সুযোগ ছিল। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হতো আমাকে। প্লিজ, বোঝার চেষ্টা করো।'

'বুঝেছি।' প্রসঙ্গ বদলাল সাইমন: 'জানিস, তোর আগের বাড়িঅলা কর্নেলিয়াসের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমার।'

ওর দিকে ফিরল পেইজ।

'তোর মার জীবন বাঁচিয়েছে ও।'

'কীভাবে?'

ওদের ব্রঙ্কসে যাওয়া, কর্নেলিয়াসের সাথে দেখা হওয়া, ওই বেজমেন্টে রোকোর সাথে দেখা করতে যাওয়া–সব খুলে বলল সাইমন মেয়েকে।

'কর্নেলিয়াস সত্যিই খুব ভালো ব্যবহার করত আমার সাথে,' বাপের কথা শেষ হলে বলল পেইজ।

'আরেকটা কথা বলেছে ও। অ্যারন খুন হওয়ার দুদিন আগে রক্তাক্ত চেহারায় দৌড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলি তুই।'

মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল পেইজ।

'অ্যারন তোকে মারত?'

'ওই একবারই।'

'খুব খারাপভাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাই তুই পালালি। তারপর, পুলিশের মতে, ওই ভাড়াটে খুনি খুন করল ওকে।'

'বোধহয়,' নিস্তেজ শোনাল পেইজের গলা।

মেয়ের গলা শুনেই বুঝতে পারল সাইমন, মিথ্যে লুকিয়ে রয়েছে ওর কথায়।

(2,1) -154- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:56

সাইমন জানে, অ্যারন কর্ভালের খুনের ব্যাপারে পুলিশের যে থিয়োরি দাঁড় করিয়েছে, ওটার কোথাও-না-কোথাও একটা গলদ আছে। একদিকে তত্ত্বটা একদম নিখুঁত, খাপে খাপ মিলে যায়। আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। অবৈধভাবে দত্তক নেয়া ছেলেগুলোকে খুন করাচ্ছিল কাল্ট। ওই ছেলেগুলোর একজন ছিল অ্যারন কর্ভাল। সুতরাং সে-ও কাল্টের টার্গেট ছিল। সাইমনকে মারা জরুরি হয়ে পড়েছিল বলেই ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছিল অ্যাশ আর ডিডি।

কিন্তু সাইমন যে ওখানে থাকবে, তা কীভাবে জানল ওরা?

হাতে যেসব তথ্য আছে, সেগুলো মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল সাইমন। ই-জেডপাস রেকর্ড দেখেছে সে–অ্যাশ আর ডির গাড়ি একবারও হাসপাতালের আশপাশে যায়নি। কাজেই ওকে অনুসরণ করছিল না ওরা। সেই সম্ভাবনা বাতিল।

পরক্ষণেই আরেকটা ব্যাপার সাইমনের মনোযোগ কেড়ে নিল।

একজন সাক্ষী–কর্নেলিয়াসের ভাড়াটে, এনরিক বোয়ায–দাবি করেছে, দোতলায় কর্নেলিয়াসের অ্যাপার্টমেন্টে গোলাগুলি শুরু হওয়ার ঠিক আগে তিনতলায় ডিডিকে দেখেছে সে।

কেন? তিনতলায় গিয়েছিল কেন সে?

পুলিশের মতে, ব্যাপারটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র। সব কেসেই এমন ছোটখাটো কিছু অসঙ্গতি থাকে। কিন্তু চিন্তাটা ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলেছে সাইমনকে। কাজেই সেদিনের স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল সে। এনরিককে প্রশ্ন করে একটা সম্ভাব্য সূত্র আবিষ্কার করল:

অ্যারন ও পেইজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ডিডি।

আবারও সেই একই প্রশ্ন: কেন? অ্যারনকে যদি ইতিমধ্যে খুনই করে ফেলে তাহলে আবার কেন তার ঘরে ফিরে যাওয়া? দরজায় লাথি মেরে–পুলিশ চলে যাবার পর ব্যাপারটা খেয়াল করেছে কর্নেলিয়াস–ভেতরে ঢোকা কেন?

উঁহু, ব্যাপারটা মিলছে না।

'পেইজ?'

'হুঁ?'

'অ্যারন তোকে পেটানোর পর তুই কী করেছিলি?'

'দৌড়ে পালিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'আ...আমি নেশার জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম।'

'মাকে ফোন করিসনি?' দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল সাইমন।

নীরবতা।

'পেইজ?'

‘প্লিজ, এই প্রসঙ্গটা বাদ দাও।’

‘মাকে ফোন করেছিলি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী বলেছিল ও?’

‘আ...’ চোখ বন্ধ করে ফেলল পেইজ। ‘আমি কী করেছি, তা জানিয়েছিলাম মাকে। বলেছিলাম, আমি পালিয়েছি।’

‘আর কী বলেছিলি?’

‘বাবা। প্লিজ। প্লিজ, এই প্রসঙ্গ বাদ দাও।’

‘সত্যিটা জানার আগে বাদ দিচ্ছি না। সত্যটা কখনো এই গাড়ির বাইরে বেরোবে না, পেইজ। কক্ষনো না। অ্যারন একটা জাত-হারামি ছিল। ওর মৃত্যু খুন ছিল না। আত্মরক্ষা ছিল ওটা। তোকে প্রতিদিন খুন করছিল ও। বিষ দিচ্ছিল তোকে। তুই যখন শুধরাতে চাইলি, তখন তোকে খুঁজে বের করে আবার বিষ দিল ও। আমার কথা বুঝতে পারছিস?’

মাথা দোলাল ওর মেয়ে।

‘এখন বলে ফেল্, কী হয়েছিল?’

‘অ্যারন সেদিন আমাকে মেরেছিল, বাবা। ইচ্ছামতো ঘুষি মেরেছিল।’

আবার সেই সর্বগ্রাসী ক্রোধ অনুভব করছে সাইমন।

‘আর নিতে পারছিলাম না। তবে জানতাম, আবার সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারব–কেবল যদি...কেবল যদি...’

‘অ্যারনকে ঝেড়ে ফেলা যায়,’ মেয়ের কথা শেষ করে দিল সাইমন।

‘সেদিন পার্কে তুমি কী দেখেছিলে মনে আছে? আমি যেভাবে তাকাচ্ছিলাম?’

মাথা দোলাল সাইমন।

‘ওর খপ্পর থেকে বেরোতে হতো আমাকে।’ সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পেইজ। ‘তাই ওকে খুন করলাম আমি। হ্যাঁ, বাবা, খুন করলাম ওকে। তারপর পালালাম।’

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে সাইমন। এত শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরেছে যে, হাত ব্যথা করছে।

‘বাবা?’

‘তুই আমার মেয়ে। তোকে আমি সবসময় রক্ষা করব। সবসময়। তোকে নিয়ে আমার গর্ব হয়। ঠিক কাজটাই করার চেষ্টা করছিস তুই।’

বাবার কাছ ঘেঁষে বসল পেইজ। এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল সাইমন।

‘কিন্তু অ্যারনকে তুই খুন করিসনি।’

সে টের পেল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেইজের শরীর।

‘অ্যারন খুন হওয়ার দুই দিন আগে মার খেয়েছিস তুই।’

‘বাবা, প্লিজ, বাদ দাও।’

মেয়ের কথায় কান দিল না সাইমন। ‘মাকে ফোন করলি তুই। সাহায্য চাইলি ওর কাছে।’

গুটিসুটি মেরে বাপের আরো কাছে সরে এল পেইজ। থরথর করে কাঁপছে ও। ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল সাইমনকে। ওকে এভাবে চাপে ফেলে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু সত্য পর্যন্ত তো পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

‘মা কি তোকে সেই রাতে বাইরে থাকতে বলেছিল?’

‘বাবা, প্লিজ,’ দুর্বল হয়ে এসেছে পেইজের কণ্ঠ।

‘তোর মাকে আমি চিনি। আমি হলেও পরিস্থিতিটাকে ওর মতো করেই বিচার করতাম। তোকে এই দারুণ রিহ্যাবে এনে ভর্তি করে দিতাম আমরা। কিন্তু অ্যারন যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন তোকে ঠিকই খুঁজে বের করবে ও। তোদের দুজনের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত বাঁধন ছিল, এমন একটা অদ্ভুত সম্পর্কে তোরা জড়িয়ে ছিলি যা আমার বোধের অগম্য। তোদের সম্পর্কটাকে আমি কখনো বুঝতে পারব না। অ্যারন ছিল এমন এক পরজীবী যাকে মারতেই হতো।’

‘তা-ই করেছি আমি,’ পেইজ বলল। গলায় দুর্বিনীত সাহস এনে কথাটা বলার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু লাভ হয়নি।

‘না, সোনা, তুই করিসনি। সে কারণেই তোর মাকে গুলি করেছিল লুথার। সেই রাতে ওকে দেখেছিল ছেলেটা। খুন হওয়ার আগে এই কথাটাই আমাকে বলতে চাইছিল সে। লুথার তোর মাকে তোর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বের হতে অথবা শয়তানটাকে খুন করার সময়ই ওকে দেখে। আমি ঠিক নিশ্চিত না। কাজেই কয়েকদিন পর সে যখন তোর মাকে রোকোর কাছে দেখে, তখন ভেবে বসে তাকেও খুন করবে ও। অ্যারন তো রোকোর জন্য কাজ করত, না? সেজন্যই পিস্তল বের করেছিল লুথার। সেজন্যই তোর মাকে আগে গুলি করেছে সে, আমাকে না। সে কারণেই বারবার জোর দিয়ে বলতে পারছিল, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে গুলি করেছে সে।’

সেই শুরু থেকেই ঠিক বলছিল ফ্যাগবেনলে: ‘সবচেয়ে সরল ব্যাখ্যাটাই সাধারণত ঠিক হয়। ...অ্যারন কর্ভালকে আপনি খুন করেছেন। অথবা আপনার স্ত্রী করেছে। সেজন্যে আপনাদের কাউকে দোষ দেব না। লোকটা একটা দানব ছিল। ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে মারছিল আপনাদের মেয়েকে। আপনাদের চোখের সামনে খুন করছিল ওকে।’

ইনগ্রিড যে কাজের বিরতিতে ব্রঙ্কসে চলে যেতে পারে তা-ও ধারণা করে ফেলেছিল ফ্যাগবেনলে। ওর বাইরে যাওয়ার সিসিটিভি ফুটেজ আছে ওদের কাছে। সময়টা জানত ইনগ্রিড। অ্যারন যখন একা ছিল, তখন গিয়েছিল ও।

‘পেইজ?’

(1,1) -156- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:56

'মা যে ওকে খুন করবে, জানতাম না আমি।' বাপের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে মেয়েটা। 'সেদিন আগে আগে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে দেখি... হাসপাতালের পোশাক ছিল মার পরনে। রক্তে মাখামাখি ছিল ওগুলো। পরে বোধহয় কোথাও ফেলে দিয়েছিল কাপড়গুলো। কিন্তু মাকে দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাই।'

'কোথায়?'

'আরেকটা বেজমেন্টে। রোকোরটার মতোই। ওখানে গিয়ে ড্রাগ নিই। কয়েক ঘণ্টা পড়ে থাকি ওখানে। ঠিক কতক্ষণ, বলতে পারব না। হুঁশ ফেরার পর সত্যিটা দেখতে পেলাম।'

'কোন্ সত্যি?'

'আমার মা একজনকে খুন করেছে। একবার ভাবো ব্যাপারটা। আমার জন্য একটা লোককে খুন করেছে মা।' শিউরে উঠে থেমে গেল পেইজ।

চুপচাপ কেটে গেল কিছুক্ষণ।

তারপর সাইমন জিজ্ঞেস করল, 'তোর মা রিহ্যাবে ফোন নিয়ে তুই ওখানে গিয়েছিস কি না জানতে চাইল না কেন?'

'ফোন করেছিল হয়তো। কিন্তু তখনও আমি ওখানে পৌঁছুইনি। কয়েকদিন লেগে গিয়েছিল আমার ধাতস্থ হয়ে ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে।'

ততদিনে কোমায় চলে গেছে ইনগ্রিড।

'বাবা?'

'কী, সোনা?'

'প্রসঙ্গটা এবার বাদ দিতে পারি না, প্লিজ?'

খানিকক্ষণ ভাবল সাইমন। 'পারি বোধহয়।'

'কথাগুলো কখনো এই গাড়ি ছেড়ে বেরোবে না তো?'

'কক্ষনো না।'

'কথাটা কিন্তু মায়ের জন্যও প্রযোজ্য।'

'মানে?'

'তুমি যে সব জানো, তা মাকে বোলো না, কেমন? ব্যাপারটা এখানেই ছেড়ে দাও।'

(2,1) -156- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:56

৪০

দেখতে দেখতে কেটে গেল সপ্তাহগুলো, ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল ইনগ্রিড। আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠছে জীবন। মেয়ের অনুরোধ নিয়ে ভাবে সাইমন।

ওদের দুজনের কথা কি কখনো গাড়ির বাইরে বের হওয়া উচিত না? ওর স্ত্রী যে একটা লোককে খুন করে ফেলেছে, এ কথাটা যে ও জানে, তা ওকে না বললেই কি সবচেয়ে ভালো হয়?

ব্যাপারটা গোপন রেখে জীবন কাটিয়ে দেয়াই কি ভালো হবে?

আপাতদৃষ্টিতে সবগুলোর জবাবই 'হ্যাঁ' মনে হচ্ছে।

সাইমনের স্ত্রী ওর কাছে, ওর পরিবারের কাছে ফিরে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার মতো বল ফিরে পেয়েছে ইনগ্রিড।

সপ্তাহ পেরিয়ে মাসে গড়াল।

আনন্দময় একেকটা মাস।

পেইজেরও উন্নতি হচ্ছে ক্রমশ। অবশেষে ওকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেয়া হয়েছে রিহ্যাব থেকে।

অ্যামহার্স্টে ফিরে গেছে স্যাম, নতুন সেমিস্টার শুরু হয়েছে ওর। আনিয়ার স্কুল ভালো চলছে। কাজে ফিরেছে সাইমন। ইনগ্রিডও শিগগিরই কাজে যোগ দিল।

আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে ওদের জীবন।

ওদের জীবনে এখন হাসি-আনন্দের বন্যা। মনের আনন্দে সেন্ট্রাল পার্কে হাঁটতে বের হয় ওরা। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ডিনারে যায়, রাতে থিয়েটার দেখতে যায়। ভালোবাসায়, আলোতে আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরিবারটা।

পেইজ ফিরে আসায় দারুণ খুশি ইনগ্রিড আর সাইমন। যত ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দরকার, সব দিয়েছে ওরা ওকে। তবে মনের মধ্যে ক্ষীণ একটা ভয় রয়েই গেছে ওদের–রাক্ষস অ্যারন ওদের মেয়ের শরীরে যে দানব ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেটা এখন দুর্বল বা শীতনিদ্রায় চলে গেলেও, পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি, অপেক্ষা করছে সগর্জনে খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসার।

কারণ এসব দানব কখনো মরে না।

কিন্তু মরে না মানুষের গোপন অতীতও।

সেটাই আসল সমস্যা। ভালোই চলছে সবকিছু। ওদের বাড়িতে এখন সুখ আসন গেড়ে বসেছে। কিন্তু তার সাথে আসন গেড়েছে সেই গোপন ব্যাপারটাও।

এক রাতে, সেন্ট্রাল পার্কে হাঁটার সময়, স্ট্রবেরি ফিল্ডসে থামল ইনগ্রিড আর সাইমন। সাইমন সচরাচর এই রাস্তা এড়িয়ে চলে। এখানেই পেইজকে বিটলসের সেই গানটা গাইতে দেখেছিল। কোন্ গানটা যেন গাইছিল ও? মনে নেই সাইমনের। অবশ্য মনে করতে চায়ও না।

কিন্তু ইনগ্রিডের ইচ্ছা বেঞ্চিটায় বসবে। কাজেই বসতে হলো ওকেও। অভ্যাসের বশে বেঞ্চিতে খোদাই করে লেখা পড়তে লাগল ও:

আমাদের আদরের কুকুর, জার্সির জন্য এই বেঞ্চ। আপনার সঙ্গে এই বেঞ্চ ভাগাভাগি করে খুশি হবে ও।

সাইমনের একটা হাত নিজের হাতে নিল ইনগ্রিড। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। অস্ফুটে বলল, 'তুমি জানো।'

'হ্যাঁ।'

'কাজটা আমি কেন করেছি, তুমি বুঝেছ।'

মাথা দোলাল সাইমন। 'হ্যাঁ।'

'ও যেন পানিতে ডুবে যাচ্ছিল। যতবারই পানির ওপরে মাথা ভাসাচ্ছিল, ওই বেজন্মাটা আবার টেনে তলায় নিয়ে যাচ্ছিল ওকে।'

'আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা দিতে হবে না তোমাকে।'

ওর হাতের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসল ইনগ্রিডের হাত।

'প্ল্যান করলে তুমি,' বলল সাইমন।

'ও ফোন করার সাথে সাথেই।'

'ব্যাপারটাকে সহিংস রূপ দিলে, রক্তারক্তির ব্যবস্থা করলে...'

'...পুলিশ যাতে ভাবে কাজটা ড্রাগের কারবারিদের,' স্বামীর কথা সম্পূর্ণ করল ইনগ্রিড।

'আমার সাহায্য চাইলে না কেন?' স্থির চোখ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে সাইমন।

'তিনটা কারণে,' জবাব দিল ইনগ্রিড।

‘বলে ফেলো।’

‘এক, তোমাকে রক্ষা করাও আমার কাজ। কারণ তোমাকে আমি ভালোবাসি।’

‘আমিও।’

‘দুই, আমি যদি ধরা পড়ে যাই, তবে বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্যে আমাদের একজনকে মুক্ত থাকতে হতো।’

যুক্তিটা শুনে হেসে ফেলল সাইমন। ‘প্র্যাক্টিক্যাল।’

‘হ্যাঁ।’

‘তৃতীয় কারণ?’

‘ভেবেছিলাম, কাজটা আমাকে করতে দেবে না তুমি।’

কিছু বলল না সাইমন। সে কি অ্যারন কর্ভালকে খুন করার পরিকল্পনায় সাহায্য করত স্ত্রীকে?

জানে না সে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আবার সেই আগের মুগ্ধতা ফিরে পেল। আবার হেরে গেল স্ত্রীর কাছে।

‘আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসি,’ ইনগ্রিড বলল।

‘আমিও।’

স্বামীর কাঁধে মাথা রাখল ইনগ্রিড।

জীবনে এরকম স্বর্গীয় মুহূর্ত খুব কমই আসে। বেশিরভাগ সময়ই এই মুহূর্তগুলো কেটে যাবার আগ পর্যন্ত তা কেউ টের পায় না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আলাদা। ভালোবাসার মানুষটার সাথে বসে মুহূর্তটার তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে সে। উপলব্ধি করছে, স্বর্গীয় এক মুহূর্ত হাজির হয়েছে ওদের জীবনে।

ইনগ্রিডও তা জানে।

এ এক স্বর্গীয় আনন্দময় সময়।

এবং এই সময়টুকু চিরস্থায়ী হবে না।

(1,1) -158- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:57

শেষকথা

খুন হওয়ার প্রায় এক বছর পর ইলেনা রেমিরেজের দেহ খুঁজে পেল স্টেট পুলিশ।

ওর শেষকৃত্যের আয়োজন করা হলো শিকাগোতে। তাতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সাইমন আর কর্নেলিয়াস। বিমানের বদলে গাড়ি নিয়ে যাবে বলে ঠিক করল ওরা। কোন্ কোন্ পথে যাবে, সেই পরিকল্পনা করল কর্নেলিয়াস। অদ্ভুত সব জাদুঘর আর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে যাবে ওরা।

জোয়েল মার্কাস নামে এক লোকের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হলো ইলেনা।

শিকাগোর বাইরে এক রাত কাটাল ওরা। পরদিন সকালে বাড়ি ফেরার সময় সাইমন জিজ্ঞেস করল, 'পিটসবার্গে থামলে তুমি কিছু মনে করবে?'

'মোটেই না,' জবাব দিল কর্নেলিয়াস। তারপর সাইমনের চেহারার বদলে যাওয়া ভাব দেখে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'একজনের সাথে দেখা করতে হবে?'

সাইমন দরজায় টোকা দিতে এক যুবক মাথা বের করল।

'ডগ মালযার?'

'হ্যাঁ।'

আরোগ্যলাভের পর শারীরিক বা মানসিক, কোনোভাবেই ল্যানফোর্ড কলেজে ফিরতে পারেনি মালযার। তাতে সাইমনের কিছু যায়-আসে না। কিংবা কে জানে, হয়তো যায়-আসে।

'আমি সাইমন গ্রিন। পেইজের বাবা।'

***

নিউ ইয়র্কে ফিরে কর্নেলিয়াসকে নামিয়ে দিয়ে পিপিজি ম্যানেজমেন্টের অফিসে গেল সাইমন। অফিসের সময় শেষ হলেও, এখনো বের হয়নি

(2,1) -158- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:57

ইভোনি। তাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল সাইমন। 'ইনগ্রিডের গোপন কথাটা বোধহয় আমি জানি।'

***

সেই রাতে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে ঢুকেই, এলিভেটরের সামনে সুজি ফিস্কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর। উষ্ণ হাসির সাথে গালে চুমু খেয়ে ওকে স্বাগত জানাল সুজি।

'স্যাম দেখলাম অ্যামহার্স্ট থেকে বাড়ি এসেছে,' বলল সে।

'হ্যাঁ, আজ রাতটা থাকবে।'

'ওরা তিনজনই তাহলে বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'দারুণ ব্যাপার।'

হাসল সাইমন। 'হ্যাঁ।'

'শুনলাম পেইজ এনওয়াইইউ-তে ভর্তি হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তবে বাড়িতেই থাকবে।'

'তোমাদের জন্যে সত্যিই খুব খুশি আমি।'

'ধন্যবাদ, সুজি। জানি, ইতিমধ্যে অনেকবার ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছি তোমাকে। তবু...'

'সাথে রেডফার্মের গিফট কার্ডও দিয়েছ। এরইমাঝে চারবার ওখানে খেয়ে ফেলেছি আমরা।'

সাইমনের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামল এলিভেটর। নিজের চাবি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। 'জোম্বি' গানটার ব্যাড উল্ভসের সংস্করণ বাজছে রান্নাঘরে ব্লুটুহ স্পিকারে। গানের সাথে গলা মেলাচ্ছে ইনগ্রিড:

'হোয়াট'স ইন ইয়োর হেড, ইন ইয়োর হেড, জোম্বি...'

রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল সাইমন। ওর দিকে ফিরে হাসল ইনগ্রিড। 'হাই।'

'হাই।'

'ট্রিপ কেমন ছিল?'

'ভালো,' জবাব দিল সাইমন। 'বিষণ্ণ।'

'তোমার ছেলে এসেছে।'

'শুনেছি। কী রাঁধছ?'

'আমার বিখ্যাত এশিয়ান স্যামন রেসিপি। ওর খুব পছন্দ।'

'ভালোবাসি,' বলল সাইমন।

'আমিও।'

(1,1) -159- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:57

'পেইজ কোথায়?'

'ওর ঘরে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিনার দিচ্ছি, কেমন?'

'আচ্ছা।'

করিডর পেরিয়ে মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিল সে। ভেতর থেকে হাঁক ছাড়ল পেইজ, 'এসো।'

এতদিন পরও পাণ্ডুর আর ক্লান্ত দেখায় ওকে। চেহারার এই ভাব কখনো যাবে কি না কে জানে! মাঝে মাঝেই রাতের বেলায় ঘুমের মাঝে কেঁদে ওঠে মেয়েটা, ঘেমে জবজবে হয়ে যায়, দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, নির্ঘুম কাটে সারা রাত। এ এক মহা সংগ্রাম। এই যুদ্ধে পেইজ জিততে পারবে কি না ঠিক নিশ্চিত নয় সাইমন। তবে খুব সম্ভব শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে ও। পেইজের ওপর অ্যারনের প্রভাব আর ওদের দুজনের অদ্ভুত, জটিল বন্ধন নিয়ে অনেক ভেবেছে সাইমন। ব্যাপারটা হয়তো খুব সহজ, সে-ই বুঝতে পারছে না।

'অ্যারনের সাথে তোর প্রথম যোগাযোগ কীভাবে হলো, তা আজও জানতে পারিনি,' সাইমন বলল। 'এই অংশটা মাথা থেকে সরাতে পারিনি। হেনরি থর্পের ডিএনএ টেস্টের ফল দেখেছিল ইলেনা রেমিরেজ। অ্যারনসহ সব সৎ ভাইয়ের নাম ছিল ওতে। তুইও ওই ডিএনএ টেস্ট করিয়েছিলি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ব্যাপার আমি কখনো বুঝতে পারিনি–অ্যারনের সাথে তোর বন্ধনটা কীসের? এমন জঘন্য একটা লোককে তুই এত গভীরভাবে ভালোবাসলি কী করে?'

ড্রয়ার থেকে একটা হুডি বের করছিল পেইজ। সেটা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল।

'ব্রঙ্কসে তোর অ্যাপার্টমেন্টের আমার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত আর বেখাপ্পা লেগেছিল কোন্ জিনিসটা জানিস?' বলে চলেছে সাইমন। 'দুটো আলাদা মাদুর পাতা ছিল ঘরের মধ্যে। ঘরের দুইপাশে।' হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিল সে। 'কোন্ ধরনের অল্পবয়সি যুগল এক বিছানায় শোয় না?'

'বাবা।'

'আমার কথা শেষ করতে দে। আজ পিটসবার্গে গিয়েছিলাম, ডগ মালযারের সাথে দেখা করতে। ব্যাপারটা নিয়ে, তোর সাথে সে যা করেছে তা নিয়ে, অথবা তোর থেরাপি সেশনে তুই যা করেছিস তা নিয়ে একসময়-না-একসময় কথা বলতেই হবে আমাদের।'

'বলেছি।'

'তা বলেছিস। কিন্তু ছেলেটার ওপর হামলা করা হয়েছিল। ভয়ংকর হামলা করা হয়েছিল।'

'ভুল কথা,' বলল পেইজ।

'হয়তো ভুল, হয়তো ঠিক। আমার পয়েন্ট সেটা না। ডগ বলেছে, স্কি মাস্ক পরা একটা লোক হামলা করেছিল ওকে। লোকটা অ্যারন ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। ডগ আমার সাথে যা করেছে তা ওকে বলা উচিত হয়নি।'

'বললি কেন?'

জবাব দিল না পেইজ।

'এই প্রশ্নের জবাব পাচ্ছিলাম না আমি। কিন্তু তখনই মালযার বলল ওকে পেটানোর সময় চেঁচাচ্ছিল অ্যারন। কী বলে চেঁচাচ্ছিল, তা-ও জানাল সে।'

পানি চলে এল পেইজের চোখে। সাইমনের চোখেও।

'একটা টোকাও দিবি না কেউ আমার বোনের গায়ে।'

কেঁপে উঠল পেইজের দুই কাঁধ।

'ডিএনএ টেস্ট করানোর পর জানতে পারলি অ্যারন তোর সৎ ভাই, কিন্তু তোর বাপের দিক থেকে না।' থরথর করে কাঁপছে সাইমন। 'তোরা দুজন এক মায়ের পেটের ভাই-বোন।'

কয়েক সেকেন্ড লাগল পেইজের সামলে নিতে। তারপর চিবুক উঁচিয়ে বাবার দিকে তাকাল সে। 'হ্যাঁ।'

'তোর খালার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি। জানতে চেয়েছিলাম, তোর মায়ের সবচেয়ে গোপন কথাটা কী? জানলাম, সতেরো বছর বয়েসে ও বিদেশে যায়নি মডেলিং করতে। একটা কাল্টের খপ্পরে পড়েছিল। কাল্টের নেতা ওকে অন্তঃসত্ত্বা করে ফেলে। কিন্তু ওরা...ওরা ওকে বলে যে, মরা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে ও। তোর মা ভেবেছিল, ওরা বোধহয় ওর বাচ্চাটাকে ইচ্ছে করেই মেরে ফেলেছে। আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে ও। ওর পরিবার, তোর নানা-নানি, ওকে ধরে এনে চিকিৎসা করায়। একটা রিহ্যাবে। তোর চিকিৎসা যেখানে হয়েছে।'

বিছানার ওপর বসে পড়েছে পেইজ। ওর পাশে গিয়ে বসল সাইমন।

'ভেঙেচুরে গিয়েছিল ও,' পেইজ বলল। 'ছোটবেলা থেকে ওর ওপর অত্যাচার করত ওর বাবা।'

'অ্যারন?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল পেইজ। 'আর আমি কোথায় ছিলাম, সে কথাও মনে রাখতে হবে তোমাকে। কলেজে আমার ওপর হামলা করেছিল ডগ মালযার। ওই ঘটনার পরই এই ডিএনএ টেস্টটা করাই। ফল দেখার পর মনে হলো আমার গোটা জীবনটাই একটা মিথ্যে। মনে হতে লাগল সব হারিয়েছি আমি, ভয় পেয়ে গেলাম, বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। এই অবস্থায়ই এই নতুন ভাইয়ের দেখা পেয়ে গেলাম আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতাম আমরা। হামলাটার কাথা জানিয়েছিলাম ওকে। সেজন্যেই ও পিটিয়েছিল

(1,1) -160- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:57

ছেলেটাকে। ব্যাপারটা ভয়াবহ–কিন্তু কেন জানি না নিজেকে নিরাপদ মনে হয়েছিল আমার। তারপরই আমাকে নেশার জগতে টেনে নিয়ে যায় অ্যারন। জগতটা পছন্দ করে ফেলেছিলাম আমি। না, আসলে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। নেশার কল্যাণে সবকিছু থেকে পালিয়ে বেড়াতে পারতাম। আমাকে নেশার জগতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল ও। পাঁড় নেশাখোর বানিয়ে ছাড়ল আমাকে...' থামল পেইজ। চোখ মুছে বলল, 'আমার ধারণা, অ্যারন খুব ভালো করেই জানত কী করছে ও।'

'মানে?'

'আমার মনে হয়, নিজের একটা বোন থাকার ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে ফেলেছিল অ্যারন। আমাকে হারাতে চায়নি ও। আমি যাতে ওকে ছেড়ে যেতে না পারি সেজন্য আমাকে নেশাখোর বানিয়ে রাখতে হতো ওর। আর হয়তো...হয়তো নিজের আসল মায়ের ওপরও প্রতিশোধ নিতে চাইছিল। ও ছিল মায়ের ছুঁড়ে ফেলা সন্তান। কাজেই যে সন্তানকে মা নিজের কাছে রেখেছে তাকে নষ্ট করবে না কেন ও?'

'তোর মাকে কখনো জিজ্ঞেস করিসনি এ ব্যাপারে?'

'করেছি।' লম্বা দম নিল পেইজ। 'বাড়িতে এসে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার আগে তার কোনো বাচ্চা হয়েছিল কি না। প্রথমে না বলেছিল। সত্যি কথা বলার জন্যে তার হাতে-পায়ে ধরায় শেষমেশ ভেঙে পড়ে। কাল্টের ব্যাপারে জানিয়ে দেয় আমাকে। বলে, জঘন্য এক লোক গর্ভবতী করেছিল তাকে, কিন্তু বাচ্চাটা মারা গেছে।'

ইভোনি আজ ওকে যা বলেছে, সে কথা অনুসারে, ইনগ্রিড এখনো তা-ই বিশ্বাস করে।

'ভেবেছিলাম, তখনও মিথ্যে বলছিল মা। কিন্তু তখন আর সত্যি-মিথ্যের পরোয়া ছিল না আমার। ততদিনে আমি পাঁড় নেশাখোর। তখন আমার মনে কেবল একটাই চিন্তা কাজ করত–পরের ড্রাগটা কিনব কীভাবে। কাজেই মার গয়না চুরি করলাম–তারপর ফিরে গেলাম আমার ভাইয়ের কাছে।'

সেই অসুস্থ, জটিল বন্ধনটার ভিত্তি তাহলে রক্তের সম্পর্ক।

'তুই বলেছিলি, তোর জন্যে একটা লোককে খুন করেছে তোর মা...' নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সাইমনের।

চোখ মুদে ফেলল পেইজ।

'...কিন্তু স্রেফ একটা "অচেনা লোককে" খুনে করেনি ও...'

এখনো চোখ বন্ধ পেইজের, যেন চোখ করে বন্ধ রাখলেই এসব অতীত কালিমা মুছে যাবে জীবন থেকে।

'...ও নিজের ছেলেকে খুন করেছে।'

'এ কথা মাকে জানানো যাবে না, বাবা।'

(2,1) -160- Run-Away-Bijoy 9-7-20.pdf 2020-8-27 16:42:57

মাথা নাড়ল সাইমন। সেন্ট্রাল পার্কে বসে ইনগ্রিডের সাথে কী কথা হয়েছিল, মনে পড়ে গেছে। 'আর কোনো লুকোচুরি না, পেইজ।'

'বাবা...'

'অ্যারনকে খুন করার কথাও আমাকে বলে দিয়েছে তোর মা।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল পেইজ। মেয়েটার চোখে এত স্বচ্ছ দৃষ্টি আর কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না সাইমনের। 'এই ব্যাপারটা ওটার মতো না। এই গোপন রহস্যটা মাকে ধ্বংস করে দেবে।'

এমন সময় খুশি খুশি গলায় ডাইনিং টেবিল থেকে হাঁক ছাড়ল ইনগ্রিড: 'ডিনার রেডি! জলদি এসো সবাই।' সুখী, তৃপ্ত এক রমণীর কণ্ঠ।

'কথাটা এভাবে মাকে জানাতে পারি না, বাবা।'

'না জানালেও হয়তো কোনোভাবে জেনে যাবে। কে জানে, হয়তো ইতিমধ্যে জেনে বসেও আছে।'

'জানে না,' পেইজ বলল। 'দত্তক দেয়ার কাজ করেছে যে এজেন্সি ওটার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। শুধু আমরা দুজনই জানি সত্যিটা।'

খাবার টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। ওরা পাঁচজন–সাইমন, ইনগ্রিড, পেইজ, স্যাম, আর আনিয়া। সাইমন ওর বোকা ল্যাব পার্টনারের কাণ্ড-কীর্তির গল্প শোনাতে লাগল। গল্পটা খুব মজার। শুনে হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে ইনগ্রিডের। সাইমনের চোখে চোখ রাখল। রাজ্যের মায়া আর ভালোবাসা সেই চোখে। সুখী, ভাগ্যবতী নারীদের চোখে দেখা যায় এই দৃষ্টি।

টেবিলের অপর পাশে বসা পেইজের দিকে তাকাল সাইমন। পেইজও তাকাল ওর দিকে।

এই টেবিলেও হাজির গোপন কথাটা।

সাইমন মুখ বন্ধ রাখলে, গোপন ব্যাপারটা চিরকালই গোপন থাকবে।

কোন্‌টা বেশি খারাপ হবে, ভাবছে সে। চিরকাল এই গোপন রহস্য পেটের মধ্যে চেপে রেখে বেঁচে থাকা, নাকি ওর ভালোবাসার নারীটিকে–যে নিজের ছেলেকে খুন করেছে–নিজের মতো থাকতে দেয়া?

উত্তরটা পরিষ্কার। আগামীকাল জবাবটা বদলে যেতে পারে। কিন্তু আজ রাতে কী জবাবটা কী হবে তা সে জানে।

লুথার যখন ইনগ্রিডকে গুলি করছিল তখন বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পারেনি সাইমন, কিন্তু যত আঘাতই পাক না কেন আজকের বুলেটের সামনে সে দাঁড়াবে। মুগ্ধ হয়ে স্ত্রীর সুন্দর হাসির আওয়াজ শুনছে ও। এই কাচভাঙা হাসি শোনার জন্যে যেকোনো মূল্য দিতে রাজি সাইমন।

কঠোর একটা প্রতিজ্ঞা করল সে খাবার টেবিলে। আর কোনো গোপন কথা থাকবে না ওদের মধ্যে...

...এই একটি ছাড়া।